# আকাশ মাটি যুগলবন্দী

কুমার মিত্র

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯
ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ ঃ স্বর্গীয় পিতৃদেবকে

**লেখকের অন্য গ্রন্থ ঃ**

রঞ্জানদীর ধারে

সোনার কেতাব রহস্য

ডহর নাবালের গল্প

বনজঙ্গলের গল্প

দ্বাদশ পাতাল (জয়ন্ত মুখোপাধ্যাযেব সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত)

দেওপাহাড়ের দেবতা

মানুষ পুতুলের পালা (১)

মানুষ পুতুলের পালা (২)

চোর ডাকাত হাসি মজা

# সূচিপত্র

# ঝরনার জন্যে

'কেন, তোর ভাল লাগছে না?'

'ধ্যুৎ, বাজে। এক চিলতে ঝিরঝিরে জল, এর নাম ঝরনা? একটা শব্দ পর্যন্ত নেই।'

অলকা বড়িয়ে বলেনি কিছু। সত্যি এর সরু নিঃশব্দ একটা জলের ধারা নেমে আসছে ওপর থেকে। তার না আছে বেগ, না ভাষা। চারপাশটা আঁধার। সূর্যের আলো পড়েনি। ঝরনার দেহে সূর্যালোক প্রতিফলিত না হলে রামধনুর সাতটা রঙের রোশনাই ঝিকিয়ে ওঠে না। অন্তত এই রকম ঝরনা দেখতে পাঁচ মাইল টাঙায় চড়ে সাত সকালে ছুটে আসার কোন মানে আছে মনে করে না অলকা।

'তাহলে তুই বোস। আমি ওদিকটায় ঘুরে আসি।' বসে তিলকা চলে গেল দলের সঙ্গে যোগ দিতে। অলকা দু'হাত গালে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

অলকা বরাবরই ঝরনা দেখতে ভালবাসে। ঝরনা মানেই পাহাড়, গাছগাছালি, প্রজাপতি পাখীর ডাক। ঝরনার কলভাষা শুনে বুকে ওর খুশির স্রোত উছলে ওঠে। পাহাড়ের কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য গভীরতা থেকে একটা বিরতিহীন স্রোতোধারা নেমে আসছে—তার গতির মধ্যে খুশির চপলতা, তার গায়ে লাখো লাখো অভ্রকুচির ঝিলিক—তারপর ছটফটে পতঙ্গের মতো লাফ কেটে নীচে লাফিয়ে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছে একরাশ ফেনা—বেশ লাগে দেখতে। ঘন্টার পর ঘন্টা এই আনন্দধারার ধারে বসে থাকতেও তার অরুচি আসে না। তাই বনপাহাড়ের দেশে বেড়াতে গেলেই অলকা খোঁজ করে আশপাশে কোথাও ঝরনা আছে কিনা। তার সাধ মেটাতেই যেন ঝরনা মিলেও যায় কাছেপিঠে। তারপর একদিন দল বেঁধে ঝরনাতলায় যাওয়া। পিকনিক, গান গল্পগাছা। অলকা সব তাতেই আছে, আবার নেইও।

তার এই স্বভাব নিয়ে হাসি-মস্করাও বড় কম হয় না। এমন ঝরনা-পাগল মেয়ে সত্যিই কেউ দেখেনি কখনও। না ওর তিলকাদি, না নিজের বন্ধু-বান্ধবরা, না দাদার

বন্ধুরা। তবু অলকার স্বভাব বদলায় না।

সেবারে রাজগীরে গিয়ে ওকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল সকলে। কার্তিকের শেষ, বৃষ্টি-বাদলের দিন নয়। কিন্তু হঠাৎ আকাশ কালো করে বাদল নামল। বৃষ্টি হল শুধু একদিন। কিন্তু তাতেই বৈভারে বিপুলাচলে, রত্নগিরি আর শোনগিরিতে যেন হাজার ঝরনার দরজা খুলে গেল। পাহাড়ী বর্ষা আগে কখনও দেখেনি অলকা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটা ঝরনা নয়, অগুনতি ঝরনা রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে পাহাড়ে। বৃষ্টির পর একনাগাড়ে তিনটে দিন আর ঝিরিঝিরি স্রোত থামে না। অলকাকে সামলানো মুস্কিল। যতগুলো পাহাড়ী জলধারা আচমকা দেখা দিয়েছে তাদের সবার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ যেন না হলেই নয়। রাজগীরে যেটুকু কোডাক ফিল্ম ছিল তার সবটুকু সে একাই খরচ করে ফেলল। তার আর কি, বাকি সবার ওপর দিয়ে ঝামেলা গেল বড় অল্প নয়। এই রকমই পাগল মেয়ে অলকা। বরাবর।

এবার খুরনাতে বেড়াতে এসেও বাইশ বছরের মেয়েটা কচি খুকীর মতো বায়না ধরল—ঝরনা দেখব। পাওয়া গেল খোঁজ। মাইল চার পাঁচ গেলেই বন-পাহাড়ের অঞ্চল। সেখানে হলদীবরণ বলে চমৎকার একটা পিকনিক স্পট আছে। সেই সঙ্গে ঝরনাও পাওয়া যাবে। আলো দেখে মথের যেমন আনন্দ হয় তেমনি অলকাও নেচে উঠল ঝরনার কথায়। কিন্তু তার মনের সবটুকু আলো নিভে গিয়েছে ঝরনা দেখে।

ভাবুক মনের মানুষ অরণ্যের মধ্যে বেশিক্ষণ দুঃখী থাকতে পারে না। অলকার বিষাদ আসতে আসতে খানিকটা কেটে এল। এই সবে ফাল্গুনের শুরু। আসান দুধকী কেন্দুর পাতা ঝরতে শুরু করেছে। দক্ষিণ সমুদ্র হাওয়া পাঠিয়ে দিচ্ছে সমতল ভূমিতে। অরণ্যের মধ্যে এরকম আলোঝরা বাতাসভেজা ফাল্গুনের সকাল ভালই লাগতে লাগল অলকার।

অনেকক্ষণ দলটার কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা সম্ভবত গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কথাবার্তার শব্দও কানে আসছে না। হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েছে। দলের মধ্যে আছে তিলকা মেজদা বরুণ এবং ওর দুই বন্ধু নিশীথ আর অরুণ। বাবা-মা আসেননি। খুরনাতেই রয়ে গিয়েছেন। ওদের বয়স হয়েছে, দৌড়ঝাঁপ আর পোষায় না।

নিশীথরা আলাদা করে বেড়াতে এসেছিল শিমুলতলায়। একদিন খুরনার রাস্তায় দেখা। সেই থেকে যখন তখন আসে ওদের বাসায়। হলদীবরণে পিকনিকে আসার প্রস্তাব দিতে এককথায় রাজী হয়ে গেল। অলকার কেমন যেন মনে হয়েছিল ওদের উৎসাহের আসল কারণ ওরা দু'বোন, বিশেষ করে সে। হয়তো এতে দোষের কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক। তবু অলকার ভাল লাগেনি। নজরধরা মেয়ে দেখলেই যেসব

ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাদের বড়ো অগভীর মনে হয় তার। ছেলেদের চরিত্রে অলকা কিছু গভীরতা আশা করে। এই সংসারে কোন কিছুই মনের মত মেলে না। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। তাই আজ পর্যন্ত তার নিজেকে কারো কাছে সঁপে দেওয়া হল না।

সবাই অলকাকে ভুল বোঝে, কঠোর বলে জানে। কিন্তু তাই কি? কোন কোন নির্জন মুহূর্তে বাড়ীর লাইফ সাইজ আয়নাটায় নিজের দীর্ঘচ্ছন্দ উজ্জ্বলকান্তি শরীরের প্রতিচ্ছায়া দেখতে ভালই লাগে অলকার। পাতলা ফুরফুরে এক জোড়া ঠোঁট, সমান নিভাঁজ মাপসই কপাল, তুলির টানের মতো ভুরু, নির্মল কাজলকালো চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে নার্সিসাসের কাহিনীটা মনে পড়ে যায় তার। তারপরই দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

বন্ধুরা বলে, তোর এত ঝরনা দেখার সখ অথচ মনের ভেতর কোন ঝরনা নেই কেন? অলকা উত্তর দেয় না। উত্তর দিতে পারে না। বন্ধুরা জানে যে তার মনোভূমিতে আজো ভালবাসার ফুল ফোটেনি। ওদের প্রশ্নটা চিন্তিত ও আনমনা করে বৈকি। সত্যিই কি তার বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ বালিয়াড়ির উপমা? সেখানে কোন ঝরনা নেই? তার মন বলে—আছে আছে। বুকের ভেতর চোখ মেলে দেখতে পায় সেখানে নিঃসাড়ে বয়ে যাচ্ছে এক রুপোলি ঝরনা। তাতে সপ্তরঙের লীলাখেলা, ঢেউয়ের কাঁপন। কেবল সেই ঝরনা কারো চোখে পড়ে না, তার শব্দ কেউ শুনতে পায় না।

অলকার নিশীথ এবং অরুণের ভাবনা এল এই মুহূর্তে। কেন এল সে নিজেই জানে না। হয়তো নির্জনতা বস্তুটা গোপন মনোরহস্যের দরজা খুলে দেয় বলেই। ওরা দু'জনে বড্ড এযুগের ছেলে। চেহারা ভালই মোটের ওপর, অবশ্য ভাল দেখানোর চেষ্টা থেকেই বেশী ভাল দেখায়। পাঞ্জাবি পরে না, ওতে নাকি স্কুল মাষ্টারের মত দেখায়। তাই সার্ট-ট্রাউজার পরে। ঘনঘন সিগারেট খায়। সিগারেট ধরার মধ্যে আলাদা আঙুলের কায়দা আছে। আকাশের দিকে নাক তুলে ধোঁওয়া ছাড়ার মধ্যেও কায়দা। বিজলি বলে,'এরকম করে সিগারেট খেলে ছেলেদের নাকি বেশ স্মার্ট লাগে।' তা হবে। একথা বলতে পারে বিজলি। কারণ কাফে রোস্তারাঁয় একরাশ ধোঁয়া ওড়ানো ছেলের মাঝখানেই যে সর্বক্ষণ বসে থাকে বিজলি। ক'দিন থেকেই নিশীথ আর অরুণকে দেখছে অলকা। দেখছে আর মনে মনে হাসছে। দু'জনেই ঠোঁট চেপে কথা বলে, আর শব্দগুলোকে অনর্থক জটিল করে। কাল সন্ধেয় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল নিশীথ। ঠিক বিদেশী গানের মতো লাগছিল। অরুণ বাংলা ছায়াছবির আলোচনা করতে করতে মাঝে মাঝেই চ্যাপলিন ত্রুফো, আন্তনিওনি এই ধরণের নামগুলো আলটপকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। রবিশঙ্করের সেতারও তার আলোচনা থেকে বাদ যাচ্ছিল না। সব মিলিয়ে ভয়ানক হাস্যকর।

অথচ এ সব না করলেও ওদের দাম কমত না। ওদের কারোরই বিদ্যেবুদ্ধি কম নয়। নিশীথ ডবল্যু বি সি এস পাশ করে ভাল মাইনের সরকারী চাকুরে। অরুণ একটা প্রাইভেট ফার্মে ওপরতলার পোষ্ট দখল করে আছে। সমাজের চোখে ওরা ঈর্ষার পাত্রই। অলকার জন্য তার বাবা-মা এদের চেয়ে উঁচু ডালের ফল পেড়ে দিতে পারবে না নিশ্চিতই। কিন্তু আশ্চর্য এরা এসে তার এখানকার মুহূর্তেগুলোকে রঙীন করে তুলতে পারল না।

অলকা আবার ঝরণার জন্যে দুঃখ বোধ করল। কি মনে করে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর পায়ে পায়ে উঠে এলে ছোট্ট ঝরনার ধারে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ সে ঝরনাটার দিকে চেয়ে রইল অপলক চোখে। তিরতির করে নেমে আসছে জলধারাটা। কোন শব্দ নেই। চারপাশে আলোর ছড়াছড়ি। কিন্তু ওপারে কিছু ছায়াতরু থাকাতে ঝরনার উপর ধূসর তরল অন্ধকার। অলকা বৃথাই জলকণায় মধ্যে রামধনু খুঁজল। তার মন জলস্রোতটার ভেতর শব্দ সন্ধান করছিল। ঘাড় নীচু করে পাশের পাথরটার গায়ে কান লাগিয়ে সে উৎকীর্ণ হল। খুব মিহি সুরেলা একটা গুঞ্জন শুনতে পেল সে যা নৈঃশব্দ্যেরই অন্য নাম। অলকা কান ভরে, নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে, নৈঃশব্দ্য উপভোগ করতে লাগল।

'একি, আপনি এখানে কি করছেন?'

'অলকা চমকে ঘাড় ফেরাল। নিশীথ। অলকার মুখে একরাশ রঙ ছড়িয়ে গেল। লজ্জা পেয়েছে।

'অমন করে কান পেতে কি শুনছিলেন?'

'শব্দ।'

'শব্দ!' নিশীথ অবাক, 'ঝরনার?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য কিসের?'

'এমন করে ঝরনার শব্দ বুঝি কেউ শোনে?'

'আমি শুনি। ভাল লাগে।'

নিশীথ হতাশার ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল। তারপর বলল, 'আমরা কত ঘুরলাম বনের ভেতর। বেশ চমৎকার জায়গা। ছবিও তোলা হল। ছবির ভেতর আপনি রইলেন না। আপনাকে আমরা আশা করেছিলাম। গেলেন না কেন?'

'ভাল লাগছিল না।'

'মানে ঝরনা ছেড়ে যেতে মন সরছিল না। কিন্তু এই ঝরনাটির মধ্যে দেখার

মতো কি আছে?'

'অনেক কিছু।'

নিশীথ ঠোঁট কামড়াল হতাশ ভঙ্গীতে, 'কি জানি। আপনার ব্যাপারটা কেমন একরকম।'

অলকা নিশীথের অভিযোগের উত্তর দিল না। ঝরনার জলে তার চোখ স্থির।

'এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করবেন? চলুন না ঘুরে আসি।'

জল থেকে চোখ তুলে নিশীথের দিকে তাকাল। নিশীথের মুখে একটা প্রত্যাশা থমকে আছে। তার জবাব শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে নিশীথ। কেমন বোকাটে দেখাচ্ছে তাকে। অলকা কথা বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে নিল।

'কি, কথা বলছেন না যে?'

অলকা কথা বলল, কিন্তু সেটা নিশীথের প্রশ্নের জবাব নয়, 'ওরা সব কোথায়?'

'বরুণ একটা কাঠুরের সঙ্গে গল্প করছে। বোটানির ছাত্র তো। তাই গাছ-গাছালি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তোমার দিদি আর অরুণ—'

'কি?'

নিশীথ অস্ফুট হাসল, 'কি আর! এই বনেরই কোথাও গাছপালার ছায়ায় বসে আছে। কিন্তু আমার কথার জবাব মিলল না যে!'

অলকা ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'ভাল লাগছে না!' নিশীথ কেমন বিড় বিড় করে বলল, 'কিন্তু কেন ভাল লাগবে না! এমন পাহাড় ছায়া রোদ, বাতাস, পাখির ডাক—ভাল না লাগার কি আছে?'

'নিশীথবাবু আপনি যান। আমি একটু একলা থাকতে চাই।'

এরপর আর কথা চলে না। নিশীথ ঘাড় নীচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

চলে যাওয়ার কথাটা কি আর একটু নরম করে বললে হত? মনে মনে ভাবল অলকা। কিংবা ওকে কি তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল অলকা? বোধহয় না। অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝরনার কাছ থেকে সরে এল।

অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে গল্প করছিল তিলকা। জানলাপথে আসা জ্যোৎস্নার আলোয় বিছানা মাখামাখি। হলদীবরণের জঙ্গলে আজ সকালের মুহূর্তগুলোরই গল্প করছিল তিলকা। তার গলায় খুশীর আমেজ। তার গলার স্বরে অরুণ নামটা এমন সরস হয়ে ফুটছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন নামটাকে জপ করছে। শুনতে শুনতে অলকার গলার মধ্যে কি যেন বেধে যাচ্ছিল।

গল্প থামিয়ে হঠাৎ তিলকা শুধোল, 'অরুণ ছেলেটাকে তোর কেমন মনে হয় রে?'

'ভালই তো।'

'আহা, কেমন ভাল? তোর কথাগুলো আলগা আলগা।'

'বেশ ভাল। চেহারা মন্দ নয়, বিদ্যে আছে, মোটা চাকরি করে। আর কি চাই?'

'বলেছে বুঝি?'

'বলবে কেন? মুখ দেখে বোঝা যায় না বুঝি? আমরাই যে ওকে পাঠিয়েছিলাম তোর কাছে। আমি আর অরুণ। বেচারা বড়ো দুঃখ পেয়েছে। তাড়ালি কেন? ওকি তাড়িয়ে দেবার মতো ছেলে?'

'কি জানি কেন সহ্য করতে পারলাম না।'

'নিশীথ তোকে ঠিকই বুঝেছে।'

'কি বুঝেছে?'

'তোর বুকের মধ্যে কোন ঝরনা নেই বলছিল নিশীথ। সত্যিই তোর বুকের মধ্যে কোন ঝরনা নেই অলকা!'

রাত বড়ছিল। পরিপূর্ণ তৃপ্তির আবেশ নিয়ে তিলকা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার জ্যোৎস্নামাখা নরম মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে হবে এক রাজকন্যা তার প্রিয় রাজকুমারের স্বপ্ন দেখছে বিভোর হয়ে। বাইরে রাতপাখির ডাক, পাতার শিরশির এবং বায়ুর উচ্ছ্বাস মধ্যরাত্রি ঘোষণা করছিল। কিন্তু অলকার চোখে ঘুম এল না। দিদির কথাটা তার মনে পড়ছিল। সত্যিই কি তার বুকের ভেতর কোন ঝরনা নেই? না, সবাই তাকে ভুল বুঝেছে। তার দিদি, নিজের বন্ধুরা, নিশীথ-অরুণ, সবাই। তার হৃদয়কে বৃত্ত করে নিরন্তর বয়ে চলেছে এক জোরাল ঝরনা। তার বেগ আছে কলধ্বনি আছে, বর্ণচ্ছটা আছে। কেউ সেটা শুধু টের পায় না, এটাই আশ্চর্য। আর টের পেলেও সেটার ধ্বনি বর্ণমাধুর্য কেউ ভোগ করতে পারে না কেন? কেন পারে না?

নিজের বুকের মধ্যে এই আশ্চর্য ঝরনার কলধ্বনি শুনতে শুনতে অলকার কেমন কান্না পেয়ে গেল।

অমৃত

# সর্বপাপঘ্ন

জানলার ওপর দিককার পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলে দিল ধরিত্রী।

বদ্ধঘরের উত্তাপে ধাক্কা মারল বাইরের এক ঝলক হিমানী। গাছপালায় জড়ানো আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। ঊষাকাল এখনও যথেষ্ট তরুণী। দূরের বাঁশবনে পাখিদের আবছা ডাকাডাকি। ছোটময়না গ্রামে একটা নতুন দিন সবে শুরু হচ্ছে।

বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ধরিত্রী। এক চিলতে ঘরটায় আবছায়া ও অস্পষ্টতা। দিনের আলো এখনও এখানে দখল নিতে পারেনি। নিত্যকার অভ্যাসবশে ধরিত্রী ঘরের একমাত্র আসবাব তক্তাপোষটার ওপর চোখ রাখল। ছেঁড়ামুয়লা লেপটার নিচে একটা মানবদেহের আভাস। মুখটা বালিশের ওপর একপাশে হেলানো। পুরুষের মুখ। দু'গালে ক'দিনের বাসি দাড়ি— খোঁচা খোঁচা, শক্ত, সাদা। কোটরে ঢোকা চোখে, শুকনো সরু রগে, আকুঞ্চিত ললাটে, পাতলা হয়ে আসা চিবুকে অসুস্থতার ছাপ প্রগাঢ়। রঙ্ তামাটে কিন্তু বিবর্ণ, কালচে ঘেঁষা। মানুষটি ধরিত্রীকে বিয়ে করে এনেছিল পঁচিশ বছর আগে। এখন ওর বয়স ছাপান্ন-সাতান্ন, তবে চেহারায় যেন আটষট্টি সত্তর। বয়সে নয়, গণপতি আচার্য অসুখে বৃদ্ধ। ওর ব্যাধি দুরারোগ্য। হাঁপানি। এ এমন এক রোগ যা রোগীকে অনেককাল বাঁচার কষ্ট দিয়ে তিল তিল করে মারে। গণপতি বছর আড়াই হল শ্বাসকষ্ট আর কফ-কাশিতে ভুগছে।

ধরিত্রী মাত্র মধ্যচল্লিশ। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের উপহার তিনটি সন্তান। এখন ও ছেলেপুলেদের নিয়ে অন্য ঘরে ঘুমোয়। এই ঘরের প্রয়োজন ওর ফুরিয়েছে। কিন্তু দিনের আলো ফোটার আগেই রোজ ওকে এ-ঘরে একবারটি আসতে হয়। গণপতির শিয়রের দিকে তক্তাপোষের নিচে পাতা মালসাটায় গোটা বিনিদ্র রাতের ফসল জমে আছে। দলাদলা কফ আর থুতু। লোকটা প্রায় সারারাত ঘুমোয় না। ক্ষণে ক্ষণে ওয়াক তোলে, হ্যাক-থুঃ করে। স্বামীর পাঁজর-কাঁপিয়ে উঠে-আসা ক্লেদ ধরিত্রীকেই পরিষ্কার করতে হয়।

পৌষের দীর্ঘরাত্রি জুড়ে উত্তাল বেদনার উৎপাদন বড় অল্প নয়। মালসাটা ভরে যায় আধাআধি। দিনের আলোয় ওটার ভিতরে তাকালে ধরিত্রীর নাড়ী ছিঁড়ে কিছু যেন

উঠে আসতে চায়। তাই নেয় অন্ধকারের আড়াল। আঁধার মনেই গোপনতা। সর্বপ্রকার পাপ ও লজ্জার আশ্রয়। সারারাত্র পাশের ঘরের আর্তনাদ ও কাশির আওয়াজ শুনতে শুনতে সব দিন ধরিত্রীর ভোরে ওঠা সম্ভব হয় না। যেমন আজ। ঘুম থেকে যখন উঠল ঊষার হাতে ভোরের দখল চলে গিয়েছে।

কিন্তু আর দেরি নয়। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ধরিত্রী নাকে আঁচল দিয়ে মালসাটা তুলে নিল। উঠোন পেরিয়ে আমড়া গাছটার পাশে মালসা খালি করল। এবার উনুন থেকে একগাদা ছাই এনে ময়লাটা চেপে দেবে। ঘাটে গিয়ে স্নান করে নেবে। তিন-চার বছর আগেও এ অভ্যাস তার ছিল না। কিন্তু ওই মালসা ছোঁয়ার পর স্নান না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। কোন কাজে মন সরে না। গা-ঘিন্‌ঘিনে ভাব নিয়ে গেরস্থালিতে ঢোকা যায়! সাতসকালে স্নান করলে, বিশেষ করে শীতের দিনে, শরীর খারাপ করে। কিন্তু ধরিত্রী নিরুপায়। রোগীর স্ত্রীর বড় জ্বালা। যে স্ত্রী রক্তে লালন করে পতি পরম গুরুর তত্ত্ব। সব সইতে হবে বলেই কি নাম রাখা হয়েছিল ধরিত্রী!

গণপতি ততক্ষণ এঘরে নিশ্চুপে ঘুমোয় যতক্ষণ ধরিত্রী প্রভাতী কাজ সারে। কি যেন একটা নৈসর্গিক কারণে সূর্যোদয়ে শ্লেষ্মা-কফ-পিত্তের ধার কমে যায়। গণপতির মানবশরীর রাত্রিকে তার খাজনা মিটিয়ে দিয়ে আরক্ত দিনারম্ভে কিঞ্চিৎ সুস্থতা ফিরে পায়। বেলা সাড়ে আট নয় পর্যন্ত ঘুমোতে পারে প্রায় নির্বিঘ্নে।

## দুই

ক্লান্ত অবসানের প্রতীক্ষায় দিন গুণলেও মানুষটির জীবনের শুরু মোটামুটি ভালভাবেই হয়েছিল। ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়াশুনো করে স্কুল যাবার পালা সাঙ্গ। চৌদ্দ পনের বছর বয়সেই ওর বাবা ওকে কুলকর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাবা শুকদেব আচার্য ছিলেন এ-দিগরের নাম করা পুরোহিত। আশপাশের আট-দশটা গ্রামে তাঁর অপ্রতিহত প্রতাপ। শাস্ত্রশিক্ষা যথেষ্ট ছিল। তাঁর উচ্চারণ ও উদাত্ত কণ্ঠের সুরে ঋক্ মন্ত্রের যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত। শিষ্য যজমান বিস্তর ছিল, সংসারে যেটুকু সচ্ছলতা ছিল তা তখনকার দিনে ঢের। এমন বাপের একমাত্র ছেলের পুরুত হওয়াই যেন ভাগ্যলিপি। গণপতির পড়াশুনায় মাথা মন্দ ছিল না। তবে পুজো-আচ্চার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। গণপতি যখন দশ-এগারো তখন থেকেই বাপের শিষ্যবাড়ি যাত্রার সহযাত্রী। ওর চেহারাতে শুকদেব আচার্যের সুস্পষ্ট আদল। গোলগাল, চোখ নাক মুখ ভাল, উজ্জ্বল তামাটে রঙ। মুখখানি ভরাট সুশ্রী। পৈতৃক বৃত্তি নিলে এ ছেলে যে ভবিষ্যতে গণ্যিমান্যি লোকহয়ে উঠবে তা যেন ওর চেহারাছাঁদ আর হাবভাবেই লেখা। তবু শুকদেব হয়ত ওকে অন্যরকম ভাবেই গড়ে তুলবেন, কিন্তু সেটা হতে পারল না শিষ্যদের কারণেই। তারা ওর মধ্যে আগামীদিনের কুলগুরুকেই দেখতে শুরু করেছিল।

আজো ঘটনাটা মনে আছে গণপতির। সবে তখন ওর পৈতে হয়েছে। সময়টা মাঘের শেষ কিংবা ফাল্গুনের শুরু। হৈমন্তী ও শীতালি ফসল ঘরে উঠে গেছে মানুষের। নদনদী যৌবনহারা। জেগে ওঠা চর, কৃশ গর্ভদেশে ও ক্ষীণ স্রোতোরেখায় প্রবাহিনীগুলি বার্ধক্যজীর্ণ। এরকম সময়েই শুকদেব বারবার শিষ্যবাড়ি 'সফরে' বেরোতেন। সেবারও তিনি বেরিয়েছেন। সঙ্গে গণপতি। বাবার শিষ্যবাড়ি দুর-দুরান্তে। কোথাও জেলা-সীমান্তে, কোথাও ভিন্ন জেলায়। অনেক খাল-নদী পেরিয়ে এক শিষ্যের বাড়িতে উঠেছেন শুকদেব। সম্পন্ন গৃহস্থ। নাম মনে নেই তবে পদবী ভুঁইয়া। প্রচুর ক্ষেত্র খামার, তিনটে মরাই ধান চাল কলাই তিসি সর্ষেতে ভরপুর। ভুঁইয়াকর্তা ভারী ভক্তিমন্ত লোক। ভরন্ত-পুরন্ত কামানো মুখ। গলার হরিনামের মালায়, সরল দুটো চোখে আর বিনীত কথাবার্তায় যেন ভক্তিরস মাখানো। প্রবীণ মানুষটি গলবস্ত্র হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্রের পায়েও নতজানু হয়েছিলেন। গ্রামের ছেলেরা যাকে 'গণা' বলে ডাকে সেই নাবালকের পায়ে বয়স্ক আর ভারিক্কি মানুষের প্রণাম নিবেদন অস্বাভাবিক ঠেকেছিল গণপতির কাছে। সে' দুপা পিছিয়ে গিয়েছিল তড়িৎস্পৃষ্টের মতো। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে অবাক হতে হয়েছিল বাবার কথায়, 'এতে লজ্জার কি আছে! তুমি তো গুরু পুত্র। তাই প্রণম্য।' বেশ অসাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই চোদ্দ-পনেরোর গণপতিকে প্রবীণের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফেরার সময়ও তাই। কি আশ্চর্য, যজমান পরিবারের একাধিক বয়স্কজনের প্রণাম নিতে তার বাধে নি।

আসার সময় ভুঁইয়াকর্তা শুকদেব আচার্যকে বলেছিলেন, 'আপনার তো বয়স হচ্ছে। কদিন আর আসা যাওয়া করতে পারবেন! আমার ছেলেপুলে নাতি-নাতনীরা তো ছোট আচার্যকেই গুরু বলে জানবে।'

শুকদেব রহস্যময় হেসে বলেছিলেন, 'সেদিন বোধহয় বেশি দূরে নয়।'

সত্যিই বেশি দূরে ছিল না। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি চোখ বুজলেন। দুই নদী আর চারটে খাল পেরিয়ে গণপতি আবার যেদিন একলা সেই ভুঁইয়াবাড়ি গিয়েছিল, সেদিন তার বয়স বিশও পার হয়নি। তবে ভুঁইয়াকর্তা নবীন গুরুদেবকে সাদরে বরণ করে নিতে ভোলেননি। বরং একটু বাড়াবাড়ি রকম ঘটাই হয়েছিল। গণপতির আজো পরিষ্কার মনে আছে খেজুর গুড়ের নাগরি, এক বস্তা চাল, বস্তাখানেক খাঁসারি ডাল, আরো নানান টুকিটাকি গোরুর গাড়ি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল গুরুর বাড়ি ভুঁইয়া বাড়ি থেকে। এতটা দাক্ষিণ্য শুকদেব আচার্যও পাননি।

তা সে কালটা এমনই ছিল। পাঁচ শিষ্যবাড়ি ঘুরলেই ছোট সংসারের পাঁচ মাসের খোরাকি চলে যেত। বিনিময়ে কি আর দিতে হত! কথায় কথায় হরির নাম এবং সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ, ঈশ্বরের দোহাই পাড়া, কিছু মিষ্টি বুলি, হাতের মুদ্রায় আশীর্বাদের ভঙ্গি, আর চোখ বুজে কিঞ্চিৎ গায়ত্রী জপ। তা যে পুজোর যে মন্ত্র। রক্তের উত্তরাধিকারে, বাপের শিক্ষায় অল্প বয়সেই এসবে পোক্ত হয়ে গিয়েছিল গণপতি।

সবাই বললে; এ ছেলে বাপের মুখ রাখবে। যোগ্য সন্তান। বলতে কি, নামের দিক থেকে গণপতি তার ডাকসাইটে বাবাকে ধরে ফেলেছিল বয়স পাকবার আগেই।

চালাকি যে কোথাও ছিল না তা নয়। তবে পুজো আচ্চার ব্যাপারে গণপতি বরাবরই ষোল আনার ওপর সতেরো আনা নিষ্ঠাবান। ভোরে স্নান, পুজো না সারা পর্যন্ত উপবাস, বিশেষ বিশেষ দিনে নিরামিষ ভোজন—এসবের মধ্যে কোথাও ফাঁকি ছিল না।

তিনের কোঠায় পা দিয়ে ঘরে আনল গণপতি। ধরিত্রী সচ্ছল ঘরের মেয়ে, এ বাড়ির বউ হয়ে তার আসার কথা ছিল না। কিন্তু বংশের সুনামের ওপর তখন পর্যন্ত মানুষের মোহ ছিল। সেই সূত্রেই ধরিত্রীর আচার্যি বাড়িতে আসা। সবাই বোঝালে, 'পুরুত বর তাতে কি! কত বড় নামী বংশ দেখতে হবে তো!'

বর যে পুরুত বামুন সে তো জেনেই এসেছে ধরিত্রী। কিন্তু সে যে নিতান্তই পুরুত, তা কেমন করে জানবে ধরিত্রী! কর্মটর্ম মানুষ করে ঠিকই, কিন্তু নিতান্ত কাঁচা বয়সেও যে পুজোপাঠ, বারব্রত পালন, আর উপবাস ছাড়া কিছু বুঝবে না, তা কে ভাবতে পেরেছিল! খাওয়া দাওয়া সারতে বেলা গড়িয়ে যায় কোন কোন দিন। আগে তবু একটু আধটু মাছটাছ ছুঁত, চল্লিশ পেরোবার পর ওসব একেবারে ছেড়ে দিল। কিছু বাড়িতে নিত্যপুজার ব্যবস্থা ছিল। গেরস্থের ঘরে পুজোর আয়োজন হতে দুপুর। ওই সময় পর্যন্ত রোজ শুকিয়ে থাকত গণপতি। জল-টল খেত পুজো সেরে। নিজের শুদ্ধাচার নিয়ে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল তার।

ধরিত্রীর এতটা বড়াবাড়ি ব'লেই মনে হত। বলত, 'এ কিন্তু ভাল করছ না। চল্লিশ হতে না হতে মাছ মাংস ছেড়ে দিলে। তারপর রোজ দুপুরে শুকিয়ে থাকা। এত সইবে না শরীরে।'

গণপতি হেসে বলত, 'নিষ্ঠাচারে না থাকলে পুজোর নিষ্ঠা আসবে না। আমাদের যা কাজ তাতে কিছু বিধি মানতেই হয়।'

'তা বলে এত বড়াবাড়ি?'

'বাড়াবাড়ি কোথায় দেখলে? বাবার কাছ থেকে তো এসব শিক্ষাই পেয়েছি।'

এরপর আর কথা চলে না। তবু ধরিত্রী বলে, 'শীতের দিনে এত সকালে স্নান কোরো না। প্রায়ই তো কাশতে দেখি।'

'ও কিছু না। বাসক পাতার রস খেলে ঠিক হয়ে যাবে। বাপার কি জানো, উদয় সূর্যকে প্রণাম করতে গেলে সকালে স্নান না করে উপায় নেই। আর উষাস্নানে মনটাও পবিত্র লাগে। বাবা বলতেন, সূর্য সর্বপাপঘ্ন। সারা দিনের যে পাপ জমে তা না নাশ হয় প্রতি সকালে সূর্যস্তব করলে। তাই বেলা করি না। বেলা হয়ে গেলে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে।'

ধরিত্রী বলে, 'তোমার মত লোকের পাপ কিসের গো?'

'মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, পাপ আছেই।' গনপতি জবাব দেয়।

পাপ থাক বা না থাক, প্রায়শ্চিত্তের দায় নিতেই হল গণপতিকে। দেহের ভেতর বাসা বাঁধল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি যা কোবরেজ, বদ্যি, হেকিম, ডাক্তার সবার নাকে ঝামা ঘষে দেয়। পাপ যার নেই তাকে নাকি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। সুতরাং পাপ অছেই। তা পাপ কোথায়? এ প্রশ্ন বারবার নিজেকে শুধিয়েছে গণপতি। উত্তরও পেয়েছে। দেহেরও একটা ধর্ম আছে। দেহরক্ষা নিজেই একটা ধর্ম। জীবধর্ম। শুদ্ধাচারের হাড়িকাঠে গণপতি দীর্ঘদিন জীবধর্মকে বলি দিয়ে আসছে। নিষ্ঠাচার নিয়ে দর্পও একটা পাপ। কৈশোর যৌবনে কত বর্ষীয়ান মানুষের—পিতা, পিতামহ, মাতৃসমা মানুষের—প্রণাম নিয়েছে সে নির্বিচারে। গুরুত্বের অহঙ্কার তার সঙ্গে ছলনার খেলা খেলেছে। এটা কি পাপ নয়? মুখস্থ বুলির মতো কতজনকে আপ্তবাক্য শুনিয়েছে, অথচ সেখানে নিজের মনের বাধাই ঘোচেনি সে কি পাপ নয়? সঞ্চয়ের তহবিলে পুণ্যের চেয়ে পাপের আধিক্যই ঠান্ডা মাথায় বিচারে নজরে পড়ছে গণপতির। এরই প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হচ্ছে জীবনের পড়ন্ত বেলায়। জড়িবুটি, কবচ তাবিজের পালা শেষে, ডাক্তারের আসা যাওয়ার পালা ফুরিয়েছে, এখন শুধু শেষ পরিণামের জন্য দিন গোণা।

বনমালী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মরণটা কত তাড়াতাড়ি আসবে বলতে পারো ডাক্তার?'

'আমি বিধাতা পুরুষ নই, আচার্যি মশাই। ওটা তিনি জানেন।' ডাক্তারের জবাব।

মরণ কত তাড়াতড়ি আসবে, সেই চিন্তাই ইদানিং কুরে কুরে খায় গণপতিকে। কিন্তু সত্যি সত্যিই সে কি মরতে চায় তাড়াতাড়ি? তাহলে সে সবার চোখের আড়ালে, এমন কি ধরিত্রীকে টের পেতে না দেবার সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে, গুমরে গুমরে কাঁদে কেন? কেন তার প্রবল কাশির সঙ্গে মিশে যায় কান্নার আবেশ? হাঁপের যন্ত্রণা থেকে তার চোখে জল আসে। কিন্তু সব অশ্রুই কি যন্ত্রণার? দুঃখের হাহাকারের নয়?

সূর্যের আলো হাঁপানির প্রতিষেধক—ব্যাধি নিরাময়ের বিজ্ঞানে বলে। গণপতির বাবা শুকদেব আচার্য পৌরোহিত্যের সঙ্গে ভেষজবিদ্যা ও রোগশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। তিনিও বলতেন, সূর্যরশ্মি কীটনাশক, ব্যাধির কীট রৌদ্রে বিনষ্ট হয়। গণপতিরও তাই বিশ্বাস। কিন্তু সে দেখেছে সূর্যালোকে হাঁপানির সাময়িক বিরাম হয় মাত্র, নিরাময় হয় না। বহুকাল হল একটু বেলা বাড়লে সে বাড়ির ধারে উঁচু পোতাটায় এসে বসেছে, পলকহীন চোখে চেয়ে থেকেছে গগনের অনেকখানি ওপরে ওঠা সূর্যের দিকে। তার ঘড়ঘড়ে গলা মৃদু উচ্চারণে বলে উঠেছে,—'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।' তার শরীরে মনে কেমন একটা শান্ত প্রসন্নতাও সাময়িক ভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে। সূর্যের জ্যোতিঃকণা শুষে নিয়ে আতপ্ত হয়ে উঠেছে শরীর। কিন্তু দীর্ঘ রাত্রির কালো ছায়া আবার তাকে ঢেকে দিয়েছে মৃত্যুশৈত্যের অনুভবে। আবার একবছর পরে

দেখা যায় গণপতি মৃত্যুর রাস্তা ধরে আরো খানিক এগিয়েছে। এর মধ্যে তার ভেতর-বাইরে হয়ে বেছে অনেক ভাঙাগড়ার খেলা। এখন সে আর শীতের উষ্ণকোমল রোদ্দুরে গা পেতে বসে বলে না, 'হে সূর্য, তোমার জবাকুসুম সঙ্কাশ আলোর বন্যায় আমার দেহের দূষিত জীবাণু ধুয়ে মুছে দাও।' সে নিজের হেরে যাওয়া টের পায়। তাকে ঘিরে অন্ধকারের জাল ক্রমশঃ ছোট করে এনেছে মৃত্যুর অধিদেবতা, বুঝতে পারে। পুজো পাঠ, শাস্ত্রজ্ঞান, দৈববিশ্বাস, দীর্ঘলালিত জীবনচর্যা—সব মিথ্যে। এক ওঁতপাতা নিঃশব্দ সঞ্চারী শকুনের কাছে, এটাও গণপতি অনুভব করে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে। 'পাপ' শব্দটাকে উচ্চারণ করে প্রতিদিন শত-সহস্রবার।

মেজাজ হয়ে যায় অসংযত। খিটখিটে। তার স্বরে আর নেই মীড় মূর্চ্ছনা। উচ্চারণ থেকে বিদায় নেয় বাদ্যযন্ত্রের লালিত্য-মাধুরী অথচ এটা ছিল তার অভ্যাসগত ব্যাপার, রেওয়াজি সাবলীলতা। এখন সে তেঁতো-কষা গলায় ধরিত্রীকে বলতে পারে; দেবতা-টেবতা ভাঁওতা। পূজো টুজো তামাসা। পাপপুণ্য মিছে কথা। না হলে সারা জীবন নিষ্ঠা ভরে ঠাকুরসেবা করে আমার এ দশা কেন? বাড়ি থেকে লক্ষ্মী-জনার্দনের মূর্তি সরাও। হরপার্বতীর পটটা ফেলে দাও। উঠোনের তুলসীঝাড়টা কাল যেন না দেখতে পাই।'

গণপতির বড় ছেলে ভূপতি বাবা বাণেশ্বরের কবচ এনে দিয়েছিল ছ'ঘন্টা হাঁটাহাঁটির ধকল সহ্য করে। বাণেশ্বর নাকি বড় জাগ্রত দেবতা। ওঁর করুণাপূত ওষুধ মহাব্যাধির ওপর বশীকরণের মন্ত্র ছড়ায়। কিন্তু ভূপতিকে অবাক করে দিয়ে তার বাবা কবচটা মাথায় ঠেকিয়ে দুরের কচুবনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ছেলেকে বলেছিল, 'আশ্চর্য হসনে বাপ, এসব ভুয়ো ব্যাপার।' সত্যিই গণপতি আর আগের গণপতি নেই, কোন অর্থেই। ছেলেমেয়ে অবাক হয়, রাগ করে, দুঃখ পায়। কেবল ধরিত্রীই শান্ত-স্তব্ধ। কেবলমাত্র মাঝবয়েসি এই রমণীই ভুরুতে কুঞ্চন আঁকে না, ঠোঁটে বক্রতা আনে না, গলাতেও কোন ঢেউ ভাঙে না। অথচ এক দুঃখীজনের মনের কম্পন, চ্যুতি ও লাভাস্রোত একমাত্র সেই হয়তো টের পায়।

**তিন**

ইদানিং ভোরের দিকেও আর নিদ্রাবেশ আসে না গণপতির। কঙ্কালের কি ঘুমের ভর হয়!

মাঘের এক শেষ ভোরে বিছানা থেকে উঠে আসে গণপতি। মাথাটা ভার ভার। সারা রাত ঘুমের সঙ্গে আড়ি ছিল বলে চোখে কেমন একটা জ্বালা।

দরজাটা ভেজানো ছিল। অনেকদিন হল দরজায় আগল দেওয়া হয় না। অনেব রাতেই ওষুধ ও শুশ্রূষার কারণে পাশের ঘরের মানুষটিকে এ ঘরে আসতে হয়েছে। তাই ঘরটির দরজা শুধু ভেজানো থাকে। দোরে এসে গণপতি বহুকাল পরে উষার অবির্ভাব দেখল। অন্ধকার আর নেই, উঠনের পাঁচিলের ওপারে গাছ পালার মাথায়

ভেজা ভেজা নরম আলোর ছোপ। আসন্ন সূর্যোদয়ের বার্তা ঘোষিত হচ্ছে আকাশে, পৃথিবীতে।

পাঁচিলের দরজা খোলা দেখে অবাক হল না গণপতি। ধরিত্রী তো ভোরেই ওঠে। হয়তো সে বাইরে গেছে কোন কাজে। গণপতি বাইরে বেরিয়ে এল। একটু দূরেই উঁচু পোতাটা। ওখানেই তো রোজ বসে গণপতি, অবশ্যি একটু বেলায়। কোনরকমে নিজেকে টেনেটনে পোতাটায় বয়ে আনল। ভূপতি ওর জন্য এখানে একটা ইট বিছিয়ে আসন করে দিয়েছে। তার উপর উবু হয়ে গণপতি চারধারে নজর ছড়িয়ে দিল।

দশদিকের মধ্যে সেরা দিক নাকি পূর্বদিক। বলতেন শুকদেব আচার্য। পূর্বদিক সূর্যোদয়ের দিক। অন্তর্গত রক্ত, শাস্ত্রাচার ও পিতৃপ্রভাবের সংস্কারে প্রাচী দিগন্তেই প্রথম চোখে পড়ল গণপতির। পুবের ললাটে জবারঙের টিপটাব সামান্য আভাস। সপ্তাশ্ববাহিত মহারথীর যাত্রা শুরু হয়েছে। এ ভারী মধুর মুহূর্ত! কতবার উপভোগ করেছে গণপতি। কিন্তু আজ এই প্রথম শীতপ্রভাতে সে বিদ্রোহীর মতো চেয়ে রইল অরুণসারথির উদয়শিখরে।

কতক্ষণ যে এভাবে চেয়ে থাকত ঠিক নেই, হঠাৎ তার চোখ গেল অন্য দিকে। উঁচু পোতা থেকে কিছু দূরে একটা পুকুর। ছোট, ঘরোয়া পুকুর। গণপতিরই পুকুর। পৈতৃক সম্পত্তি। টলটলে পরিষ্কাব জল। পুকুরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল গণপতি। আবক্ষ জলে দাঁড়ানো নারীটি নিঃসন্দেহে ধরিত্রী। একরাশ লম্বা চুল পিঠে ভেঙে পড়েছে। গলবস্ত্র, জোড কব। মুখখানি পুবের পানে। নরম লালচে আলোয় গালের একপাশ দেখা যাচ্ছে। আগের সেই নিটোল পানপাতা ডৌলটি নেই, ভাঙা ভাঙা। পূজারিনীর মতো তদ্গত। তপঃকৃশা পার্বতীর কথা মনে পড়ে যায়। এ তপস্যা কার জন্য? একটা ফোঁপানির ঢেউ ঠেলে উঠে আসে গণপতির।

হঠাৎ সে স্থির সংযত হয়ে যায়। কানে আসছে সুর স্পষ্ট, বিশুদ্ধ মন্ত্রোচার—

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঅস্মি দিবাকরম্।।

ধরিত্রী সূর্যস্তব করছে। সুমিষ্ট সুরতরঙ্গ ছড়িয়ে যাচ্ছে তৃণে, লতায়, বায়ুতে পত্রপল্লবে। প্রতিটি শব্দে ঝরে পড়ছে প্রাণের আকুতি। গণপতি রাগ করে, তারপর অবাক হয়, তারপর মুগ্ধ। তারপর সে নিজেই বলতে শুরু করে, জবাকুসুমসঙ্কাশং.....।'

গলায় আবেগের সুর নেই, উচ্চারণে জড়তা। কিন্তু তাতে কি! তার হাত দুটি একত্রে আবদ্ধ হয়ে এক বিশেষ মুদ্রা রচনা করে, চোখ দুটিও মুদ্রিত হয়ে আসে। আস্তে আস্তে টের পায় অন্তরে সুপবন বয়ে যাচ্ছে, সেখানে আলো, আলো, অপরিমিত আলো। অফরন্ত জ্যোতিঃ। অনিঃশেষ, অনির্বাণ।

**সিন্ধুসারস**

# টাঙ্গাওয়ালা

মধুপুর স্টেশন থেকে বকুলিয়া ঝরনা পর্যন্ত রাস্তাটার বাঁধা রেট কুড়ি টাকা। অবশ্য মরশুম অনুযায়ী ভাড়ার কিঞ্চিৎ হেরফের হয়। স্টেশনপাড়া থেকে বকুলিয়া সাত কিলোমিটারের মত হবে। যাতায়াতে চোদ্দ কিলোমিটার। সে-হিসেবে ভাড়া খুব একটা বেশি বলা যায় না। আর মরশুমের দিনেও দু-এক টাকা কমে রাজী হয়ে যায় কোন কোন টাঙ্গাওয়ালা। চেঞ্জারদের সবারই পার্স তো আর ঢাউস নয়, করকরে দুখানা দশ টাকার নোট দিতে অনেকেরই গায়ে লাগে। সেটা টাঙ্গাওয়ালারাও বোঝে। কিন্তু সিরাজুর কথা আলাদা। তার এক রেট। কুড়ি টাকা দাও তো ঘোড়া নড়বে, নচেৎ নয়। ভাবটা যেন—কমে যেতে চাও তো আমার কাছে কেন, অন্য টাঙ্গাও তো আছে! তাকে যে আর সব টাঙ্গাওয়ালারা আড়ালে শাহানশা বলে তার কারণ তার ওই আমীরী মেজাজ।

সেদিনও অন্যান্য দিনের মত সাতসকালেই যথারীতি টাঙ্গা নিয়ে এসে গেছে সিরাজু। আর স্টেশনের লাগোয়া চত্বরটায় গাড়ি ভিড়িয়ে মানুষের আনাগোনা দেখছে। আটটা নাগাদ মোগলসরাই এসে পৌঁছবে। তা থেকে নামবে কিছু স্থানীয় লোক, বেশীর ভাগই চেঞ্জার। খুব কম চেঞ্জারই বাড়ি ঠিক করে আসে। আর বাড়ির খোঁজ রাখে রিক্‌শাওয়ালা-টাঙ্গাওয়ালারা, চেঞ্জাররা তা জানে। অধিকাংশই রিক্‌শা নেয়, লটবহর বেশী থাকলে টাঙ্গা। কিন্তু মোগলসরাই আসতে তখনও আধঘন্টাটাক দেরী বলে খলিলুরকে ডেকে নিয়ে তাসে বসে গেল টাঙ্গার ওপরেই। খলিলুর তাদের দেহাতেরই ছেলে, তার সাকরেদ আর বন্ধু দুই-ই। তাসের মৌতাত পেয়ে বসেছে এমন সময় পার্টিটা এলো। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, তার স্ত্রী আর তিন ছেলেমেয়ে। সাধাসিধে গেরস্তমার্কা চেহারা। শীতের দিন হলেও পোশাকের তেমন বাহার নেই। দেখেই বোঝা যায় সারাবছর বহু প্ল্যান করে আর অনেক খরচ ছাঁটকাট করে ক'দিনের জন্য সাধ মেটাতে এসেছে। বেশ ক'বছরের অভিজ্ঞতায় সিরাজুর খদ্দের-চরিত বোঝাব ক্ষমতা জন্মে গিয়েছে। এক পলক তাকিয়েই বুঝল খদ্দের সুবিধের নয়।

বকুলিয়া যাবে? ......ভদ্রলোকের প্রশ্ন?

যাবে। ... . সিরাজুর গম্ভীর জবাব, বিশ রুপেয়া লাগবে।

ভদ্রলোকের গলায় মিনতির সুর, বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে। আঠারো হয় না?

সিরাজু তাস থেকে চোখ তুলল না, বলল, আরো তো টাঙ্গা রয়েছে, ওদের কাছে যান।

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আরে তোমার ঘোড়াটা দেখে গিন্নীর খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার তেজী ঘোড়া, তাই—

সিরাজু ঠোঁট উল্টে বলল, আপনার ওয়াইফ কেন, এ ঘোড়াকে বে-পসন্দ্ করবে এমন কে আছে? আপনাদের বেঙ্গলের বহুত ফিলিমস্টারভি আমার টাঙ্গায় গেছে। ওরা এলেই এই সিরাজু রহমানের টাঙ্গার তালাস করে। বিশওয়াস না হোয় আশপাশে পুছকে দেখুন না।

ফিল্মস্টার যে টাঙ্গাতে চড়ে গেছে সেই টাঙ্গাতে চড়ার লোভে ভদ্রমহিলা আর তার ছেলেমেয়েদের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। কিন্তু গৃহকর্তা আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিলেন। —যাবে না যখন দেখি অন্য জায়গায়—বলতে বলতে ভদ্রলোক সদলবলে প্রস্থান করলেন।

খলিলুর তাস বাঁটতে বাঁটতে বলল, সুবহা সুবহা পহেলা গাঁহাক ভাগালি?

সিরাজু তাচ্ছিল্যে বলল, বেশ করেছি ভাগিয়েছি। ব্যাটা বিশ রুপেয়ার কমে যাবি তো আমার গাড়িতে কেন?

—তোর বিলকুল আমীরী মেজাজ। দেখলি তো পার্টি তেমন পযসাওয়ালা লোক নয়।

—আবে, ইসি লিয়ে তো ঔরভি ঝামেলা। ওদের সঙ্গে বাতচিত করে সুখ নেই। টাঙ্গায় চড়েই আনসান বকবক শুরু করবে। তোর তো মালুম আছে খলিলুর, এই মধুপুরের কাহানী আমার সে জাদা কারো জানা নেই। কত রঈস আদমিকে আমি ঘুমিয়েছি বল তো? বড়া বড়া সব কলকাত্তিয়া আদমি আসে, কেউ ফিলিমে অ্যাকটিন করে, কেউ গানা গায়, কেউ সিরেফ রঈস আদমি—তাদের সব কিস্‌সা আমার জানা। রাতমে কে কি করে, কোন্ হীরোর সঙ্গে কোন্ হীরোয়িনের আশনাই, আমারসে জাদা জানে কোই? এ সব কাহানি কে না শুনতে চায়? ইসি লিয়ে তো সব কোই আমাকে পেয়ার করে।

সিরাজু বাড়িয়ে বলেনি কিছু। ও এখানকার দেহাতী টাঙ্গাওয়ালাদের মত নয়। দুনিয়া সম্পর্কে ওর প্রচুর অভিজ্ঞতা। কলকাতা খিদিরপুরে তিন বছর ছিল। সেই সুবাদে বাংলা বলতে পারে। আর বাংলা ছবির নাম, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকার বিষয়ে এত খুঁটিনাটি আর গোপন কেচ্ছা জানে যে শুনে বাঙালী ছোকরাদেরই তাক

লেগে যাবার যোগাড়। শুধু কি তাই, সত্যি সত্যিই বেশ নামীদামী বাংলা ছবির কিছু নায়ক-নায়িকা ঘুরে বেড়িয়েছে ওর টাঙ্গায়। মধুপুরে ওদের বাড়ি আছে, আসে মাঝে মাঝে। আর এলেই ডাক পড়ে সিরাজুর। একসঙ্গে এমন জবরদস্ত ঘোড়া আর টাঙ্গাওয়ালা ওরা পাবে কোথায়? ঘোড়ার বাদামী শরীরটা স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা, তেল-চুকচুকে, যেন একটা রেসিং হর্স। পাঁচ-ছ'জন সওয়ারি নিয়ে তুফানের মত ছোটে। সওয়ারি পর্যন্ত বলে, সাবাশ! বাহাদুর ঘোড়া তোমার টাঙ্গাওয়ালা।

ঘোড়ার প্রশংসায় খুশি হয় সিরাজু। এই ঘোড়া তো কেবল তার ভাতভিতই নয়, তার বন্ধুও। সে নিজের হাতে ঘোড়াকে দানাপানি খাওয়ায়। আদর করে। বলতে গেলে এই ঘোড়ার জন্যেই টাঙ্গাওয়ালা হয়েছে সে। তার বাপ এই কাজ করেই কাটিয়েছে সারা জীবন। হঠাৎ কি একটা অসুখে আগের ঘোড়াটা মারা যেতে সিরাজুর বাপজান এই ঘোড়াটা কিনে এনেছে পাক্কা সতেরোশো পাকায়। তখন ঘোড়াটা সবে বাচ্ছা, পূর্ণ মরদ হয়নি। লোকজন ঠাট্টা করেছিল বুড়ো ইরফানকে। টাঙ্গা চালাতে এমন ঘোড়া কেনে নাকি, কবে পট করে মারা যাবে, ব্যস, পুরা টাকা লোকসান। বুড়ো ইরফান কান দেয়নি তাতে, সিরাজুকে ডেকে বলেছিল, লোকে যা খুশি বলুক। পহেলে দর্শনধারী। তোর যেমন জবরদস্ত চেহারা। লোকে দেখবি তোর টাঙ্গার দিকেই ছুটবে। মাফুজ শেখের ঘোড়াটা টগবগে ছিল বলে সে মধুপুরের বাজারে হোটেল খুলেছে, আর আমি ল্যাগবেগে ঘোড়া নিয়ে চার বিঘে ক্ষেতিও করতে পারিনি। বছর দু'য়েক যেতে না যেতেই ঘোড়া উপযুক্ত হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে সিরাজুও, ইরফান বলেছে, আমি তো বুড়ো হলুম, এবার টাঙ্গার দায় তুই নে।

—আমি ?........সিরাজু আকাশ থেকে পড়েছিল।

—হ্যাঁ, তুই। দেখিস আল্লার দোহায় ভালই হবে।

বুড়ো বাপজানের কথা ঠেলতে পারেনি সিরাজু। খিদিরপুরের কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানেই রয়ে গেছে। মন্দ নয় রোজগারপাতি। ছ'মাস প্রায় সীজন, অক্টোবর থেকে মার্চ। দৈনিক গড়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা, কোন কোন দিন পঞ্চাশও হয়ে যায়। মেজাজটা যদি অত চড়া না হত তাহলে আরো লুটতে পারত।

বদ স্বভাবের জন্য যে তার ক্ষতি হচ্ছে এটা সে বোঝে বৈকি। মেজাজ দেখিয়ে যেগুলি সে ছেড়ে দেয় সেই সব পার্টিকে লুফে নেয় অন্য টাঙ্গাওয়ালারা। এমন কি আড়ালে-আবড়ালে নিন্দেও রটায়,—ওর কাছে কখনও যাবেন না বাবু। ও বেটার আমীরী মেজাজ। শাহানশা-বাদশা লোক।

........এদিকে আসছে বছর ওর সাদি হবে, ঠিক হয়ে আছে। পাশের গাঁয়ের নকীব মোল্লার মেয়ে, নাম হাসিনা। হাসিনার বয়স বছর ষোল বাড়ন্ত গড়ন, ধলা-ধলা রঙ। ইরফান বুড়ো তো হাসিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, মেয়ে তো নয় হুরী পরী।

সিরাজু অবশ্য দেখেছে হাসিনাকে, তার তেমন কিছু মনে হয়নি। এমন দারুণ রূপসী মেয়ে সে দেখেছে যে হাসিনাকে সে-রকম চোখে লাগাব কথাও নয়। তবে ওদের ঘরে ওই যথেষ্ট। তা বড়লোকের বাড়ি কুটুমপাতাতে চলেছে, বিয়েতে খরচ-পত্তর হবে প্রচুর। মোটা রকমের টাকাকড়ির দরকার। কিন্তু সে হিসেবে রোজগাব কোথায় তার? অবশ্য এত মেজাজ দেখালে এমনই হবার কথা। কিন্তু স্বভাব যে বদলাচ্ছে না কিছুতেই!

এক সময় সিরাজু খলিলুরকে বলে, এ বছর সিজিনটা কেমন ডাল, না রে খলিলুর?

খলিলুর অবাক হয়, না তো! চেঞ্জাব তো বহুত এসেছে, কোঠি মিলছে না বলে ঝাঝা-শিমুলতলা ভাগছে। তুই কোই খবর রাখিস না।

—আবে উও নেহি, আমি বলছিলুম রঈস আদামী আসেনি তেমন। হ্যাপি নুক, নিরালা, বিশ্রাম, পথের শেষে—সব কোঠিই তো ফাঁকা।

—আবে ও সব তো ফিলিম-স্টারদের কোঠি। পথের শেষে উঠে রজতকুমার, নিরালা মধুমায়া দেবী, ওঁর বিশ্রামমে সৌরভবাবু। ওরা বহুত বিজি আদমী, হর বরষ আসতে পারে নাকি? যা কে দেখ, উ সব সিমলা রাণীক্ষেতমে ঘুমছে। মধুপুরকে কি আছে বে, যে হর সাল আসতে যাবে?

সিরাজু আস্তে আস্তে বলে, মধুমায়া বলেছিল, জাড়াকে টাইম ফির আসব।

ইসি লিয়ে দিমাক খারাপ করে বসে আছিস? তেরা য্যায়সা বুদ্ধু আমি আর দুসরা দেখিনি—

—সীজন তো আভিভি খতম হয়নি, টাইম আছে। দেখিস, মধুমায়া জরুর আসবে। পহ্‌লে তো রাজকুমার আর মধুমিতা একই কোঠিমে উঠত। সে কি পেয়ার রে! তারপর সব গড়বড় হয়ে গেল। কাঁদত মেয়েটা। সেলিমার রুলানা নয়, সাচমুচ। ওদের ভি তো দিল আছে—তুই বেটা কি জানিস?

—তুই জানিস?

—জরুর।

হ্যাঁ সত্যিই জানে সিরাজু। সে কথা সে কাউকে বলেনি, মনের পর্দার আড়ালে সে লুকিয়ে রেখেছে। যার এক ফোঁটা চোখের জলে লাখ লাখ মানুষ চোখের জল মিশিয়েছে তাকে অঝোরে কাঁদতে দেখেছে সিরাজু। রজতকুমার মধুমায়া যখন একসঙ্গে থাকত তখন সন্ধ্যার দিকে ওদের হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেত সে। বছর দুই চলে ওরকম। তৃতীয় বছরে সিরাজু অবাক হয়ে দেখল ওরা একই সময়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু উঠেছে আলাদা আলাদা বাড়িতে। বাড়ি দুটো বেশী দূরে দূরে নয়। রজতকুমার,

সঙ্গে চার পাঁচজন ইয়ারবক্সী। অন্যবারের মত সন্ধেয় আর বেরোয় না, দিনরাত মদের বোতল নিয়ে পড়ে থাকে। সিরাজুর বাঁধা খদ্দের ওরা। কিন্তু রজতকুমার প্রায় দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মধুমায়া কিন্তু তার টাঙ্গাতেই বেরিয়েছিল সন্ধেয়।

অন্যবারের মত আর পাঁচটা কথা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ নয়, জিজ্ঞাসা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই। রজতকুমারের কথা। —ওবাড়ি গিয়েছিলে? কি দেখলে? চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, না? আমার কথা বলছিল?

নাম-করা কোন অভিনেত্রী নয়, যেন একটা সাধারণ মেয়ের কথাবার্তা। সিরাজু কি জবাব দেবে? কোন কিছুই অবশ্য আবছা নয় তার কাছে।

—দিনরাত মদ গেলে, না?

এর উত্তরটা অবশ্য ভাল রকমই জানা তার। ইয়ারবক্সী আর মদের বোতলে ঘেরা মানুষটাকে নিজের চোখেই তো দেখেছে সে। তাই সত্যি কথাই বলে সে, হাঁ, শরাবে চুর বিলকুল।

তার পরই সেই কান্না। পথ নির্জন, লোকজনের আনাগোনা ওদিকটায় এমনিতেই কম। বাংলা ফিল্মেব নামী নায়িকা মধুমায়া আটপৌরে একটা গেরস্থ মেয়ের মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, বলেছিল, ওর শরীর ভাল নয়, আমি জানি। এত নেশা করলে ও মারা যাবে। তুমি তো যাও ওখানে, একটু নিষেধ করে দিও না ভাই। এত নাম-করা মানুষ হলে কি হবে, ওর কোন বন্ধু নেই। ওর সঙ্গে যাদের দেখেছ ওরা কেউ বন্ধু নয়, শত্রু। সবাই ভেতরে ভেতরে ঈর্ষা করে, ঘেন্না করে। সবাই চায় তাড়াতাড়ি ও শেষ হয়ে যাক। অথচ সেটা ও বোঝে না। বুঝলে কি আমায সরে আসতে হত?

একেই বলে ভালবাসার জ্বালা। ভালবাসা অন্ধ, দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। কিন্তু এক নির্জন শীতার্ত সন্ধ্যায় বেঙ্গলের বক্স-অফিস-সফল জনচিত্তজয়ী নায়িকা মধুমায়া দেবীর মনের কথা খুলে বলার দোসর কিনা সামান্য এক টাঙ্গাওয়ালা! এ বাস্তব, তবু যেন গল্পকথা।

কোন উত্তর দেয়নি সিরাজু। কিছুক্ষণ পর কান্না মুছে মধুমায়া বলেছিল, তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ, না সিরাজু ভাই?

অবাক সে হয়েছিল বৈকি, দারুণ অবাক। আর জেনেছিল দূর থেকে যেমনই মনে হোক, রূপালি পর্দায় যাদের দেখা যায় তারাও আসলে মানুষ, খুব সাধারণ মানুষ। এ-গল্প সে বলেনি কাউকে। ঠাট্টা তামাসার ভয় তো আছেই, তা ছাড়াও অত বড় একজন অভিনেত্রীকে ছোট করে ফেলার ভয় আছে।

যাবার আগের দিন বেড়াতে বেরিয়ে বলেছিল মধুমায়া, আবার আসব সামনের শীতে। ভাল লাগে জায়গাটা। আমি এলে কিন্তু তোমার টাঙ্গা আমারই জন্যে, আগাম

বলে বাখলাম।

সীজন কিন্তু ফুবিযে এলো। না এলো বজতকুমাব, না মধুমাযাদেবী, না সৌবভ সেন। নিবালা, বিশ্রাম আব পথেব শেষ এবাব আব উজ্জ্বল একঝাঁক মানুষেব কাকলিতে মুখব হযে উঠল না। ইউক্যালিপটাস-পলাশ আব নানান্ গাছগাছালিতে সাজানো পাঁচিলঘেবা শান্ত নিঝুম বাড়িগুলোব পাশ দিযে টাঙ্গা হাঁকিযে যেতে যেতে বুক কব কব্ কবে সিবাজুব। ফেব্রুযাবি শেষ হযে এলো। আব কিছুদিন পবে ড্রাই সিজন শুরু হযে যাবে। শুখাব দিনেব ধুলোভবা বাতাসে শ্রীহীন হযে সখেব বাগানবাড়িগুলো। দূব প্রান্তবেব বাঙামাটিব ঢেউযে তখন হযতো শাল-পলাশেব বনে বঙেব উৎসব আসবে, কিন্তু তাব টানে এই মধুপুবে কেউ ছুটে আসবে না। সিবাজুব বুকটা ব্যথা-ব্যথা কবে।

দেখতে দেখতে চলে যায শীত। এবাবকাব মত চেঞ্জাবদেব আসা-যাওযা ফুবোল। অবশ্য দু'চাবটে ছুটকো লোক ফাগুন-চৈত্রেও আসে। না শীতেব তীব্রতা, না গবমেব বাড়াবাড়ি। মনোবম ওযেদাব। তাছাড়া বিহাবেব এ সব বাঙামাটিব অঞ্চলে বসন্তেব একটা আলাদা চার্ম আছে।

নাম কবা হিবো সৌবভ সেন একবাব চৈত্রেব মাঝামাঝি এসেছিল। আশা ছিল শীতে না এলেও খামখেযালী সৌবভ সেন বসন্তে এসে পড়তে পাবে। কিন্তু এলো না কেউ। চেঞ্জাব উদ্বেলিত মধুপুব তাব কার্নিভালেব চেহাবা হাবিযে মবশুম-ছুট আটপৌবে চেহাবায ফিবে গেল, স্টেশনচত্ববে টাঙ্গাব ভিড় হাল্কা হযে এলো, তখন সিবাজু বুঝল এবাবকাব মত তাব ছুটি। এবাব তাকে ক্ষেতিব কাজে ফিবে যেতে হবে। কবতে হবে সংসাবেব প্রতি কর্তব্য। সাদি ঘনিযে এলো। হাসিনা মধুমাযা নয, কিন্তু আব জীবনেব নাটকে সে তো অবধাবিত ভাবেই এক নাযক, আব হাসিনা সেই নাযিকা। হাসিনাব হাসিমুখ দেখবাব জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকাব কবতে হবে তাকে। কবাই উচিত। মধুমাযাব চোখেব জল এক মস্ত শিক্ষা দিযেছে তাকে।

কববে সে সবকিছুই। কবেনি যে তাও নয। শাহানশাব মেজাজ দেখালেও একটা দিনও সে টাঙ্গা হাঁকানো বন্ধ বাখেনি, যাত্রীদেব কাছে মধুপুবেব বহু কিস্‌সা-ই শুনিযেছে। টাকাও কামিযেছে ভালই। তবু কেন মবশুমটাকে বন্ধ্যা মনে হয সে ভেবে পায না। আব কলকাতাব রূপোলি পর্দাব দুনিযাব বাদশা-বেগমবাও কি কোন দিন জানতে পাববে বিহাবেব এক অখ্যাত শহবেব সামান্য এক টাঙ্গাওযালাব মবশুমটা কেন অর্থহীন আব শূন্য হযে গেল?

**প্রসাদ**

# জামিন

আঙুরলতা জানত না যে সাপের মতো নিঃসাড়ে হাঁটতে পারে প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষ। সাপের চেয়েও সন্তর্পণ। সতর্ক। আঙুরলতার এখন সতর্কতার শেষ নেই। তার মুখখানা ঘোমটার আড়ালে প্রায় চাপা পড়েছে। দূর থেকে কেবল একটা চলমান শরীরী অস্তিত্ব চোখে পড়বে, এর বেশি কিছু নয়। মানুষটা কে বোঝা শক্ত। বিকেলের ঘন ছায়া বিছিয়ে আছে বাঁশবনে। সেই বনের পায়ে চলা সুঁড়ি রাস্তা ধরে, চুপি চুপি পা ফেলে ফেলে, চারদিকে চোরা চাউনি হানতে হানতে মহাকালের মন্দিরটার সামনে এসে থামল আঙুরলতা। ছোট্ট পোড়ো মন্দির। ইট-বের-করা। অশ্বত্থ-বটের চারায় আবিল। মন্দিরের অবস্থা দেখে বোঝা যায় অনেককাল এখানে কেউ পুজো দিতে আসেনি।

তাহলে আঙুরলতা এল কেন? এমন অসময়ে—সূর্য যখন ঢলে পড়েছে আর মস্ত বড় বাঁশের জঙ্গলটায় ভৌতিক ছায়া নেমে এসেছে? না, আঙুরলতা অভিসারে আসেনি। সে বয়সও তার নেই। তার মুখের চামড়া কোঁচকানো, চোখের কোল পরিখার মতো গভীর। ছেঁড়া মাথার কাপড়ের ভেতর থেকে উঁকি মারছে রুপোর তারের মতো চুল। আঙুরলতার যৌবন কবেই চলে গেছে।

মন্দিরের কপাট নেই। ভেতরে ঢোকার মুখটায় হাঁটুখানেক উঁচু করে ইট সাজানো। ভেতরে ঢোকার আগে আঙুরলতা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকটা ওঠানামা করছে ভীষণ। বাড়ি থেকে মন্দিরটা এমন কিছু দূর নয়। এক দমে আসা যায়। তবু এটুকু আসার পরিশ্রমে সাংঘাতিক হাঁপাচ্ছে সে। আসলে পরিশ্রম নয়, ভয়। ভয়ের ব্যাপার এটা। ভয়েরা যেন হাজার চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

একটু ধাতস্থ হবার পর আঙুরলতা চাপা গলায় ডাকল, 'ধনা, ঘুমুচ্ছিস নাকি?'

'কে?' ফিসফিসে চাপা গলার আওয়াজ ভেসে এল মন্দিরের গহন থেকে।

'আমি।'

'ভিতরে এসো।'

ইটের সারি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল আঙুরলতা। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না। হাতের ঠাহরে কুপি খুঁজে নিয়ে জ্বালল সে। কুপির আবছা আলোয় দেখা গেল এক কোণে জড়সড় হয়ে কে যেন বসে আছে। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। পরনে চেককাটা লুঙ্গি। এক মুখ অগোছাল দাড়ি। এলোমেলো রুক্ষ চুল। বোধহয় বেশ কিছুদিন আলোর জগতে বেরয়নি ও। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো। আঙুরলতার ছেলে ধনঞ্জয়।

'এত দেরি হল আজ?' আস্তে আস্তে শুধলো ধনঞ্জয়।

'কী করব বল? পুলিশ তো যখন-তখন আসছে। গোয়েন্দা লেগেছে। গাঁয়ের পাঁচজনও আসছে যাচ্ছে। কার মনে কী আছে কী করে বলব? কাউকে বিশ্বাস নেই। এই সন্ধের মুখটাতেই বাড়ি একটু ফাঁকা হয়। এর আগে আসার জো নেই। তাই পাড়া-পিতিবেশিদের কেউ কেউ কি সন্দ করে না? করে। এখন তারা যদি না পুলিশকে বলে দেয় তবেই বাঁচোয়া।'

'টর্চটা এনেছ? কাল একটা সাপ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। দিনের বেলা বলে রক্ষে। রাতে হলে মুশকিল হয়ে যেত। তা বাদে রাতবিরেতে বেরতেও হয়— দিনে উপায় কোথায়? একটা টর্চ খুব দরকার।'

'টর্চ আছে সঙ্গে।' এই বলে পেটকাপড়ের ভেতর থেকে দু'সেলের টর্চ আর ভাতের থালা বের করে দিল আঙুরলতা। বলল, 'গতকালও সদর রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শুনলুম।'

'জিপ এসেছিল? কখন?' ধনঞ্জয় সোজা হয়ে বসল উত্তেজনায়।

'রাত দুটো আড়াইটে হবে তখন।'

'তুমি কি সারা রাত জেগে থাক নাকি?'

'তুই তো চোখের ঘুম কেড়ে নিইছিস ধনা। ডাকাতের মায়ের চোখে কি ঘুম আসে? তুইও কি আর ঘুমোতে পারছিস! ক'দিনে তোর বয়েস বেড়ে গেছে হু-হু করে। যেদিন মাঝরাতে তোর বাবাকে ধরে নিয়ে গেল সেদিন থেকে সবার ঘুম বিদেয় নিয়েছে। ঘরের চাল থেকে শিশির পড়ার আওয়াজটুকুও শুনতে পাই।' আঁধারঢাকা ঘরে আঙুরলতার দীর্ঘশ্বাস আলোড়ন তোলে।

'বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার পর কদিন হল বলতো?'

আঙুরলতা আঙুলের গাঁট গুণতে লাগল, 'আজ নিয়ে তেরদিন।'

'কোথায় নিয়ে গেছে খবর পেলে।'

'সে তো এ রাজ্যিতে নয়, অন্য মুল্লুক। সবাই তো তাই বলে। মুখ্যু মেয়েমানুষ, অতশত আর কি জানি!'

'বাবাকে ছাড়বার ব্যবস্থা কিছু হল?'

'লোকে বলেছ জামিন দেবে না। অনেক টাকারও দরকার। কোথা পাব এত

টাকা? আর কেই বা অতদূরে তত্ত্বতালাশ নিতে যাবে? হাজতে থাকাই নাকি বড় কষ্ট। বুড়োমানুষটা ওখানেই না মারা যায়! কী হবে রে ধনা?'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ওর ভেতরে একটা লড়াই চলছে। অনেকটা পর আস্তে আস্তে বলল,'আমি ধরা দিলে সব চুকে যায়। সারেন্ডার করব?'

'সেটা কী রে ধনা?'

'ধরা দেবো?'

'ধরা পড়লে কি হবে?'

'কী আর হবে? পাঁচ-সাত বছরের জেল হবে।'

'লোকে বলছে আরও খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে। তোরা নাকি একটা পুলিশের লোককে মেরে ফেলেছিস?'

ধনঞ্জয় ঘাড় নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোর বুড়ো বাপটা আর আর বোধহয় ফিরে আসবে না।' আঙুরলতা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে।

'তাহলে আমি বরং সারেন্ডার কবি।'

আঙুরলতার গলায় এতক্ষণ কান্নার আভাস ছিল। হঠাৎ সে শক্ত গলায় বলে উঠল, 'না। তোর বাপের যা হয় হোক।'

বাঁশের জঙ্গল থেকে ঝিঁঝির একটানা ডাক ভেসে আসছিল। গাছগাছালিগুলো কালচে হয়ে আসছে। দিনমানের পরিচিত বনটা কেমন রহস্যময়। কুস্বরে একটা পাখি ডাকছে। মহাকালের চত্তরকে ঘিরে কেমন একটা প্রেতায়িত আবহ।

আঙুরলতা বলল,'ভোরবেলা আসব। তুই ঘুমুবার চেষ্টা কর। আর কিছু তোর দরকার?'

এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত থাকার পর ধনঞ্জয় জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'এক বান্ডিল বিড়ি এনো। নেশার জিনিস তো! না পেয়ে পেট ফোলে।

'আনব। আর যা দরকার বলবি। লজ্জা করবি না,' এই বলে অঙুরলতা সন্ধের ছায়ায় গা ঢেকে বাড়ির রাস্তা ধরল।

## দুই

তেরোদিন আগে একটা ভয়ঙ্কর রাত এসেছিল বাজিতপুর গ্রামের রক্ষিতদের বাড়িতে। সেই ভয়ানক রাতটার কথা ভাবলে আজও দেহের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চায় আঙুরলতার। গোটা গ্রাম তখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমচ্ছে। চারদিকে সব চাষীবাসির ঘর। সাঁঝবেলা ইস্তক মাঠে ঘাটে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে কাঁথাকানির বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই মড়া হয়ে যায়। আঙুরলতা সে-রাতে কাজকর্ম সেরে আর রেডিওতে

এগারোটা পর্যন্ত গান শুনে দুটো মেয়েকে নিয়ে একঘরে শুয়েছে। পাশের ঘরে শুয়েছে ধনঞ্জয়ের বাপ। ধনঞ্জয়ের শোবার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। কখনও সে ঘুমায় বাপের সঙ্গে কখনও বন্ধুর বাড়ি। সে রাতটায় ধনঞ্জয় বাড়ি ছিল না। ওদের নাকি ফিস্ট ছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে এক বন্ধুর বাড়ি রয়ে যাবে, বলে গিয়েছিল। ধনার বাপ কাশিতে ভোগে। অনেকরাত পর্যন্ত পাশের ঘর থেকে ধনার বাপের ঘঙঘঙ কাশির আওয়াজ আর হাঁপের টান ভেসে আসছিল। সেই সব শুনতে শুনতে আঙুরলতার খাটা খুটুনির শরীর কখন যে ঘুমে তলিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল কড়া নাড়ার শব্দে। সেই সঙ্গে ভেসে এল কুকুরের চেঁচামেচি। এত রাতে কুকুর ডাকে কেন? চোর ডাকাত পড়ল নাকি?

'দরজা খোল।' ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে দরদালানের দরজাটার ওপাশ থেকে। সেই সঙ্গে আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ। জোরাল নয়, মৃদু আওয়াজ।

'কে?' ধনঞ্জয়ের বাপ সুদর্শনের গলার আওয়াজ শুনতে পায় আঙুরলতা।

'আমরা পুলিশ। বাড়ি সার্চ করব।'

আঙুরলতার হাতে পায়ে তখন কাঁপুনি এসে গেছে। কি করবে ভেবে পায় না। সুদর্শন হাজার হোক পুরুষ মানুষ। সাহস করে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক পুলিশ ভেতরে ঢুকে পড়ে। সব লম্বা চওড়া মানুষ। মাথায় টুপি, কোমরে অস্তর গোঁজা।

'এই বুড়ো, ধনঞ্জয় রক্ষিত তোর কে?' সবচেয়ে মাথায় উঁচু আর শক্ত চেহারার লোকটা শুধোয়।

'আমার ছেলে।' বিকারগ্রস্তের মতো গলায় সুদর্শন জবাব দেয়।

'কোথায় সে?'

'ধনা তো বাড়িতে নেই।'

'তাহলে কোথায়?'

সুদর্শন এক লহমা থমকে থাকে, তারপর তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'সে তো এখন শহরে।'

'আমাদের কাছে খবর আছে সে গ্রামেই রয়েছে।' ধমকটার সুর চাপা, কিন্তু তা যেন সিংহগর্জন।

'আমি কি মিথ্যে বলছি?' সুদর্শন একটু সাহসী হতে যায় বয়সের দাপটে। আর এখানেই সে ভুল করে বসে। প্রশ্নটার ঔদ্ধত্যে পুলিশ অফিসারটি কিছুক্ষণের জন্যে থমকে যায়। তারপরই একটা কঠিন চড় আছড়ে পড়ে সুদর্শনের পঁয়ষট্টি বছরের মুখ খানায়।

'আবার চোপা হচ্ছে! জানিস তোর ছেলে কি করছে! ডাকাতি। উড়িষ্যায় ডাকাতি

করে এসেছে। পুলিশ মার্ডারের চার্জ আছে তোর ছেলের বিরুদ্ধে। সেজন্যই তো খোদ লালবাজার থেকে আসতে হল আমাদের।'এই বলে ওরা সুদর্শনের ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। জনা তিন পুলিশ ঘরের সবকিছু হাঁটকাতে লেগে যায় তৎক্ষণাৎ। তন্ন তন্ন করে খোঁজে। ওদের অনুসন্ধানী হাতের আগ্রাসন থেকে বাক্সপ্যাঁটরা থেকে শুরু করে চুপড়ি চাপা দেওয়া এঁটো ভাতের থালা পর্যন্ত রেহাই পায় না। বুটের আঘাতে ছিটকে যায় নানা জিনিস! প্রায় আধঘন্টা ধরে দুটো ঘরে চলে সার্চের তান্ডব। তারপর একজন হতাশ গলায় বলে, 'কোনও মালই পাওয়া গেল না স্যার। ধনঞ্জয়টা পাক্কা শয়তান।'

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করে। মাথায় উঁচু লোকটা সুদর্শনকে বলে, 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ছেলেকে না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়া হবে না তোকে। কদিন হাজতে ভাত খেয়ে আসবি চল। ডাকাতির টাকায় তো অনেক ভালমন্দই খেয়েছিস।'

সুদর্শনকে ওরা ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিযে যায়। একটু পরে জিপের শব্দ ভেসে আসে। গাড়ির জোরাল আওয়াজের পরও বাজিতপুরের কর্মক্লান্ত মানুষরা তলিয়ে থাকে অঘোর ঘুমে।

এরকম আচমকা ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে আঙুরলতার মতো আকাট মুখ্যু মেয়েমানুষের দেরি হবার কথা। দেরি হয়। আঙুরতলার বুকের ভেতরটা কিছুক্ষণ থম মেরে থাকে আসন্ন ঝড়ের আগের মুহূর্তের মতো। তারপর হাহাকার করে উঠে তার হৃদয়। *পঁয়ষট্টি বছরের লোকটাকে জানোয়ারের মতো হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ধরে নিয়ে গেল!* গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, আর দু'পাট করা ছেঁড়া ধুতি। আহা রে, না জানি কত কষ্ট দেবে! এখন বেঁচে ফিরলে হয়! এতসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে আসে। উঠোনোর কোণের পেয়ারা গাছটার ফাঁক দিয়ে শুকতারা দপদপ করে। গোয়ালঘরটার দাওয়া বসে হু হু করে চোখের জল ফেলে আঙুরলতা।

## তিন

সাকুল্য দু'খানা ঘর আর এক চিলতে দরদালান নিয়ে আঙুরলতার বাড়ি। তারপর উঠোন। উঠোনের এক ধারে গোয়ালঘর। দবদালানে টুলের ওপর বসেছিল কল্যাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক যুধিষ্ঠির রায় এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান নিতাই মান্না। ওঁদের থেকে কিছু তফাতে ঘোমটা মাথায আঙুরলতা জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে। এসব মানীগুণী লোকের কাছে কথা বলতে গিয়ে তার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। অথচ সেই পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ডাকিয়ে এনেছে রায়মশাই আর মান্নাবাবুকে।

যুধিষ্ঠির রায় বললেন, 'নির্দোষ মানুষটাকে ধরে নিয়ে গেল। খুবই দুঃখজনক

ব্যাপার। ভেরি স্যাড ইনসিডেন্ট। সুদর্শনদার সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের জানাশুনো। গতবারের ভোটে আমার জন্যে অনেক খেটেছিলেন। তাঁর জন্যে কিছু করতে পারলে খুশিই হব। আপনাদের পাড়ার ছেলেরা অনেকদিন আগেই ব্যাপারটা জানায় আমাকে। খোঁজখবর নিতে কসুর করিনি। কিন্তু জিনিসটা প্রায় আমার হাতের বাইরে।'

আঙুরলতা প্রত্যেকটা শব্দ মন দিয়ে শুনছিল। অস্ফুট গলায় বলল, 'কেন? আপনাদের তো অনেক ক্ষমতা।'

যুধিষ্ঠির রায় হাসলেন, যতটা শুনেছেন ততটা নয়। তাছাড়া কেসটা এখানকারও নয়। এ রাজ্যেরই নয়। জায়গাটা পুরীর কাছাকাছি। সুন্দরগড়ের একটা রাইস মিলের মালিকের বাড়ি ওরা হানা দিয়েছিল। মালিক ঝানু ব্যবসাদার। থানায় ফোন করে দিয়েছিল। পুলিশ এসে যায় তাড়াতাড়ি। এনকাউন্টারে একজন পুলিশ মারা যায়। তারপর ব্যাপারটা এসে যায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডারে। পুলিশ খুন না হলে কাণ্ডটা এতদূর এগোত না। সরকারের গায়ে হাত পড়েছে বলে কড়া স্টেপ নিয়েছে। জনা দুই ছেলে ধরাও পড়েছে। তাদের কাছ থেকেই আপনাদের ঠিকানা পেয়েছে।'

আঙুরলতা বলে, 'কিন্তু জিনিস তো কিছু পায়নি।'

নিতাই মান্না বললেন, 'তাতে কিছু যায় আসে না। পুলিশ ইচ্ছে করলে যেরকম সুবিধে কেস সাজিয়ে নিতে পারে। ইচ্ছে করলে সুদর্শনদাকেও জড়িয়ে দিতে পারে।'

'বলেন কি!' আঙুরলতা চমকে ওঠে, 'ওই বুড়ো মানুষটাকে?'

'হ্যাঁ, তাই।' মান্নাবাবু বলতে থাকেন, 'তবে অতদূর গড়াবে না আশা করি। ছেলেকে পেলেই বাপকে ছেড়ে দেবে।'

'ও এখন কোথায় আছে?'

আঙুরলতার প্রশ্নটা প্রথমে যুধিষ্ঠির রায় বা নিতাই মান্না বুঝে উঠতে পারে না। বুঝতে একটু দেরি হয়। তারপর রায়মশাই বলেন, 'ওঃ, সুদর্শনদার কথা বলছেন? সুদর্শনদা আছেন সুন্দরগড় জেলার একটি থানায়। আমার লোকেরা ঠিকানা এনেছে।'

'সে বুঝি অনেক দূর? আমার ছেলে এতদূরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল?' জিগ্যেস করে আঙুরলতা। যুধিষ্ঠির রায়ের ঠোঁটে এম. এল. এ সুলভ হাসি ভেসে ওঠে, 'ডাকাতদের আবার কাছে দূরে আছে নাকি? ওদের গ্যাং আছে। আন্তঃরাজ্য চক্র। এসব আপনি ঠিক বুঝবেন না বৌদি।'

আঙুরলতার কানে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আন্তঃরাজ্য চক্র ইত্যাদি কথা পুরুত ঠাকুরের সংস্কৃত মন্ত্রের চেয়েও কঠিন লাগে। কথাগুলোর মানে সে কিছুই বোঝে না। তবে শব্দগুলির কাঠিন্য থেকে সে শুধু একটা কথা বোঝে যে তার স্বামী কিংবা ছেলে বেশ শক্ত ঝামেলার মুখে পড়েছে। চুপ করে থাকে সে।

যুধিষ্ঠির রায় সিগারেট ধরান। নিতাই মান্নাকেও অফার করেন। একমুখ ধোঁয়া

ছেড়ে রায়মশাই বলেন, 'ব্যাপার কতখানি গুরুতর আপনি বুঝতে পারছেন না বৌদি। শুনলে অবাক হবেন পুলিশটা আপনার ছেলের গুলিতেই মরেছে।'

আঙুরলতা প্রতিবাদের গলায় বলে, 'তা কী করে হবে? ধনা তো বন্দুক চালাতে জানে না!'

'বন্দুক নয়। রিভলবার। কে কোথায় অস্ত্র চালাতে শিখবে তার কি কোনও ঠিকঠিকানা আছে নাকি? ওর সব মুভমেন্ট কি আপনার পক্ষে জানা সম্ভব? কোনওদিন কি ভেবেছিলেন আপনার ছেলে এরকম নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে? আপনি ঘরের মধ্যে ছেলেকে একরকম চেনেন, দলের মধ্যে ও অন্যরকম। ঘরে আর বাইরে মানুষ আলাদা আলাদা রকম।'

'তা বলে আমার ছেলেকে চিনতে আমার ভুল হবে?' দু'জন দোর্দণ্ডপ্রতাপ এবং সম্মানিত ব্যক্তির কথাও যেন মন থেকে মেনে নিতে পারে না আঙুরলতা।

এবার নিতাই মান্না বুঝি একটু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। চাপা বিরক্তির সুরে বললেন, 'না, আপনার ছেলে মহাপুরুষ। তাই পুলিশ পেছনে লেগেছে। তাদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই আর কি! মায়েদের চোখে সব ছেলেই ভাল। তাহলে এত মন্দ ব্যাপার ঘটছে কোত্থেকে?'

'থাকগে, বৌদিকে ওভাবে বোলো না। মায়ের প্রাণ তো। তার ওপর যার হাজব্যান্ড দোষ না করেও হাজতে পচছে তার মেন্টাল কন্ডিশনটাও আমাদের বোঝা দরকার নিতাইভায়া। তা এখন আমাদের কী করতে হবে বলুন বৌদি।' বেশ অমায়িক গলাতেই কথাগুলো বলে যান যুধিষ্ঠির রায়।

'ওকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করুন।'

'জামিনের ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগবে।'

'কত?'

'কম করেও পাঁচ ছ'হাজার টাকা।'

'সে তো অনেক টাকা!' আঙুরলতার গলায় অসহায়তার সুর।

'হ্যাঁ, অনেক টাকা!' যেমন রোগ তেমন ওষুধ লাগবে তো। আমি তো কম করে বলেছি। যাতায়াতের খরচ, হোটেলে থাকার খরচ, কোর্ট খরচ, তা বাদে ঘুষ—এলাহি ব্যাপার। ছ'হাজারে কুলোলে হয়।'

'অত টাকা পাব কোথায়?'

'আপনি কোথায় পাবেন? যার কাছ থেকে পাওয়া যাবে তাকে ধরুন।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না আঙুরলতা। সে বোকাটে চাউনিতে চেয়ে থাকে যুধিষ্ঠির রায়ের দিকে। রায়মশাই সেটা বুঝে একটু বিশদ হন, 'বাবার জামিনের টাকা মিলবে ছেলের কাছ থেকে। সুন্দরগড়ের ডাকাতিতে কত টাকা হাতিয়েছে ওরা তা

জানেন? তিন লক্ষ টাকা।' একটু থেমে বলেন, 'এত টাকা কোথায় গেল? ভরি দশেক সোনার জিনিসও নিয়ে এসেছে, বুঝলেন? এখন ছেলের সঙ্গে যোগাযোগটা হলেই জামিন আটকাবে না। ও-ই সাপ্লাই করবে টাকা। ধনঞ্জয়ের হদিশ রাখেন?'

বিধায়ক মশাইয়ের শেষ কথাটা শুনে আঙুরলতার মনে হয় সে একটা বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে ফেলেছে। একটা প্রচণ্ড শক্ তাকে যেন অবশ করে দেয়। শরীরটা কাঁপতে থাকে থর্থর্ করে। ঠোঁটের কাঁপুনি চাপা দিতে আবছা গলায় কী যে উত্তর দেয় সে নিজেও জানে না।

পঞ্চায়েত প্রধান সেটা বোধহয় লক্ষ্য করলেন। দক্ষ তীরন্দাজের মতো একেবারে হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'ধনঞ্জয় কোথায় আছে বলবেন?'

দিন দুই আগে লোকাল থানা থেকে পুলিশ এসেছিল। দিনের বেলাতেই। জেরায় জেরায় অস্থির করে তুলেছিল। উত্তরে আঙুরলতা অনেক কথাই বলেছিল। কেবল একটি কথা বলেনি। ছেলের ঠিকানা দেয়নি সে। বলেছিল, 'আমি কী করে জানব সে কোথায় আছে? আমাকে কী বলে গেছে?' মোক্ষম কথা। তার এই বোকাটে আর সরল উত্তরে খাকি পোশাকের লোকগুলো ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিল।

আঙুরলতা ধীরগলায় বলল, 'আমি জানি না। সে আমাকে বলে যায়নি।' এই বলে সে চোখ নামাল। নিতাই মান্না খর নজরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটা যেন তার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হল আঙুরলতার।

যুধিষ্ঠির রায় টুল ছেলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আমাদের ওপর বিশ্বাস না রাখলে আমরা তো কিছুই করতে পারব না। রাস্তা তো দুটো। হয় জামিনের টাকা যোগাড়, নয়তো আপনার ছেলের সারেন্ডার। এর কোনওটা না হলে আমাদের আর করার কী আছে? চল হে নিতাই।'

রায়মশাই আর মান্নাবাবু চলে যাবার পর আঙুরলতা বড় মেয়ে মালতীকে ডেকে বলল, 'আজ আমার শরীরটা ভারি খারাপ। রান্নাবান্না তুই কর। ভাতটা তুই-ই আজ দাদার কাছে দিয়ে আসবি। জিগ্যেস করিস তো কত টাকা তোর দাদার কাছে আছে।'

এই বড় মেয়েটি তার খুব বিশ্বাসের। খুব নিরীহ আর চুপচাপ প্রকৃতির। মালতী জানে আর দাদা কোথায়। কিন্তু প্রাণ গেলেও সে কোথাও তা প্রকাশ করবে না। কিছুটা লেখাপড়া শেখার জন্যে তার স্বভাবে একরকম গাম্ভীর্যও আছে। বলল, 'বাবাকে ছাড়াতে আমাদের তো অনেক টাকা দরকার, নয় মা? আমি বরং জিগ্যেস করব দাদা কত টাকা দিতে পারবে। কেমন?'

'তাই করিস।'

ছ'সাত হাজার টাকা বাজিতপুর গ্রামের অনেকেব কাছেই হয়তো তুচ্ছ টাকা। কিন্তু আঙুরলতা জানে ছ'সাত হাজার টাকা মানে টাকার পাহাড়। এই পাহাড়ের একটা

টুকরোও তাদের ঘরে খোঁজ করলে মিলবে না। তার বাপের বাড়ির অবস্থা অবিশ্যি বেশ ভাল। বাপ নেই, এখন ভায়েদের সংসার। সেখানে সে যায়নিও অনেকদিন। এতদিন পরে কোন্‌মুখে গিয়ে দাঁড়াবে? কী করেই বা বলবে, —'আমার ছেলেটা ডাকাতি করে এসেছে। তার বাপকে ধরে নিয়ে গেছে তাকে না পেয়ে। ছাড়াতে অনেক টাকা লাগবে। তোমরা কিছু দাও।' না, এসব বলা যায় না। বললে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

মাথাটা ভীষণ দপ্‌দপ্‌ করছে। ক'দিনের ধকলে শরীর যেন তার ভার বইতে চাইছে না। তাই অসময়ে বিছানায় শুয়েছিল আঙুরলতা। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল।

এম-এল-এ বাবু আর পঞ্চায়েত প্রধান মশাইকে মিথ্যে বলাটা কি ভাল হল? ওরা কি বুঝতে পেরেছে যে সে সত্যি বলেনি? হয়তো পেরেছে। ওরা লোক চরিয়ে খায়। চোর-ছ্যাঁচোড়, জালিয়াত, গুণ্ডা, বদমাইস—কতরকম লোক নিয়ে ওদের কারবার। অথচ আশ্চর্য যে কিছু মিথ্যে বলতে ওর জিভে আটকায়। ধনার বাপের স্বভারটাও ওই একই রকম। মানুষটা মদ-ভাং খায় বটে, তাবে কখনও কারুর ক্ষতি করে না। পারলে ভালই করে। প্রতিবেশীর দায়ে-আপদে বুক দিয়ে পড়ে। সেই মানুষটাও পুলিশ আসার রাতে বেমালুম মিথ্যে বলল। বলল যে ছেলে শহরে রয়েছে। অথচ ছেলে তখন বাজিতপুরেই ছিল। আর সে নিজে তো গুচ্ছের মিথ্যে বলে চলেছে সেদিন থেকে। কেন বলছে? না, বাঁচাতে হবে দস্যি ডাকাত খুনি ছেলেটাকে। বাঁচাতে হবে—কেন না ধনা ওর একমাত্র ছেলে।

তাই কি শুধু ছেলেকে বাঁচাতে? না। বাঁচাতে হবে ছেলের বাপকেও। মানুষটার কোন দোষ নেই। রত্নাকর দস্যুর পাপের ভাগ তাঁর স্ত্রী-পুত্তুর বাপ-মা কেউ নিতে চায়নি, নিতে হয়নি তাদের। কিন্তু সে হল শাস্তরের কথা। সত্যিকার দুনিয়ায় সন্তানের পাপের বোঝা বাপ-মাকেও নিতে হয়। ধনার বাপ সেই বোঝাটাই বইছে। ভীষণ ভারী এক বোঝা। ধনা কাঁচা বয়সের ছেলে, দেহভরা স্বাস্থ্য, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। ছেলেবেলা থেকেই ও একটু বেয়াড়া ধরণের। আঙুরলতার কড়াপড়া হাতের বেমক্কা পিটুনিও কোনও দিন ওকে কাঁদাতে পারেনি। পুলিশদের তো দয়ামায়া নেই, বেধড়ক ঠেঙায়। সে মার হজম করার ক্ষমতা ধনার আছে। তাই বলে ওর পঁয়ষট্টি বছরের বাপটার সাধ্যি কি সে মার হজম করে? সবাই তো বলছে পুলিশ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। ছেলেকে না পেলে বাপই সই।

আঙুরলতার মনে পড়ে যায় ইদানীং ধনার বাপ খেতে-টেতে পারছিল না ভাল করে। বদহজম। আ-ঝালা সেদ্ধ তরকারি আর গলা ভাত ছাড়া পেটে কিছুই থাকত না। মাছের ঝাল খেতে খুব ভালবাসে লোকটা। খেলেই বমি করে ফেলত। অথচ কথা শুনতেই চাইত না। বুড়ো বয়সে মানুষ অবুঝ শিশু হয়ে যায়। আঙুরলতা অথর্ব

সোয়ামিকে তোলা কাপড়ের মতো তুলে রেখেছিল। পুলিশ কি ওকে এত তরিবতের মধ্যে রাখবে?

ধনার বাপের ডান হাতের আঙুলগুলো প্রায় অবশ। ভাল করে নাড়াচাড়া করতে পারে না। একবার নেশা করে বার-উঠোনে সারা রাত হিমের মধ্যে পড়েছিল। গোটা রাত শিশিরে ভিজে সকালবেলায় শরীরটা যেন শক্ত কাঠ। অনেক কষ্টে দিশে ফেরে। মেচেদা নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল। মরণের মুখ থেকে লোকটা ফিরে এল বটে, শরীরটা আর সারল না। হায় হায়, সেই মানুষ বিদেশ-বিভুঁইয়েই হয়তো দেহ রাখবে! ছ'হাজার টাকার গন্ধমাদন বয়ে আনার লোক কোথায় তার?

সন্ধের অন্ধকারে খিড়কির পুকুরঘাট থেকে এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে আনার পর মালতী মাকে বলল, 'দাদার কী হয়েছে বলো তো মা?'

'গিয়েছিলি তুই?' বিছানায় উঠে বসে রাঙা চোখ মেলে আঙুরলতা মেয়ের দিকে তাকাল, 'কী হয়েছে?'

'একদম চুপচাপ। গম্ভীর। গম্ভীর। ভাল করে কথাই বলল না। একটা কথাই বারবার শুধু বলল, —আমার ভাল লাগাছে না, একদম ভাল লাগছে না। দাদা কেন ওকথা বলল মা?'

'কী জানি! টাকার কথা কী বলল?'

'মাত্তর তিন-চারশ টাকা আছে। ওতে কি কাজ হবে? আমি নিতে চাইনি।'

'অত টাকা তাহলে কী করল? অনেক টাকা তো পেয়েছিল।'

'পায়নি। ওকে বোধহয় ঠকিয়েছে। হাঁদারাম তো। মোটা মাথা বলে আগ বাড়িয়ে গুলি চালাতে গেছে। বুদ্ধিমানেরা এদেরই কাজে লাগায়। তা সে যাক্‌গে। বাবার কী হবে? টাকার যোগাড় তো হল না। টাকা না হলে বাবা জামিনও পাবে না।'

'হুঁ।' বলে চুপ করে থাকে আঙুরলতা।

'হুঁ কিগো? বাবা এইভাবে হাজতে পচে মরবে? নির্দোষ লোককে তিন দিনের বেশি হাজতে রাখার নিয়ম নেই। তা সে কথা শুনছে কে?'

'তোর বাবা হাজতে পচবে না। জামিনের ব্যবস্থা হবে।' দৃঢ় গলায় আঙুরলতা বলে।

'কী রকম? আমার তো কিছু মাথায় আসছে না।'

'তোর দাদাকেই আমি জামিন রখব।'

'তার মানে? মানে?' মালতীর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, 'দাদাকে তুমি ধরিয়ে দেবে?'

'দরকার হলে তাই দেব।' খুব মৃদু উচ্চারণে কথাগুলো বলে আঙুরলতা।

সাপ্তাহিক বর্তমান

# বিস্ফোরণ

তাসের আড্ডা থেকে থেকে বেরোতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল অঘোরনাথের।

মধ্যিপাড়ার কালীতলা থেকে তার বাড়ি মিনিট ছয়-সাতের রাস্তা। দু'-বিড়ির দূরত্ব। মানে পর পর দুটো বিড়ি শেষ করলেই রাস্তা ফুরিয়ে যায়। মনটা আজ তার বেশ খুশি-খুশি। অনেক দিন পর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দিয়ে তাসে জিতেছে। তাছাড়া বহুদিন পরে এবার পুজোর সময় যাত্রা হবে কথা হয়েছে। আর যাত্রা হওয়া মানেই তার রাজা বা মন্ত্রীর পার্ট বাঁধা। সুতরাং খুশি হবার কথাই। এতটা রাতে গ্রামের নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে এমনিতেও বেশ ভাল লাগছিল তার। ফিকে জ্যোৎস্না উঠেছে। নক্ষত্রচোঁয়ানো আলো আর জ্যোৎস্না মিশে চারপাশ ভারি মায়াময় দেখাচ্ছে। গাছগাছালির নিচে আলোছায়ার জাফরি। একটা রাত-পাখি ডাকছিল কোথাও। সব রাতে মনে হয় পৃথিবীতে কোন পাপ নেই। মানুষের মনে কোন নোংরামি নেই। সবকিছুই বড়ো পবিত্র। অঘোরনাথ এই অনুভবে ভারি তৃপ্তি পেল।

জেলা বোর্ডের চওড়া রাস্তাটা ছেড়ে অঘোরনাথ পুকুরপাড়ের রাস্তা ধরল। এ রাস্তাটা সরু। একধারে পুকুর, অন্যধারে সব গেরস্থবাড়ি। রোজ সে ঘাটলায় নেমে হাত-পা ধোয়, তারপর বাড়ি ঢোকে। কিন্তু ঘাটলায় নামার আগেই দৃশ্যটা চোখে পড়ে গেল।

সানের ঘাটের ওপরেই আকাশ আড়াল করে প্রকান্ড একটা তেঁতুলগাছ। ফলে নিচে ছায়া কিছুটা ঘন। তবে আজ রাত্রিটা যেহেতু চাঁদের দখলে সেহেতু সবকিছুই চোখে সয়ে আসে। অঘোরনাথের বয়স একষট্টি, চোখের জোর কমেছে, তবু সে পরিষ্কার দেখতে পেল মুখোমুখি দুটো মূর্তি ঘন-সন্নিবিষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। আবছা গলায় ওরা কথা বলছে। একজনের মাথা অন্যকে ছাড়িয়ে। তার বাহু দুটো অপরের কাঁধে সটান ছড়ানো। উদোম চাঁদের লাবণিতে মাখামাখি নয় ওদের শরীর, গাছগাছালির ছায়াচ্ছন্নতাও কিছুটা বাধা। তবু এরকম একটা দৃশ্যের তাৎপর্য কোন পুরুষের কাছেই অস্পষ্ট থাকে না। ওই যুগলমূর্তি যে দুই সখীর নয়, সখা-সখীর—বুঝতে পারল

অঘোরনাথ। তাছাড়া শাড়িতে জড়ানো অবয়ব আর প্যান্ট-শার্টে ঢাকা শরীরের সিল্যুয়েটও দৃশ্যের গূঢ়ার্থকে স্পষ্ট করে দিচ্ছিল।

ধুলোর গদিমোড়া রাস্তা। মন্থর আয়েসি ভঙ্গিতে হেঁটে আসছিল অঘোরনাথ। ঘাটলার আত্মমগ্ন মানব-মানবী বোধহয় খেয়ালই করেনি যে তাদের প্রেমের বৃন্দাবনে এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সঙিন অবস্থা হল অঘোরনাথেরই। সে না পারে এগোতে, না পেছোতে। রাস্তার সঙ্গে সেঁটে গেল সে। আর তারপরই বুকের মধ্যে মেঘের বাদ্যি শুনতে পেল। অঘোরনাথ ঠিকই বুঝতে পেরেছে জোড়া-মূর্তির একজন তার ছোটমেয়ে সন্ধ্যামণি।

এরকম একটা দৃশ্যের জন্যে কোন বাপই তৈরি থাকে না। অঘোরনাথও ছিল না। এখন কি করা! ওদের প্রণয়-কূজন কতক্ষণে শেষ হবে কে জানে! এসব ক্ষেত্রে রাত ফুরোলেও নাকি কথা ফুরোয় না। কিন্তু কানু নাকি রাইকিশোরী কার প্রথম নজর পড়ল তৃতীয় ব্যক্তির ওপর কে জানে—হঠাৎ ঘুঘুপাখির উড়াল দেওয়ার মতো একটা দুড়দাড় শব্দ হল। তারপরই অঘোরনাথ দেখল ঘাটলার ওপর নৈঃশব্দ্য ছাড়া কিছু নেই, দুই মূর্তির সিল্যুয়েটও নেই। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যেন ছায়াবাজি।

চিড়িয়া ভেগে যাবার পর হতাশ নিষাদ যেমন দাঁড়িয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে, সেইরকম অবস্থা হল অঘোরনাথের। তারপর প্রচন্ড রাগে ওর শরীরটা কি রকম আউরে উঠল। পৃথিবীতে রাশি রাশি ছেলেমেয়ে ভাব-ভালবাসার খেলা খেলছে—তা খেলুক, তা বলে তার মেয়ে এসবে নিজেকে জড়াবে কেন? মেয়ের বয়স হয়েছে—তা সব মেয়েরই হয়। বিয়ের চেষ্টাও তো চলছে। এর পরেও একটা ছেলে তার কাঁধ জড়িয়ে প্রায় রাত-নিশুতিতে ভালবাসার বুলি কপচাবে, এটাই বা কি রকম কথা? এসব বড্ডো বে-আক্কেলে কান্ড নয় কি? রাগ এবং অভিমানে বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠতে থাকল অঘোরনাথের।

সুবচনী রাতের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল। বাড়ি ফিরেই অঘোরনাথ হিস্‌হিস্‌ করে উঠল, 'কাজ তো দিন-রাতই করছ। ছেলেমেয়ের খবর রাখো কি? তোমার ছোটমেয়ে কোথায়?'

'সন্ধ্যা! সন্ধ্যা তো ঘরে ঘুমোচ্ছে।' সুবচনী অবাক হয়ে বলল।

'না, ঘুমোচ্ছে না। ঘুমোবার ভান করেছে। তারপর ফাঁক পেয়ে উঠে পড়ে যমুনায় গেছে।'

'যমুনা-টমুনা কি সব বলছ? সেটা আবার কি?'

'প্রেমের যমুনা। রাধা-কৃষ্ণকে যে প্রেম-যমুনার তীরে দেখে এলাম।'

'ওসব যাত্রা-যাত্রা কথাবার্তা ছাড়ো তো। কি হয়েছে?'

অঘোরনাথ ঘটনাটা খুলে বলল। তারপর বলল, 'ছোকরাটি কে? মেয়েদের ব্যাপার

মায়েরা সব জানে। মিথ্যে বোলো না।'

'পশ্চিমপাড়ার রায়েদের ছেলে। নাম টোটা।' সুবচনী হঠাৎ ভেঙে পড়ল, 'বড়ো মেয়েটা ওইরকম করল। ছোট মেয়েটাও অধঃপাতে গেছে। চোখে চোখে কতো রাখব বলো? তিন বছরে দু'দুটো ছেলের সঙ্গে গলায় গলায় হল, আবার কাটাছেঁড়াও হয়ে গেল। এটা নতুন।'

অঘোরনাথ বিতৃষ্ণার সঙ্গে নাক কোঁচকাল, 'টোটা! বুলেট! কি নামের ছিরি! আবে, ছেলেটাকে চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!'

'চিনবে না কেন! খুব সাংঘাতিক ছেলে। তোমার মনে নেই বছরখানেক আগে গ্রাম-ষোল-আনার বিচার হয়েছিল ওকে নিয়ে! সালিশীর সময় তুমিও তো ছিলে!'

'মনে নেই আবার! বোমা লেগে আর একটু হলেই তো লাশ হয়ে যাচ্ছিলাম।' অঘোরনাথ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'তা সেই শ্রীমান তোমার মেয়ের সঙ্গে জুটল কি করে।'

সুবচনী ফুঁসিয়ে উঠল, 'তোমার মেয়ের যদি রুচি না থাকে আমি কি করব! ওসব মেয়েকে আগলাতে চারটে চোখ দরকার। বুঝলে? মেয়েকে সামলাতে পারো না, বাপ হয়েছ কি করতে? শুধু নাটুকে কথার জাহাজ—হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। মুরোদ কিছু নেই।'

অঘোরনাথ অভিমানের গলায় বলল, 'রাগের মুখে যা-তা বলছ বউ। আমাকে সবাই ভাল লোক বলে তা জানো?'

'সেটাই তোমার কাল হয়েছে। কেউ মানে না। তোমাদের বংশ বদরক্তের বংশ। না হলে বড়ো মেয়েকে নিয়ে অমন বিচ্ছিরি কান্ড হল, ছোটমেয়েও সেই একই রাস্তাতে গেল!'

অঘোরনাথ আর কিছু বলল না। সুবচনী তার মুরোদ নিয়ে খোঁটা দিয়েছে। বংশ তুলেও কথা শুনিয়েছে। এরপরেও তার মতো নিরীহ মানুষের দুঃখে-অভিমানে যদি গলা বুজে না আসে সেটাই আশ্চর্যের।

অঘোরনাথ ছা-পোষা গেরস্থ। নিপাট ভালমানুষ। জীবনে কখনও কাউকে গলা উঁচু করে কথা বলেনি। অবশ্য সুবচনীর ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার। অঘোরনাথের যত বীরত্ব বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই। ঘরকুনো মানুষ। চাকরি-বাকরি করেনি কখনও। ভদ্রাসন বলতে চার কুঠুরির একটা সাবেক কালের বাড়ি। আর সম্পত্তি বলতে বিঘে কুড়ি ধানী জমি এবং কিছু বাগানবেড়। এগুলো নেড়েচেড়ে সচ্ছলে দিন চলে যায়। দু'মেয়ে, এক ছেলে। ছেলেটা স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ে। অঘোরনাথ মানুষটি একটু প্রাচীনপন্থী। বাবা ছিলেন খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির। সততা, সরলতা ইত্যাদি গুণ অঘোরনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রেই পেয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে সুবচনীর কথাগুলোই ভাবছিল অঘোরনাথ।

ওদের বড়ো মেয়ে বনমালা বিশ্রী একটা কান্ড ঘটিয়েছিল। পাড়ার এক ছোঁড়ার সঙ্গে লটঘট। শেষপর্যন্ত বিয়ে দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। বিয়ের পাঁচ মাস পরে অঘোরনাথ যখন দাদু হল তখন লোকের কিছু বুঝতে বাকি থাকেনি। বছরখানেক তো মাথা উঁচু করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারেনি। তাসের পার্টনার করালী সামন্ত বলেছিল, 'আজকাল তাহলে পাঁচ-ছ'মাসেই ছেলেপুলে হয়ে যাচ্ছে, কি হে অঘোর? আমরা কিন্তু দশ মাসেই জন্মেছিলুম।' একথা বলার চেয়ে করালী যদি সপাটে জুতো মারত বেশি ভাল লাগত অঘোরনাথের।

সন্ধ্যামণির ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্তই ছিল সে। মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ। মাজা-মাজা গায়ের রঙ। চোখা নাক-মুখ। লম্বাটে ছাঁদের চেহারা। গড়ন-পেটন নজরে পড়বার মতো। স্বভাবও নরম-নম্র। মাথা নিচু করে রাস্তা হাঁটে। ছেলেদের দিকে ভাল করে বুঝি তাকায়ও না। সবাই বলত বাপের মতো স্বভাব পেয়েছে। এমন মেয়েও দিদির রাস্তা ধরল! ভাবা যায় না।

ওর বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি পাকা না হলেও আধপাকা হয়ে আছে। অঘোরনাথের এক বন্ধু কবে যেন ওদের বাড়ি এসে দেখে গেছে সন্ধ্যামণিকে। বন্ধুর বাড়ি পাশের গ্রাম অনন্তচকে। তারপর বলেছে, 'তোমার ছোটমেয়েটি বেশ হে। আমার সুবোধের সঙ্গে বেশ মানাবে। বি-কম পাশ করেছে ছেলেটা। চাকরিতে ঢুকলেই দু'হাত এক করে দোব। অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি এসে গেছে। হাজার দেড়েক দিয়ে শুরু। তুমি আমার বেয়াই হলে আশা করি আপত্তি নেই।' বন্ধু এক কথার মানুষ। মন ভাল। ছেলেটি সুশ্রী-শিক্ষিত। বাড়ির অবস্থা অঘোরনাথের চেয়ে ভাল ছাড়া মন্দ নয়। আজকালকার বাজারে এমন অযাচিত অনুগ্রহ ভাবাই যায় না। বিশেষ করে বড়ো মেয়ের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবার পর। এখন ভাবী বধূমাতার কান্ড যদি ভাবী শ্বশুরের কানে যায় তাহলে স্বয়ং বিধাতাপুরুষও এ-বিয়ে ঘটাতে পারবে না। পাশের গাঁয়ে খবর যেতে কতটুকুই বা সময় নেবে—বিশেষ করে মন্দ খবর? হ্যাঁ, ভুল মানুষ করে। সন্ধ্যামণি একটা সতেরো-আঠারোর কিশোরী ছাড়া তো কিছু নয়। তা বলে ওই টোটা!

এই তো সেদিনের কথা। গ্রামে ছিঃ ছিক্কার পড়ে গেল। ব্যাপার কি না—মাঝরাত্তিরে রায়বাড়ির টোটা কমলা-বউয়ের ঘরে কড়া নেড়েছে। কমলাবউ বিধবা। বয়স তিরিশ পেরোলেও আঁটোসাঁটো গতর আর পোষাকের বাহারের জন্যে কমই দেখায়। রাতবিরেতে একটেরে বাড়িটার আনাচ-কানাচে অনেক শেয়ালই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। প্রসাদও পায় অনেকে মন্দজনে বলে। তাই বলে হাঁটুর বয়েসী টোটা

যে হানা দেবে এটা বোধহয় ভাবতে পারেনি কমলাবউ। সকালে ঘুম থেকে উঠে পাড়ার কর্তাদের কাছে টোটার অপকীর্তির কথা জানিয়ে দিল। গ্রাম ষোল আনার বিচার বসল সন্ধ্যেবেলায়। চাপের মুখে টোটা স্বীকার করল কড়া সে নেড়েছিল ঠিকই, তবে দরজা খোলা পায়নি। তা না পাক, তার অপরাধ তাতে কমে না। দু'শো টাকা জরিমানা আর দশ হাত নাকে খৎ। কিন্তু জরিমানার টাকা দিয়ে নাকে খৎ দেবার আগেই কোত্থেকে টোটার দলের ছেলেরা এসে বোমা ফাটিয়ে, সভা লন্ডভন্ড করে, ওকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসে। টোটা একটু আধটু রাজনীতি করে, পাড়াতুতো লিডারদের স্নেহপুষ্ট। আর কে না জানে—রাজনীতিই একালে শক্তির উৎস!

ছোকরাকে রাস্তাতে দেখেওছে অঘোরনাথ। পেটাই করা চেহারা। রঙটা ফর্সার দিকেই। সিনেমার হিরোদের মতো কায়দাদুরস্ত চুল। বুকের কাছে জামাটা হাট করে খোলা, সেই ফাঁকে উঁকি মারছে রুপোর চেন। চোখে শখের চশমা। একটা ফটফটিয়া চেপে ডোন্টকেয়ার ভঙ্গিতে যাওয়া-আসা করে মাঝে মাঝে। বাপের পয়সাকড়ি আছে। চালেচলনে বেপরোয়া এই ধরনের ছেলেরা নাকি ইদানীং মেয়েদের চোখের মণি। অঘোরনাথ ভেবে পায় না এরকম লোচ্চা-লক্কড় ছেলেরা কি করে প্রশ্রয় পায় মেয়েদের কাছে? তা যে যা করে করুক, তার ছোটমেয়ে ওই বজ্জাত ছেলেটার সঙ্গে ভিড়ল কি করে?

প্রশ্ন শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল সুবচনী, 'তুমি যেন কিরকম! সিনেমায় যেসব কান্ড-কারখানা দেখাচ্ছে তাতে খোকা-খুকিদের মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছ না! এ-পাড়ার মেয়ে ও-পাড়ার টি ভি দেখতে ছুটছে। বছরে দশবার ভিডিও হচ্ছে। আর এই করে এর সঙ্গে ওর জোড় বেঁধে যাচ্ছে।'

'তোমার মেয়েরাও তাই হয়েছে?'

'তাছাড়া আর কি! টোটার খুড়তুতো বোন যে আমাদের সন্ধ্যার বন্ধু। ওদের পাড়ায় যেত যে মাঝে-মধ্যে।'

তা সে যেখানে যা খুশি হোক তাতে অঘোরনাথের কিছু যায় আসে না। কিন্তু ঘটনা যদি নিজের সংসারে ঢোকে তখন কি আর নিরাসক্ত যোগী থাকা যায়? অঘোরনাথ ঠিক করল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মেয়েকে আচ্ছা করে বকে দেবে। বলে দেবে টোটার সঙ্গে যেন মেলামেশা না করে।

কিন্তু সাতসকালে সন্ধ্যামণি যখন নিদ্রাস্নিগ্ধ টসটসে চেহারাটি নিয়ে চায়ের কাপ হাতে এসে দাঁড়াল অঘোরনাথ রূঢ় কিছু বলার ভাষাই খুঁজে পেল না। মেয়েও মুখখানাকে এমন পবিত্র-পবিত্র করে দাঁড়িয়ে রইল যে মনে হল এ ফুলে কীট বাসা বাঁধেনি। এবং অঘোরনাথ রাত্রে ঘাটলার কাছে যা দেখেছে সব তার চোখের ভুল। নিজেকে ভারি দুর্বল মনে হতে লাগল অঘোরনাথের। ক্ষীণ গলায় বলল, 'তোর

মাকে একবারটি ডেকে দে তো মণি।'

সুবচনী এলে বলল, 'তোমার মেয়েটাকে বেশ করে ধমকে দিও তো। বলে দিও টোটা ছোঁড়াটার সঙ্গে যেন একদম না মেশে।'

সুবচনী কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল সোয়ামীর দিকে, তারপর গালে হাত দিয়ে অবাক হবার ব্যঞ্জনা আনল। বলল, 'এমন কথা জন্মেও শুনিনি বাপ মেয়েকে কড়া কথা বলতে ভয় পায়। ভরা বয়সের মেয়ে, কৈলে বাছুরের মতো ছটপটিয়ে বেড়াচ্ছে—বাপ হয়ে একটু সমঝে দিতে পার না? আমি কি বলব? মায়ের কথা একালের মেয়েরা কানে তোলে?'

অঘোরনাথ রাগ করে বলল, 'মেয়েকে ওসব কথা বলা যায়? আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? সন্টু তো বড়োসড়ো হয়েছে। ব্যায়াম-ট্যায়াম করে, গায়ে জোর আছে। সন্টু বরং একদিন টোটাকে বেশ করে সমঝে দিক না।'

'তোমার মাথার ঠিক নেই। সন্টু স্কুলের ছেলে—তাকে এসবের মধ্যে টেনে আনা কেন? দিদির ব্যাপারে ছোট ভাই মাথা গলাবে?'

'তাহলে!' অঘোরনাথকে ভারি অসহায় দেখাল। একটু ভেবে বলল, 'তাহলে বরং পাড়ার লোকদের জানাই।'

'তাহলে তো একদিনেই দেশশুদ্ধ চাউর হয়ে যাবে। টোটা কেমন ছেলে জানো তো! গায়ে ডাকাতের জোর, সঙ্গে ছোরাছুরি রাখে শুনি, ওর একটা বাজে ছোঁড়ার দল আছে। তারা পারে না হেন কাজ নেই।'

'ধ্যুস, আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। গলায় দড়ি দোব বলতে চাও?'

'তুমি একটা পুরুষ মানুষই না। অমন দশাসই শরীর। এককালে নাকি মাটি লড়তে। একটা হাঁকার দিলে পাড়া কেঁপে উঠবে—তা নয়। এমন মিন্‌মিনে গোবেচারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখলাম না। একটু রাগ-তাপও নেই তোমার শরীরে। মেয়েমানুষের অধম।'

একরাশ বিষ উগরে দিয়ে, সকালের চা-টাকে বিস্বাদ করে সুবচনী চলে গেল। সুমিষ্ট বচন কোনদিনই বলে না সুবচনী। তা বলে এত তেতো কথাও শোনায় না। অঘোরনাথের ইচ্ছে করতে লাগল অন্তত চায়ের কাপটা উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে স্ত্রীকে জানিয়ে দেয় যে রাগ জিনিসটা তার শরীরেও আছে। পরক্ষণেই মনে হল এটা ঠিক পুরুষালি ব্যাপার নয়। আর রাগে ফেটে পড়ার স্টেজে না এলে কাপ-টাপ ছুঁড়ে ফেলা যায় না। অঘোরনাথ রেগে ওঠার জন্যে হন্যে হয়ে উঠল, উত্তেজিত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথাই। রাগ লুকোচুরি খেলে বেড়াল, ধরা দিল না। অঘোরনাথের মনে হতে লাগল ক্রুদ্ধ হবার তালিম নেবার মতো জায়গা থাকলে সে সেখানে অবিলম্বে ভর্তি হয়ে যেত। নিরীহ-নিপাট ভালমানুষ বলে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার

ছিল তার। কখনও তাকে মেজাজ গরম করতে দেখা যায়নি বলে লোকের সাধুবাদও কম পায়নি। কিন্তু এই প্রথম, একষট্টি বছর বয়সে এসে, অঘোরনাথের মনে হল পৃথিবীতে রাগেরও দাম আছে।

দিন দুয়েকের জন্যে অঘোরনাথ বাড়ি ছিল না। শহরে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'এদিকের খবর কি?'

সুবচনী বলল, 'মৃত্যুঞ্জয়বাবু এসেছিলেন।'

'ছেলের সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়ের কথা পাড়ল-টাড়ল?'

'ছেলের চাকরির খবর দিতে এসেছিলেন।'

'বিয়ের কথা তোলেনি?'

'সে ধার দিয়েই গেলেন না। অন্যবার এলে মেয়েকে ডাকিয়ে কথাবার্তা বলেন। এবার সন্ধ্যার নামটাও উচ্চারণ করেননি। শুধু বললেন, মেয়েকে একটু সামলে রাখবেন বৌদি। আপনার মেয়ে কি খুব সিনেমা-টিনেমা যায়? কেন বললেন জানি না। হয়তো কানাঘুষোয় কিছু শুনেছেন।'

'কার সঙ্গে সিনেমা গিয়েছিল?'

'টোটার সঙ্গে।'

'তাহলে তো খেল খতম। মৃত্যুঞ্জয় একে সেকেলে লোক। তার ওপর এইসব ব্যাপার। ও বিয়ে আর হয়েছে!' একটু গলা নামাল অঘোরনাথ, 'আর কি খবর?'

'কাল রাতে টোটা এসেছিল।'

'মেয়েকে আটকাতে পারনি?'

সুবচনী উত্তর দিল না। অঘোরনাথ বিড়বিড় করে বলল, 'বুঝেছি। ভেরি ব্যাড। ভেরি ভেরি ব্যাড।'

সুবচনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ব্যাড বললে কি হবে! এমন বাপের মেয়ে অমনই হয়।'

দিন পাঁচেক পরেকার কথা। কালীতলার তাসের আড্ডা থেকে বেরোবার সময় অঘোরনাথ দেখল ঘড়িতে দশটা পনেরো। জ্যোৎস্নায় ধপ্‌ধপ্ করছে রাস্তা। তবে অঘোরনাথের মনের মধ্যে একটুও জ্যোৎস্না নেই। তাসের সঙ্গীদের কাছে খোলামনে মেয়ে আর টোটার ব্যাপারটা তুলেছিল। তুলেই বুঝেছিল বেকুবের মতো কাজ করেছে। ওরা খুব হাসাহাসি করল। বলল, 'যৌবনবয়সে একটু রসের খেলা সবাই খেলে। বাপ হয়ে তাতে বাদ সাধতে চাও, তুমি কেমন বাপ হে?' অঘোরনাথ আর কিছু বলেনি। তাসেও মন দিতে পারেনি। গো-হারান হেরেছে।

হেরো মন নিয়েই বাড়ি ফিরছিল অঘোরনাথ। আর ভাবছিল জীবনের কোনক্ষেত্রে সে তেমন জিততে পারেনি, কেবলই হেরেছে। বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা

বাজতে লাগল তার।

ঘাড় নিচু করে চলতে চলতে ব্যথার্ত মানুষটা হঠাৎই চোখ তুলল আর তার চোখের ফ্রেমে আটকে গেল ঘাটলার পটভূমিতে যুগলমূর্তির সিল্যুয়েট। প্রেমের বৃন্দাবনে শ্যাম আর শ্রীমতী। আলোছায়ার জাফরির মধ্যে ঘনিষ্ঠ দুই মানব-মানবী।

ছাপোষা মানুষ অঘোরনাথ চিরকালই বিরোধ এড়িয়ে চলতে ভালবাসে। কিন্তু এই মুহূর্তে কি যেন একটা ঘটে গেল বুকের মধ্যে। শরীরের মধ্যে যেন দ্রিমি দ্রিমি বাদ্যি বাজছে। রণবাদ্য। রক্তস্রোত যেন তুফানের নদী। দাবানল, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস একসঙ্গে ঘটে গেল ভেতরে। সটান এগিয়ে এসে টৌটার ঘাড়টা মুচড়ে ধরল বিশাল থাবায়, তারপর হুঙ্কার তুলে বলল, 'এটা কি হচ্ছে হে ছোকরা? কি হচ্ছে—অ্যাঁ!'

অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত ঘটনা। টৌটা সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অঘোরনাথের দিকে, তারপর ককিয়ে উঠে বলল, 'এ কি রকম অসভ্যতা! ভাবী জামাইকে মারছেন! ছাড়ুন বলছি।' এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল টৌটা। আশ্চর্য, পারল না। অঘোরনাথের হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে ঘাড়ে।

'ছাড়ুন বলছি। ছোরা আছে আমার কাছে। খুনোখুনি হয়ে যাবে মাইরি।'

'রাখ তোর ছোরা।' বলল অঘোরনাথ। পরমুহূর্তে টৌটার গালে বোমার মতো আছড়ে পড়ল একটা পরাক্রান্ত চড়। সেইসঙ্গে একটা পালোয়ানি পা কামারের হাতুড়ির মতো ছুটে গেল টৌটার তলপেট লক্ষ্য করে। তরঙ্গে ভেসে যাওয়া কুটো হেন টৌটা ছিটকে পড়ল পাঁচ হাত দূরে।

বাঘের হাঁকার তুলে অঘোরনাথ বলে উঠল, সামান্য একটু শিক্ষা দিলুম। এরপর এ পাড়ায় ছোঁক ছোঁক করতে দেখলে একটা দাঁতও আস্ত থাকবে না।'

মেয়ের দিকে ফিরে ঠান্ডা গলায় বলল, 'ঘন্টাখানেক পড়ে থাকবে। তারপর ও নিজে থেকেই চলে যেতে পারবে। তুই এখন যা মণি।'

ঘাটলায় হাত-পা ধুয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অঘোরনাথের মনে হল দেহটা বেশ ঝরঝরে লাগছে তার। মনটাও খুশি-খুশি। জ্যোৎস্না যে মিঠে তা-ও যেন অনেকদিন পরে আবিষ্কার করল অঘোরনাথ। আর এমন সাংঘাতিক কাজ এত সহজে হয়ে গেল দেখে খানিকটা আশ্চর্যও লাগছিল অঘোরনাথের।

জনমত জনপথ

# আগন্তুক

চিরিয়া পাহাড়টা আকাশের পুর্বদিক আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিজে ভিজে পুবালি বাতাসটুকু ওখান থেকেই বয়ে নিয়ে আসছে বনের গন্ধ। উঁচু টিলার ওপরকার বাংলো বাড়িটার একফালি লনের কিনারা ঘেঁষে একটা চেয়ার পেতে বসে চিরিয়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে প্রায় রোজই বিকেলটা কাটায় রুমা। বনের গন্ধমাখা বাতাসটা সব সময় পায় তা নয়, কিন্তু পেলে ভাল লাগে খুব। হাতে থাকে সাধারণত উপন্যাস। সব সময় যে পড়া হয় তাও নয়। দক্ষিণ বিহারের এই মনোহরপুর জায়গাটায় বাংলা বই যোগাড় করা খুব কঠিন, রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য একটা লাইব্রেরী আছে বটে, তাতে ইংরেজী বই-ই সিংহভাগ, তারপর হিন্দীর স্থান, অবশেষে বাংলা বইয়ের জায়গা। মাতৃভাষায় একখানা পছন্দসই বই জুটলে তারিয়ে তারিয়েই পড়ে রুমা। তবে দূরের ওই আকাশ-আড়াল-করা সিল্যুয়েট ছবিটা কিংবা মাঝের সমভূমির শালের জঙ্গল এবং ইতস্ততঃ টিলাগুলো মাঝেমাঝে এমন সময় কেড়ে নেয় যে হাতের বই হাতেই থাকে, পড়া হয় না। মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে এক ফার্লং দূরের কোয়না নদীটা, মিনিট দশেকের হাঁটাপথের দূরত্বের কোয়েল নদী, দু'বছর আগে দেখে আসা সারাণ্ডার গহীন অরণ্য, থলকোবাদের বনবাংলো অথবা কোয়নার ছোট্ট জলপ্রপাতটা।

এভাবেই মনোহরপুরের বিকেলগুলো কাটে রুমার। বিকেলের দিকে হাতে তার খুব কাজ থাকে না। সারা দিনেই খুব একটা থাকে কি? এক যুগ হল তারা বিহারপ্রবাসী। এখানে যখন এসেছিল তখন সে পনেরো, এখন সাতাশ। পড়াশুনো চুকে গেছে বছর চার হল। গ্র্যাজুয়েট হবার পর চাকরি-বাকরির চেষ্টা তেমন করেনি, বাবাও করতে দেননি। এখানে আসার তিন বছরের মধ্যেই মা চলে গেলেন, মা থাকলে এতদিনে হয়তো তার বিয়ে-থা হয়ে যেত। দেখতে শুনতে সে মোটের ওপর ভালই। কিন্তু তার বাবা সোমনাথ দত্ত আদৌ সংসার সচেতন মানুষ নন। তার পরের বোন ক্ষমাও দেখতে দেখতে তেইশে পা দিল। এসব দিকে সোমনাথবাবুর খুব যে খেয়াল আছে

তা তো মনে হয় না রুমার। রুমা তাঁর কাছে আজো 'বড়ো খুকু' আর ক্ষমা 'ছোট খুকু'। তাদের যে যথেষ্ট বয়স হয়েছে তা যেন খেয়ালই করেন না খেয়ালী প্রকৃতির মানুষটি। রুমা এখন বেশ বোঝে যে সংসারের যথার্থ অভিভাবক আসলে মায়েরাই, বাবারা নয়। এই তো সংসারের হাল।

বাইরের জগৎ বলতেও তাদের কাছে নেই বিশেষ কিছু।

মনোহরপুর নামের এই ছোট্ট টাউনশিপটা এক যুগ আগে যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি। আসলে এটা গৌরবার্থে শহর, আধঘন্টা হাঁটলে গোটা চৌহদ্দি ঘোরা হয়ে যায়। টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের কিছু কর্মচারীর বাংলো আর কোয়াটার্স নিয়েই মনোহরপুরের বাড়বাড়ন্ত। বাঙালীর বাস নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও এখানে মনের মতো সঙ্গী যোগাড় করা খুবই শক্ত। আর রুমা তেমন মিশুকেও নয়। বন্ধুত্ব পাতাবার ক্ষেত্রে বেশ অপটু। আগে কোয়নার ধারে বেড়াতে যেত নিয়মিত—এই তো টিলাটার পা ধুয়ে বয়ে যাচ্ছে কোয়না। এখন ওসব পুরনো হয়ে গেছে, ভাল লাগে না। আজকাল সকালটা কাটে কাজে, দুপুরটা ঘুমিয়ে, বিকেলটা বাংলোর লনে বসে পাহাড়-বন দেখে। একঘেয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে একরকম।

রুমা এই মন্থর দিনগুলোর কথাই হয়তো এতক্ষণে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল, এমন সময় ক্ষমা এল ছুটতে ছুটতে।

'— এই দিদি, কি এনেছি দেখ।' ক্ষমা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর ডান হাতটা পেছন দিকে লুকনো। চোখে মুখে একটা রহস্য-রহস্য ভাব।

রুমা কানে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'তুই বড্ডো চেঁচাস। হয়েছে কি?'

'আমার হাতে কি বলতো?'

'কি করে বলব! আমি যাদুকর না ডাইনি? নে, বাচ্চা মেয়ের মতো অতো রহস্য করতে হবে না।'

'চিঠি রে। চিঠি এসেছে হাওড়া থেকে।'

'চিঠি!' এবার রুমাও খানিকটা অবাক হয়। 'হাওড়া থেকে কে আবার চিঠি লিখতে গেল? আমাদের তো মাসিমা-পিসিমা কেউ নেই। কোনো বন্ধুও থাকে না হাওড়ায়।'

ক্ষমা ছোট্ট খুকুর মতোই বেণী দোলাল, 'হয়তো থাকে। তুই তাকে ভুলে গেছিস।'

রুমা চোখ পাকাল, 'বড্ডো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি তোর দিদি হই, ভুলে যাস না। আসল কথাটা বলে ফেল।'

'ইস্ দিদি! বেশি গার্জেনি করিস না তো। যাক, আর তোকে অন্ধকারে রাখব না। চিঠি লিখেছে তুহীনদা। বাবার নামে চিঠি, কিন্তু আমি পড়ে ফেলেছি।'

রুমা ধমকে উঠলো, 'বাবার চিঠি তুই পড়তে গেলি কেন? ওটা খারাপ অভ্যেস,

বুঝলি ক্ষমা।'

'তুইও পড় না। পড়লেই বুঝতে পারবি ওতে দোষ হয়নি কিচ্ছু।'

রুমা কিছুক্ষণ বোনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল, তারপর আত্মবিস্মৃতের মতো বলল, 'তুহীনদার চিঠি! ওদের পদবীটা কি ছিল বলতো?'

ক্ষমা প্রায় মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'তোর বয়স হয়ে যাচ্ছে দিদি। কিচ্ছু মনে থাকে না। তুহীন ঘোষ। ওদের পদবীটা ঘোষই ছিল। হ্যাঁ, ঠিক। বেশ মিষ্টি মিষ্টি চেহারা ছিল। আমার তখন কতোই বা বয়স, এগার-বারো হবে, অথচ আমার সব মনে আছে। মাঝে মাঝে আমাকে পড়া বলে দিত। তোর পড়াও তো বলে দিত। সত্যিই তুহীনদাকে তোর মনে নেই দিদি?

রুমা আস্তে আস্তে বলল, 'এবার মনে পড়েছে। কি লিখেছে চিঠিতে?'

'বাংলায় লেখা চিঠি তুই নিজেই পড়ে নিতে পারবি নিশ্চয়ই। বাবা বোধহয় ফিরল, আমি যাই। বাবাকে জানিয়ে আসি কথাটা।' চিঠিটা দিদির হাতে ফেলে দিয়ে ক্ষমা যেভাবে ত্বরিত পদক্ষেপে চলে গেল তার সঙ্গে বুঝি চকিত হরিণীর চঞ্চল গমনের তুলনা চলে। কেন যেন উপমাটা মনে এল রুমার।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রুমা। চিঠিরও কি উষ্ণতা আছে যা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যায়? এর ভেতরে কি বার্তা আছে তা এখনও জানে না সে, কিন্তু তুহীন নামটাই তার কৈশোরের কিছু মুহূর্তকে বিস্মরণের ওপার থেকে হঠাৎ একেবারে মনের সিংহদুয়ারে পৌঁছে দিয়ে গেছে। লঙ্-শটের ছবিকে হঠাৎ ক্লোজ-আপে এনে ফেললে যেমন হয় আর কি!

এক সময়, সেই এক যুগ আগে, রুমারা হাওড়ায় থাকত। তুহীনদার বাসাটা ছিল তাদের বাসার একেবারে গায়ে-গায়ে। রুমার বাবা সোমনাথবাবু আর তুহীনদার বাবা বিমানবাবুর কবে কিভাবে চেনা-পরিচয়ের পালা শুরু হয়েছিল কে-ই বা তার খবর রাখে? তবে দুই গৃহকর্তার মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল যথেষ্ট। সকালবেলা বিমানবাবুর ঘরে সোমনাথবাবুর এক পেয়ালা চা না হলে এবং রাত্রিবেলা সোমনাথবাবুর বাসার ছাদে বিমানবাবু গল্পগাছা করার সুযোগ না পেলে দিনটাই ওদের বৃথা যেত, এটা বেশ মনে আছে রুমার। দুই কর্তার মেলামেশার ফাঁকফোকবে কখন যে এ-বাড়ির রুমা ও-বাড়ির তুহীনের কাছে হাজারো কাজ ফেলেও পড়া বুঝে নিতে যাচ্ছে—কেই বা এসব খেয়াল রাখতে যাচ্ছে? পড়া বোঝার কাজটা কবে থেকে কেমন করে শুরু হয়েছিল তা কি আর মনে আছে আজ রুমার? এটুকু অবশ্য খেয়াল করতে পারে যে তুহীনের কোনোদিন কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠত। সেটা তো শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে চুপচাপ বসে কাটাবার বয়স নয়, বার বার ছুটে যেত ও-বাড়িতে আর তুহীনের মাকে শুধোতে, 'মাসিমা, তুহীনদা এখনও ফিরছে না কেন?'

মাসিমা কেমন একরকমভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মুখে একটা

অচেনা হাসি। মৃদু গলায় বলতেন, 'এত খোঁজখবর নিচ্ছিস কেন? কি দরকার?'

পনেরো বছরের কিশোরী মেয়েটা কি ঠিক ঠিক জানত কেন সে বার বার ছুটে আসছে? দরকারটাই বা কি আসলে? অতো তলিয়ে বোঝার বয়স নয় সেটা, বরং আবেগতাড়িত হবার বয়স। অবশ্য উপস্থিতবুদ্ধি ওই বয়সেও কম থাকে না মেয়েদের।

সেই উপস্থিতবুদ্ধির বলেই হয়তো লাজুক মুখ করে বলত, 'বারে, পড়া জেনে নিতে হবে না বুঝি?'

'কেন, ও কি তোর মাস্টার নাকি?'

'মাস্টার মশাই তো আসেন। বড্ডো কড়া, আর কি প্রকাণ্ড গোঁফ। একটুও ভাল লাগে না পড়তে।'

'হুঁ, বুঝেছি।' মাসিমার মুখে একটা সকৌতুক হাসি। তিনি কি বুঝেছেন সেটা খুলে বলতেন না, আর রুমারও জিগ্যেস করার সাহস হত না। কিন্তু একটা অর্থহীন লজ্জার আভা ছড়িয়ে পড়ত ওর উজ্জ্বল শ্যামলা-কিশোরী-মুখে।

পড়া নয়, পড়ার ছলনা। বই সামনে নিয়ে আগডুম বাগডুম সব কথা। সেগুলো পড়ার চেয়ে কম মিষ্টি এমন বলা যায় কি? তুচ্ছ সাধারণ এলোমেলো সব কথা, কিন্তু তাদের মধুরতা বোঝে শুধু চোদ্দ-পনেরোর মেয়েরাই। আর মাঝারি ফর্সা ছিপছিপে, ঝাঁকড়া বিশৃঙ্খল চুলের নিচে তীক্ষ্ণ মুখশ্রীর একটা তরুণ যে কতো বড়ো ঐশ্বর্য— তার ব্যাখ্যাও শুধু কিশোরী কন্যারাই জানে।

তুহীন ঘোষ একেবারে হাল আমলের ছেলেছোকরাদের মতো ছিল না। এক যুগের মধ্যে একটা জেনারেশন গ্যাপ ঘটে গেছে। এখন একটু নিভৃতি, কিছুক্ষণের নির্জনতা মানেই লুব্ধ পুরুষের হাত এগিয়ে আসে নারীশরীরের দিকে। তুহীন ঘোষেরা অন্যরকম ছিল। কোনো সুযোগই নেয়নি তুহীন। কোনদিন সিনেমা যাবার প্রস্তাব দেয়নি। কোনো চিঠি লিখে জানায়নি 'রুমা, তোমাকে না পেলে বাঁচবো না।' এসব কাব্যি তুহীন ঘোষ নামের তরুণটির আসত না। আর তাই কি ওর সান্নিধ্যে এত সরস লাগত রুমার?

কিন্তু ওই খেয়ালী খেলাটা চুকেবুকেও গেল খুব তড়িঘড়ি।

সোমনাথবাবু ভেতরে ভেতরে আর একটু সরেস চাকরির চেষ্টা করেছিলেন। কোয়ালিফায়েড লোক। টিসকো থেকে ডাক এল। পঞ্চাশ-ছোঁয়া বয়সে এরকম একটা চাকরি অপ্রত্যাশিত বৈকি। মোটা মাইনে, বাংলো ফ্রি, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধেও যথেষ্ট। একটু দূর হবে, দক্ষিণ বিহার। কিন্তু ভালো চাকরির জন্যে তো মানুষ মঙ্গল গ্রহে যেতেও প্রস্তুত। বিমানবাবুর বাসার বারো ফুট বাই দশ ফুট ঘরটার ভেতর এক নবীন যুবক ও এক সদ্য-কিশোরীর সান্নিধ্যের রস যে দিনে দিনে নিবিড় হয়ে জমাট বাঁধার দিকে যাচ্ছিল সেটাও খেয়াল করলেন না কোনো অভিভাবক। এমনকি রুমার মা'ও না।

চারশো কিলোমিটার দূরের এক বন-টিলা-পাহাড়ের দেশে হাওড়ার শিকড় ছিঁড়ে উড়ে এল পরিবারটি। তারপর যা হয়—বিমানবাবু আর সোমনাথবাবু দুই কর্তাবাবুতে কয়েকটা চিঠি চালাচালি, কিছু দীর্ঘশ্বাস, কিছু স্মৃতিচারণ। তারপর সবকিছুর ইতি। রুমার আর তুহীনের মধ্যে এসবও ঘটেনি। তুহীন ঘোষের দিক থেকে লক্ষ্য করা যায়নি কোনো তৎপরতা, যদিও এসব ক্ষেত্রে ছেলেরাই সাধারণত এগিয়ে আসে। তুহীনের নীরবতা গভীর দুঃখ দিয়েছিল রুমাকে। রুমা প্রথমদিকে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষর আর অগোছালো ভাষার সঙ্গে কৈশোরক আবেগ ঢেলে দিয়ে দু'একখানা চিঠি লেখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেগুলো ডাকে দেওয়ার মতো চপলতা বা সাহস তার চরিত্রে ছিল না। নদীর বিচ্ছিন্ন দুটি পারের মতো তারা দু'দিকে সরে রইল। মাঝখান দিয়ে নিঃসাড়ে বয়ে যেতে লাগল সময়ের জলস্রোত। আর রুমার ভীরু চিঠিগুলো কখন যে হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির দলে যোগ দিয়েছে সে নিজেও জানে না। সব কুঁড়ি কি আর ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পায়?

না ফুটুক্। তবে ধুলো-জমা তানপুরাতে নতুন করে ঝঙ্কার তো উঠতে পারে।

ঝঙ্কার উঠল। রুমা তার এই সাতাশ বছর বয়সেও পনেরো বছরের রহস্যমেদুর দিনগুলোকে নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল। তারপর নিজেকে শাসন করল এই বলে যে যা চুকেবুকে গেছে বহুদিন আগে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে লাভ কি? তুহীন ঘোষ তার চেয়ে বছর ছয় বড়ো। তার মানে এখন তেত্রিশ। এতদিনেও কি সংসারী হতে ওর বাকী আছে? তা হলে?

শান্ত মনে, ধীরে সুস্থে রুমা খুলল চিঠিটা।

পরম পূজনীয় মেসোমশাই,

বাবার চিঠি থেকে আপনার নতুন ঠিকানার অনেক গপ্পো পেলাম। পাহাড় বনজঙ্গল নদী আর জীবজন্তুর গল্প। ওই গল্পের দেশে আমার যাওয়ার ইচ্ছে অনেকদিনের। সময় করে উঠতে পারিনি। হঠাৎ ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল, যাব স্থির করলাম। ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে পৌঁছচ্ছি। আমরা ভাল আছি। আশাকরি আপনাদের সকলের কুশল। ইতি।

—তুহীন ঘোষ

নিতান্তই সাদামাঠা চিঠি। কাটা-কাটা কথা। কে কে সঙ্গে আসছে বা ক'দিন থাকবে কোন উল্লেখ নেই। তুহীনদারা তিন ভাইবোন। মা বেঁচে, মেসোমশাই চলে গেছেন। তাহলে কি সঙ্গে মাসিমা আসছেন, নাকি ভাইবোনদের কেউ?

আচ্ছা, তুহীনদা এখনও ছবি আঁকে কি? গান-টান গায় এখনও? তখন গাইত। গলাটাও মিষ্টি ছিল। এসব ভাবনা একবার শুরু হলে থামতে চায় না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রুমা। সন্ধ্যার আবছায়াতে চিরিয়া পাহাড়টা প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে।

সোমনাথ দত্ত চায়ের পেয়ালার চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুহীন আসবে লিখেছে—খুব ভাল কথা। আগে তো কতবার আসতে লিখেছি, বিমানভায়া আসবে আসবে করেও এল না। শেষপর্যন্ত লোকটাই তো চলে গেল। ছেলেটা আসছে, তাই বা মন্দ কি! খুব ভাল করে আদর যত্ন করিস। দশ বছর আগে হলে জায়গাটার মধ্যে অনেক চার্ম পেত। তখন তো আমাদের টিলাটার নিচে পর্যন্ত বর্ষায় ময়ূর আসত আর চৈৎ ফাল্গুনে মউল ফুল খেতে আসত ভালুক। এখন কাছেপিঠে জঙ্গলই নেই, সব সাফ করে ফেলেছে। তবে কোয়েল আর কোয়না নদ। আছে, চিরিয়া মাইনস্ রয়েছে, টিম্বার মার্চেন্ট দেওকি প্রসাদের জিপটায় চড়ে একদিন সারাণ্ডা ফরেস্টটাও ঘুরিয়ে আনা যাবে। বেশ হৈ-হৈ করে ক'দিন কাটবে, কি বল বড়ো খুকী!'

বড়ো খুকী অর্থাৎ রুমা হেসে ফেলল, 'মানুষ বইল হাওড়ায় আর তুমি এখানে বসে সব প্ল্যান ছকে ফেললে! শেষ পর্যন্ত হয়তো এলোই না কেউ।'

দত্তসাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, চিঠি লিখে জানিয়েছে, আসবে বৈকি। ঘরদুয়োরগুলো একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কবতে হবে। ওদের বাড়িতে পরিচ্ছন্নতার একটা বাতিক আছে। বুঝলি ছোটখুকী, তোর তখন বয়স কতোই বা, এই এগার-বারো, তুহীনের মায়ের হাতের একপেয়ালা চা না খেলে আমাদের আড্ডা একেবারে মাটি হয়ে যেত। আহা, বড়ো ভাল চা বানায় ওব মা। তা হ্যাঁরে, ভাল চা আছে তো বাড়িতে? না থাকলে কিছু কিনে নিয়ে আসিস বাজার থেকে!'

ক্ষমা বলল, 'এসব তোমাকে ভাবতে হবে না, বাবা। লিপটনের একটা স্পেশাল ব্র্যাণ্ড এসেছে মনোহরপুর মার্কেটে, দারুণ ফ্লেভার—ওটাই আনব। আচ্ছা দিদি, ফুল না হলে বসার ঘবটা কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগবে, না রে? ফুলদানিগুলো ঠিক আছে তো?'

রুমা বলল, 'আছে। তবে বড্ডো সেকেলে।'

'তাহলে তো নতুন এক জোড়া কিনতেই হয়। কিন্তু ফুলের কি হবে? এখানকার বাজারে টাটকা ফুল তেমন পাওয়া যায় না।' ক্ষমাকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

সোমনাথবাবু বলে উঠলেন, 'সে তোদের ভাবতে হবে না। আমাদের বোসসাহেবের লনে রজনীগন্ধার অরণ্য বলতে গেলে। ওদের মালিকে বললে রোজ একগোছা দিয়ে যাবে। হুঁ, ফুলের আবার ভাবনা!'

'তাহলে তো হয়েই গেল।' ক্ষমা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সোমনাথবাবু শুধোলেন, 'কবে তুহীনরা আসছে বললি?'

রুমা বলল, 'সাত তারিখে। বহুবচনে বলছো কেন বাবা? তুহীনদা ছাড়া আর কেউ আসছে সেরকম তো লেখেনি চিঠিতে।'

'হয়তো মাকে নিয়ে আসছে। ভাইবোনেদের নিয়েও আসতে পারে।' সোমনাথবাবুর

কপালে চিন্তার ভাঁজ।

রুমা আস্তে আস্তে বলল, 'কতোদিন হয়ে গেল। বোন বলতে দু'জন। হয়তো এতদিনে পরের ঘরে চলে গেছে। তুহীনদার কোনো ভাই নেই। এমন তো হতে পাবে তুহীনদা বৌদিকে নিয়ে আসছে।'

সোমনাথ দত্ত স্পষ্টতই চমকে উঠলেন, 'বৌদিকে নিয়ে! তুহীনের এর মধ্যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলছিস?'

রুমা হেসে ফেলল, 'এর মধ্যে কি বলছো বাবা! আমাদের হাওড়া থেকে আসার পর এক যুগ কেটে গেছে। আমারই তো এখন সাতাশ। তুহীনদা আমার চেয়ে বছর ছয়েকেব বড়ো। তাহলে কতো হল? তুহীনদার এখন তেত্রিশ চলছে।'

সোমনাথবাবুকে বেশ চিন্তান্বিত দেখল, 'তাহলে বড় খুকি তো আমাদের পাল্টি ঘর, আব ছেলেটাও বেশ, তাই না?'

ক্ষমার মুখে-চোখে দুষ্টিমির চাপা হাসি, 'হ্যাঁ, ওরা কায়স্থ। অমরাও তাই। তাতে কি, বাবা?'

সোমনাথবাবু ভাবতে ভাবতে বলে উঠলেন, 'রুমাকে ওর হাতে তুলে দিলে কেমন হয়?

রুমা একটু গম্ভীর স্বভাবের হলেও বাবার কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'একি ছেলের হাতের মোয়া নাকি যে তুলে দিলেই নিয়ে নেবে? তাচাড়া তোমার ছোট মেয়ে তো আমার চেয়ে সেরা মেয়ে। আমার চেয়ে দেখতে ভাল, স্বাস্থ্যও সুন্দর। সেটা ভুলে যেয়ো না।'

ক্ষমা বলল, 'মেলামেশা কিন্তু তোর সঙ্গেই ছিল। আমাকে কাছ ঘেঁষতে দিতিস নাকি তোরা?'

রুমা মৃদু হাসল, 'বারো বছরে তুই অনেক বদলে গেছিস ক্ষমা। তখনকার তুই আর এখনকার তুই অনেক তফাৎ।'

দুই বোনর খুনসুটিতে বেশ মজা পাচ্ছিলেন সোমনাথ দত্ত। মেয়েদের যতো প্রাণের কথা মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ওদের সব কথা বাবার সঙ্গে, সেখানে কোন আড়াল নেই। তাছাড়া বাংলার বাইরের এই জীবন ওদের অনেকখানি বদলে দিয়েছে। পরিবেশে গুণে শিথিল হয়ে গিয়েছে সামাজিক সংস্কার। বাবার সঙ্গে এমন অনেক কথাই হয় ওদের যা বাঙালীসমাজে অচল।

ক্ষমা বলল, 'তুহীনদার সঙ্গে লেজুড় না থাকলেই ভাল হয়। দেখিস, একলাই আসবে। সংসারে ঢুকে পড়লে হঠাৎ এরকম আসতে চাইত না।'

'তোর কথাই হয় তো ঠিক।' রুমা বলল।

'তোরা দু'বোনে ঝগড়া কর। আমি বরং ততক্ষণে দেওকিপ্রসাদের কাছ খেতে

ঘুরে আসি। জিপের ব্যবস্থাটা করা দরকার।' এই বলে সোমনাথ দত্ত উঠে পড়লেন।

বাবা চলে গেল ক্ষমা বলল, 'তুই যেন কি দিদি৷ বাবার সামনেই আমার চেহারা টেহারা নিয়ে যা সব বললি!'

বোনের লজ্জারুণ মুখের দিকে চেয়ে রুমা বলল, 'মিথ্যে কিছু বলিনি। তোর চেহারা সত্যিই ভাল হয়ে উঠেছে। আর বয়সকালে মা-বাবারা বন্ধু হয়ে ওঠে, শাস্ত্রেই তো বলেছে এরকম।'

'কাল সকাল থেকেই আমাদের কোমর বেঁধে লাগতে হবে। বাড়িটার যা দশা হয়ে আছে!'

রুমা জরিপকরা চোখ দিয়ে বোনকে দেখল। ক্ষমার ডাগর দুটো চোখে অন্যরকম ভাষা। স্বভাবতই ছটফটে হলেও ওর এ-ভাবটা নতুন। ওর মাঝারি ফর্সা মুখে যেন একটা আলোর খেলা চলেছে। দিদি ওর দিকে একাগ্র চোখে চেয়ে আছে দেখে ও যেভাবে মুখ নামাল তার মধ্যে সদ্য-কিশোরীর লজ্জাভা।

পরেরদিন সকালে সত্যিই কোমর বেঁধে কাজে লেগে যায় ক্ষমা। এমনিতে কুঁড়ে, সংসারের সবে কাজে দিদিই ভরসা, কিন্তু এখন যেন প্রজাপতির মতো ওর ডানা গজিয়েছে। চঞ্চল পাখনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। সব কিছু মেজে ঘষে ঝকঝকে করে তুলছে। সামান্য অ্যাসট্রেটা পর্যন্ত ওর কোমল সযত্ন হাতের সেবা পেল। সুদৃশ্য পেয়ালা-পিরিচ তোলা ছিল আলমারির অবহেলিত কোণে, অতিথি-হীন সংসারে ওগুলোর এতদিন দরকারই পড়েনি, এখন ওদের কি কদর! ওদের দেহ থেকে ক্ষমা অযত্ন-অবহেলার ছোপ তুলে দিল নরম আঙুলের সোহাগে। রাশি রাশি রঙীন ছিট কিনে এনে ধুলোজমা সেলাই মেশিনটা ঝেড়ে পুঁছে বসে গেল, পর্দা বানাবে। কান্ড দেখে রুমা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

সোমনাথ দত্ত বসে নেই। বেতো পা নিয়েই ঘোরাঘুরি করে দেওকিপ্রসাদের জিপ আর বোস সাহেবের বাগানের রজনীগন্ধার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ছোট মেয়ের কান্ড দেখে বড়ো মেয়েকে বললেন, 'ক্ষমাটার কান্ডটা দেখেছিস! শেষ পর্যন্ত ছেলেটো যদি না আসে বেচারা কষ্ট পাবে।' তারপর স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বললেন, 'এ বাড়িতে কেউ তো কখনও আসেনি। তাই এত উৎসাহ।'

রুমা জবাব দিল না। মানুষের হঠাৎ-উৎসাহের কতো কি কারণ থাকতে পারে, মেয়ে হয়ে সব কথা কি বাবাকে বলা যায়?

সোমনাথ দত্ত এবং আর সকলের সংশয় দূর করে দিয়ে সাতই সেপ্টেম্বরের সকালে মনোহরপুর নামক স্বল্পখ্যাত স্টেশনে হাওড়া থেকে বহু-প্রত্যাশিত অতিথিটিকে বয়ে এনে নামিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটি চলে গেলে রাউরকেলার দিকে।

এক যুগের ব্যবধানে আনায়াসে একপক্ষ চিনে নিল অপরপক্ষকে। আপাত পরিবর্তন সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যে স্থির অপরিবর্তনীয়তা থাকে তাতেই চেনাচিনির অসুবিধা হল না।

সোমনাথ দত্তের পায়ের ধুলো নিয়ে তুহীন বলল, 'কেমন আছেন মেসোমশাই?'

'ভাল। এ-বয়েসে যতোটা ভাল থাকা সম্ভব। ভারি ভাবনায় ছিলুম হে। মেয়েরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যাক শেষ পর্যন্ত এলে! বাড়ির খবর ভাল তো?'

'ভাল আছে সবাই। সবাই বলতে আমি আর মা। বোনেরা তো—তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আসে মাঝে মাঝে।'

'তুমি বুঝি ঘর সংসার—

'আজ্ঞে না। হয়ে ওঠেনি।'

'তা বেশ।' সোমনাথ দত্ত বললেন। কেন যে ওরকম কথাটা বললেন কে জান!

এক যুগ দেখা সাক্ষাৎ নেই। অথচ তুহীনকে বেশ সহজ-স্বচ্ছন্দই লাগছিল। রুমাকে সে 'ভাল আছো রুমা' এমন অনায়াসে বলল যে যেন গত সপ্তায় ওদের দেখা হয়েছিল। ক্ষমার দিকে চেয়ে বলল, 'এই মেয়েটা একেবারে লেডি হয়ে গেছে দেখছি। তুমি তো ক্ষমা, না?'

'হ্যাঁ।' ক্ষমা মাথা নাড়ে।

'তোমাকে দেখেছিলাম এই অ্যাত্তটুকু। আর এখন—'

'এখন কেমন দেখছ?' রুমা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

'যদি অভয় দাও তো উদ্ধৃতি দিয়ে বলি—কোমল অঙ্গের লাবণি বহিয়া যায়।'

'একেবারে বৈষ্ণব পদাবলীর কোটেশন! ঠিকই বলেছ, ক্ষমাকে এখন বেশ সুন্দরী বলা যায়।'

'তুমি প্রায় একই রকম আছো রুমা। শুধু আকারে কিঞ্চিৎ বড়োসড়ো।'

'আগের ক্ষমাকে তোমার মনে পড়ে তুহীনদা?'

'পড়ে। পুঁচকে, একফোঁটা, রোগা । আর হ্যাঁ, ঝগড়াটে।'

'ঝগড়াটে!' ক্ষমা অবাক চোখে তাকাল!

তুহীন গম্ভীরভাবে বলল, 'পড়া বলে দিলাম না বলে ঝগড়া করত। এটুকু মনে আছে। এখনও আছে নাকি সেইরকম? তাহলে মুশকিল। আমি দু'দিনের অতিথি—ঝগড়া নয়, ভাব করতে এসেছি।'

রুমা বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে ক্ষমা, শুনলি তো কি বলল তুহীনদা?' তারপর রহস্যময় ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'আমার বোন এখন সেরকম মেয়েই নয়। আড়ি না, ও ভাব করতে চায়।'

স্টেশন থেকে রুমাদের বাংলো সামান্য রাস্তা। সোমনাথ দত্ত আগেই চলে গিয়েছেন।

কোয়নার পুলটা পেরিয়ে ওরা একটা রাঙা মাটির রাস্তা ধরল। দু'ধারে আতাঝোপ। নিঃসাড়-নির্জন পথ। রুমা আর তুহীন আগে আগে, ক্ষমা কিছু পিছু হাঁটছে। ওদের টুকরো কথার আবছা রেশ কানে ভেসে আসে। ক্ষমা প্রায়-অচেনা আগন্তুকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বার বছর আগে দেখা সদ্য তরুণটিকে তার যেটুকু অস্পষ্ট মনে আছে তার সঙ্গে এর বিস্তর তফাৎ। সে ছিল স্বপ্নালু, ছিপছিপে, মুখচোরা। এর গায়ে মেদ লেগেছে, চোখে চশমা উঠেছে, চুল ঈষৎ পাতলা। তবে সব মিলিয়ে সুশ্রী বলা যায়। তুহীনের পাশে দিদিকে এখন বয়স্ক লাগছিল। বয়স্ক, পরিণত এবং অভিজ্ঞ। দিদির সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ মাত্র বছর চারের, কিন্তু দেহ আর মনের তফাৎ শত যোজন। ক্ষমা জানে দিদি না হয়ে সে যদি তুহীনের পাশাপাশি হাঁটত তাহলে অনেক মানাত ভাল। তুহীনের মন্থর হাঁটার ভঙ্গিটা অনেক গতি পেত, আর নিঃসাড় রাঙা মাটির পথটা শব্দিত হয়ে উঠত মানে-না-থাকা কথার কূজনে-গুঞ্জনে।

কিন্তু দিদির সঙ্গে তো প্রতিযোগিতা চলে না। দিদি যে ওর সখী-সচিব-মিত্র। পাহাড়-জঙ্গলঘেরা নদীমেখলা মনোহরপুরের এক মনোরম সকালে এক স্নিগ্ধ যুবকের পাশাপাশি হাঁটার দুর্বার প্রলোভন বহু কষ্টে সংবরণ করল ক্ষমা।

কিন্তু পরবর্তী কয়েকটা দিনে ক্ষমার প্রলোভন দমন করার প্রশ্নই রইল না। দিদি বুঝি ওর মনের ভাষা পাঠ করতে পেয়েছিল। দেখা গেল সকাল-সন্ধেয় বেড়াতে যাবার সময় হলেই রুমা কাজের অজুহাত দেয়, ক্লান্তির কথা বলে, সাংসারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার ছুতো আনে। তুহীন যদি বলে, 'কাল আমরা অনেকক্ষণ কোয়নার ধারে বেড়ালাম, আজ কোয়েল দেখতে যাব। রুমা তুমিও চলো না সঙ্গে! তিনজনে বেড়ানোটা জমবে ভাল।'

রুমা অমনি শাড়ির-আঁচল দিয়ে মুখের কল্পিত ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'আমার অনেক কাজ। সন্ধের জলখাবার, রাতের খাবার-দাবার বানাতে হবে। বাবাও এসে পড়বেন একটু পরে, বাড়িতে কেউ থাকবে না তা কি হয়?'

'ওসব তো বেড়িয়ে এসেও হয়। হাতে অনেক সময়। এমন বিকেলটা নষ্ট করি কেন?' তুহীন বলে।

'নষ্ট কিসের? আমার বোন ঝকঝকে তরুণী। ওকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেলে কারো বিকেল নষ্ট হবার কথা নয় তো। বিকেলটা মধুর হয়ে ওঠার কথা। তুমি কি বলো?'

তুহীন কিছু বলে না, হাসে। শুধু ক্ষমার মনে হয় দিদিটা হঠাৎ যেন বড়ো প্রগলভ হয়ে উঠেছে। এতে সে লজ্জা পায়, আবার খুশিও হয়ে ওঠে।

ওরা চলে গেল, রুমা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার আর রাতের খাবার বানাতে বসে যায় না। সেজন্য সত্যিসত্যি তাড়াও নেই। জঙ্গলের পটে আঁকা নিরালা শিলাগর্ভ কোয়েল দুটি নরনারীর বেড়াবার ইডেন। কোয়েলের তীরে অনেক বনো ফুল, বহু

অজানা গাছ, অনেক অচীন পাখির স্বর। সে সব নিয়ে দু'ঘন্টা মগ্ন থাকা অনায়াস ব্যাপার। সুতরাং সন্ধের অন্ধকার গায়ে না মেখে ফিরবে না ওরা। এদিকে বাবা তো ফিরতে একটু রাতই করেন। সুতরাং ওদের সঙ্গে যেতে না পারার জন্যে কাজের ওজরটা একটা বাজে অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কেন এই মিথ্যে অজুহাত?

সে-কথাটাই রুমা একা ভাবে বসে বসে বাংলোর লনটায় চেয়ার পেতে। অনেক দূরের চিরিয়া পাহাড়টা বিকেলের তামাটে আলোয় কেমন ঝাপসা। মনে হয় ওখানে কুয়াশা জমেছে। তার মনের ওপরও ওই রকমই গাঢ় কুয়াশার পর্দা ঝুলছে যেন। সেই পর্দা ভেদ করে নিজের মনটাকে একটু চিনে নিতে চাইল রুমা।

ক্ষমার কাছে তুহীনকে সঁপে দেওয়ার এই নিঃশর্ত ছাড়পত্র কতখানি সত্যি? এ তো ঠিকই যে বারো বছর পরে এক কৈশোরবেলার সঙ্গীকে নতুন করে আবিষ্কার করার স্বপ্নে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল ক'দিন; তুহীনের চিঠি পাওয়া থেকে শুরু করে তার আসা পর্যন্ত বেশ কয়েকটা দিন তার প্রবল অস্থিরতায় কেটেছে। অবশ্য বাইরে থেকে তার মনের তরঙ্গ কারো চোখে পড়েনি, এমনকি ক্ষমারও নয়। বাইরে সে স্থির, নিস্তরঙ্গ। এটাই তার প্রকৃতি। কিন্তু নিজের মনের চেহারা নিজের কাছে তার অচেনা নয়। তুহীন আসাতে সে বাস্তবিকই খুশি হয়েছে। এমনও নয় যে তার জীবনের গোধূলিবেলা; এখনও তার সাধবাসনা আছে, সংসার রচনার স্বপ্ন আছে। তাহলে তার এই আত্মগোপন করা কেন, কেন ওই আড়াল সৃষ্টি? এ কি শুধু মা-হারা সংসারে ছোট বোনটির প্রতি গাঢ় স্নেহের প্রকাশ? জ্যেষ্ঠার কর্তব্যবোধ? হয়তো তাই, হয়তো নয়।

সংশয়ে ভরা নিরুত্তর মনটাকে নিয়ে বড়োই বিব্রত বোধ করল রুমা। চিরিয়া পাহাড়ের শীর্ষ এখন কুয়াশাময়। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে দূর বনভূমির চূড়ায়।

কি করছে ওরা এই আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন কোয়েলের তীরে? ভাবার চেষ্টা করল রুমা। ঘাসের জাজিমে পা ছড়িয়ে পাশাপাশি বসে আছে দুটি যুবক-যুবতী! দূরত্বের আড়াল ঘুচে গিয়ে ওরা কি পরস্পরের মনের কাছাকাছি? পাখির ডাক, কোয়েলের কল্লোল, হাওয়ার প্রলাপ আর বনের মর্মর কি সাহায্য করতে পেয়েছে দুটি অন্তরের মধ্যে যোগসূত্র রচনার?

বিগত কয়েকটা দিনে মনোহরপুরের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ওদের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিল। কোয়নার তীরের রাস্তাটা, সীতাহার ফুলের গাছ ঘরা সুদূরে হারানো রাঙা মাটির পথখানি, টিলাময় মহুয়াবীথি—এসব তো অরসিকের মনে রঙের জোয়ার আনে। ওগুলোয় সঞ্চরণশীল দুটি মূর্তি দূর থেকে আভাসে-সংকেতে চোখে পড়েছে রুমার। কিন্তু এ-সবের পরিণতি কি হয়েছে জানে না রুমা, ক্ষমাও তাকে বলেনি। না-ই বলুক, তুহীন যদি ক্ষমাকে চায়, সে হয়তো খুশিই হবে।

ক্ষমা যে অন্তত খুশি সেটা স্পষ্টতই তার হাবভাবে প্রকাশ পায়। ওর আভাময়

মুখ, চোখের দ্যুতি, ঠোঁটটেপা হাসি—মেয়েদের মনের কথার এই মেয়েলি ভাষা নারী হয়েও রুমা বুঝবে না এতটা অবোধ সে নয়। তারপর বিদ্যুতের চকিত উদ্ভাসের মতো ক্ষমার টুকরো টুকরো কথাগুলো ওর মনের সংগোপন বার্তাকেই কি উদ্ভাসিত করে দেয় না? 'জানিস দিদি, আজ কতোদূর যে হাঁটলাম! ইচ্ছে করছিল হাঁটতে হাঁটতে একেবারে হারিয়ে যাই,' অথবা 'আজ না তুহীনদা এক এক কাণ্ড করেছে'— কি কাণ্ড সেটা অবশ্য খুলে বলে না ক্ষমা, অথবা 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' —জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি গুন্ গুন্ করে গাওয়া—এসবের মানে বুঝতে কিছু বিদূষী হাওয়ার দরকার করে না। বুঝেও রুমা কেন যে বোনের ওপর সহসা এত উদার আর প্রসন্ন হয়ে উঠেছে সেটুকুই বুঝি তার জানা নেই। জানা নেই ক্ষমারও।

জানা নেই বলেই ক্ষমা প্রশ্ন তোলে।

'আমরা এতদিন বেরোলাম। তুই কিন্তু একদিনও সঙ্গে গেলি না। ব্যাপার কি রে দিদি?'

'ব্যাপার আবার কি? সময়ই তো পাইনা। তুই সঙ্গে থাকছিস, আমার থাকার দরকারটা কি? তুহীনদা কিছু বলছিল?'

'সেরকম কিছু না।'

'তবু?'

'বলছিল, তোমার রুমাদি কি বদলে গেছে?'

'তুই কি বললি?'

'যা সত্যি তাই বললাম। বললাম, দিদির পক্ষে সংসার ছেড়ে বেরুনো শক্ত। তাই সঙ্গে যেতে পারেনি।'

'তুহীনদা খুশি হল শুনে?'

'জানি না! তবে এবার বোধহয় তোকে ছাড়বে না। কালই তো চিরিয়া পাহাড় যাওয়া হচ্ছে। থলকোবাদে তুই যাসনি। চিরিয়ায় না গেলে তুহীনদা কিন্তু খুব রাগ করবে। যাবি তো?'

'দেখি।'

রাতের বেলা খেতে বসে তুহীন বলল, 'না, 'দেখি' বলবে না। ওরকম এড়ানো উত্তর এসে অব্দি শুনছি। পরশু আমি চলে যাবো। অন্তত একদিন সকলে মিলে ঘুরে আসা যাক। এবার কোনো বাজে ওজোর শুনতে চাই না রুমা।'

'বেশ, যাবো।' রুমা রাজী হল।

রাজী হল এবং সঙ্গে গেল। চিরিয়া পাহাড়ের তিন হাজার ফুট উচ্চতায় আকাশ যেখানে মাটির অনেক কাছাকাছি, যেখানে শাল আর মহুয়ার বনে প্রকৃতির আশ্চর্য মাদকতা—সেখানে ক্ষমার মনটা সহসা কি বড়ো উদার হয়ে গেল? তাই কি বলল, 'আমি আর বাবা ততক্ষণ বরং আয়রন ওরের খনিগুলো দেখে আসি, তোরা ঘুরে

আয় একটু।'

'কেন?' রুমা শুধলো।

'আমার পাঁচদিন, তোর অন্তত একদিন।'

'দিদিকে দয়া করছিস?'

'যা ইচ্ছে ভাবতে পারিস।'

চিরিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরটার দিকে তুহীন আর রুমা হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে রুমা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ক্ষমা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে, স্থির চোখে।

চিঠিটা পড়ছিল রুমা। তাকেই লিখেছে তুহীন শহরে ফিরে গিয়ে।

—ক্ষমার পাঁচদিন, তোমার ছিল এক দিন। কিন্তু তার মধ্যেই তোমার মনের ভাষা পাঠ করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। আগের পাঁচ দিন নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলে। সেটাই তোমাকে বেশি করে প্রকাশ করে দিয়েছিল। চিরিয়া পাহাড়ের উঁচু শিখরে তোমার আত্মগোপনতার চেষ্টা আমার চোখ খুলে দিল। তুমি বললে, 'আমার বোন ক্ষমাকে তোমার ভাল লাগেনি?' তখন দেখলাম তোমার প্রশ্নটা ভিজে গেল তোমার চোখের জলে। ক্ষমা নিশ্চয়ই ভাল মেয়ে, দেখতে শুনতেও ভাল! আমার মতো অভাজনের পক্ষে যথেষ্টই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমা নয়, আমি যাকে চাই সে-মেয়ের নাম রুমা। এ সংবাদে তোমার বোনটি আঘাত পাবে কিনা জানি না, তবে আমাকে তো সত্যের পথই বেছে নিতে হবে। বারো বছর আগে সে-সাহস দেখাতে পারিনি, তা আজ দেখাতে আমার দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। তোমার ও আমার নীরব অপেক্ষা পুরস্কৃত হোক, এটাই বোধহয় ভাগ্য দেবতার ইচ্ছে।...............

এ চিঠি কি তুলে দেওয়া যায় ক্ষমার হাতে? এ আঘাত সইতে পারবে কোন নারী? রুমা অনেক সংশয় নিয়েই চিঠিটা তুলে দিয়েছিল বোনের হাতে। ক্ষমার মুখখানা কি নীল হয়ে গেল দুঃখে-বেদনায়? কিন্তু আশ্চর্য নারীচরিত্র! ক্ষমা হেসেই খুন। বলল, 'কি রকম কাব্য করে চিঠিটা লিখেছে দেখ। অথচ অমন নির্জন নদীর ধারে, টিলার জঙ্গলের মধ্যে একটাও মিষ্টি কথা বলেনি আমার সঙ্গে। অমন গোমড়ামুখো মানুষকে নিয়ে বেড়াবার কি যে কষ্ট!'

'তার মানে তুই বলছিস—' রুমার কথা বেধে যায়।

'তার মানে তাই। আমি যদি বা লোহা তুহীনদা চুম্বকই নয়। ওরকম গম্ভীর স্বভাবের লোককে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।'

আশাবরী

# গোত্রহীন

গত সাত দিন আমিনচকের পুব পাড়ায় তিনবার পুলিশ হানা দিয়েছে; সবই রাতের বেলায়। কিন্তু সুদামের হদিশ করে উঠতে পারেনি। অথচ সে আমিনচকেই আছে। প্রায় পুলিশের নাগের ডগায় ওপর। মথুর পল্যের যে বাড়ির পোড়ো গোয়াল ঘরটার মাচানে সে শীতঘুম ঘুমচ্ছিল সেখান থেকে দেড়শো গজের ভিতর দিয়ে পুলিশের জিপ চলে গিয়েছিল। মথুর পল্যের বাড়িটা জেলা বোঁডের রাস্তার ধারেই।

প্রত্যেক বারই হানা দিয়েছে রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে যখন আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরে মাতাল, আশ্লেষ-আতুর ডবকা বিধবার ডাকে বাড়িছাড়া নাগর, আর চোরছ্যাঁচড় মনিষ্যি ছাড়া রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হবে না। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই। জগা মাতালের সামনে পুলিশ জিপ থেকে নেমে পড়তেই সে কাঁদো কাঁদো গলায় হাত জোড় করে বলেছিল, 'ইচ্ছে করে খাইনি মাইরি। ঘোৎনাটা জোর করে খাইয়ে দিল স্যার। বাড়িতে আমার বড় দুঃখু। সংসারে ফিরতে মন নেই। আমাকে এক্ষুনি থানায় নিয়ে চলুন। সেখানেই থাকব। আমি স্যার সন্নিসি হয়ে যাবো।' একজন পুলিশ জগার বাঁ আর ডান গালে দুই থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ভাগ শালা, মাতাল কোথাকার।' জগা ছুটতে গিয়ে কাছায় পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল রাস্তার ধুলোয়। ওর লুটানো কাছা যথাস্থানে এঁটে দিয়েছিল একজন বিবেকবান পুলিশই।

পঞ্চাশ-ছোঁওয়া অমূল্য মাইতি হপ্তাবাবু। ফি-শনিবার বাড়ি আসে। রাতচরা লোক। তবে চোর টোর নয়। টেরিলিনের শার্ট আর চেক-কাটা লুঙি এঁটে, গায়ে আতর ঢেলে, পাড়া একটু ঠান্ডা হতে ডালিম বেওয়ার নধর গতরটার স্বপ্নে বুঁধ হয়ে নিঃশব্দ খটাশের মতো হেঁটে যাচ্ছিল, পড় তো পড় পুলিশের সামনে। ওদের মধ্যেও কম খটাশ নেই। রতনে রতন চেনে। ওদের টর্চের আলোয় মইতিবাবুর লালসামাখা চরিত্র একেবারে উদোম হয়ে গিয়েছিল। এক ব্যাটা তো বলেই ফেলল, 'এ যে রাতচরা নাগর হে। তা এত রাতে যাচ্ছো কোথায় চাঁদু? আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো না,

পেসাদ করে দিই।' নেহাত ভদ্রলোকের মতো দেখতে বলে অমূল্য চড়চাপড় খায়নি। কিন্তু কানে গরম সীসে ঢেলে দেবার মতো নোংরা সব কথাবার্তা শুনে সে পালাতে পথ পায়নি।

কানু প্রামাণিক রাতবিরেতে ছোটখাটো চুরি করে।চেহরাটা ছোটখাটো আর পাৎলা, চোরের মত মস্তান টাইপ নয়। গলায় হরিনামের মালা, গোঁফদাড়ি কামানো। পুলিশ দেখে ঘাবড়ায়নি। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল,'বড্ড দেরী করে ফেললেন স্যার। পাখি উড়ে গেছে।'

কানুর গদো-গদো, ভক্তিরস মাখানো কথাবার্তায় পুলিশ মজা পেয়েছিল। বলেছিল, 'কোন পাখির খোঁজে এসেছি জানিস?'

'আজ্ঞে বাজপাখি, মহাশয়গণ। আপনারা কি আর ফিঙে চড়ুইয়ের খোঁজে আসবেন?'

'সুদাম সাঁতরা গ্রামে নেই বলছ?'

'সে তো আজ মাসখানেক হল নেই। বিহার না উড়িষ্যা কোথায় যেন পালিয়েছে। সাংঘাতিক ছেলে।'

'ঠিক জানো এখানে নেই?'

'পাড়ার লোক, জানব না?' আমিও তো তাকে খুঁজছি স্যার। হাতের কাছে পেলে ছিঁড়ে ছত্রখান করে ফেলি।'

'এত রাগ কিসের?'

কানু প্রামাণিক আকাশ থেকে পড়ছিল, 'বলেন কী স্যার? রাগ হবে না? আমার অমন দুধেলা গাইটাকে গোয়াল থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে মা ওর পাঁচশ টাকায় নজর আলিকে বিক্রি করে দিয়ে এল। গোরুর শোকে আমার বউটার হাড়ির হাল হয়েছে। চেখে দেখা যায় না স্যার। এসব অবিশ্যি বছর খানেক আগেকার কথা।'

'বুঝলাম। তা এত রাতে মশাইয়ের যাওয়া হচ্ছে কোথায়? বাজপাখি, না ফিঙে-চড়ুইয়ের খোঁজে?'

কানু প্রামাণিক এক হাত জিভ কেটে বলেছিল, 'কি যে বলেন স্যার? ওই যে বললুম বউটার শরীর খারাপ! পেটে ব্যথা। চক্কোত্তি মশায়ের কাছে যাচ্ছি। উনি মারণ-উচাটন, বশীকরণ আর ঝাড়ফুঁকে ওস্তাদ।'

পুলিশ চলে গেলে কানু পেট ঝেড়ে হেসেছিল। অবশ্য আওয়াজ করে নয়, মনে মনে। চোরের কাছে পুলিশ নিচ্ছে ডাকাতের খোঁজখবর! বোঝ ব্যাপার। আরে বাবা, শুধু চোরে চোরেই কি মাসতুতো ভাই হয়? চোরে-ডাকাতেও মাসতুতো-ভাই হয়। পরের দিন জগা মাতাল আর কানু সুদামের কাছে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে সব বলেছিল। তারপর তিনজন মিলে কি হাসাহাসি!

তবে বাইরে সুদাম হাসলেও মনে মনে খুবই চিন্তিত। এ গ্রামের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। তোলপাড় কাণ্ড চালাচ্ছে পুলিশ। যে কোনদিন সে ধরা পড়ে যেতে পারে। পাড়ার লোক এখনও মুখ খুলছে না, কিন্তু খুলতে কতক্ষণ! আসলে তার বাপ মানুষটা খুব ভাল। আর মা একেবারে মাটির মানুষ। তার ওপর পড়শিদের সহানুভূতি সেই কারণেই। না হলে এতদিন লোহার গরাদে ঘেরা ঠাণ্ডাঘরে লপসি খেয়ে মরতে হত। কিন্তু পল্যে বাড়ির ঠিকানাটা পুলিশের কানে তুলে দেবার মতো লোকের অভাব নেই। দিনের পর দিন পাড়ায় পুলিশী হামলা মানুষ পছন্দই বা করবে কেন?

দিনের বেলাটা সে অবিশ্যি গা বাঁচিয়ে ঘোরাঘেরা করতে পারে। তবে ওই নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে যা কিছু। রাত হলেই মথুর পল্যের গোয়াল ঘর। আকাশে সূয্যিদেব থাকতে খাকী উর্দির লোকেরা আমিনচকে ঢোকে না। আঁধার মনের মানুষদের নিয়ে ওদের কারবার বলে ওরা আঁধারই পছন্দ করে।

মথুর পল্যে এমনিতে কড়া লোক। সাধ করে চোর-ডাকাতকে ঘরে ঠাঁই দেবার মানুষই নয়। তবে কিনা ওর মেজ ছেলে মনু সুদামের বন্ধু এবং পল্যেগিন্নি সুদামের মায়ের বকুলফুল। ওদের জন্মের আগে থেকেই ওদের মায়েরা পরস্পরের সই। তাই মনুর মায়ের অনুরোধ মনুর বাপ পায়ে ঠেলতে পারেনি। তা বাদে সুদামের মা পল্যে মশাইয়ের কাছে নিজে এসেও কান্নাকাটি করেছিল। তাছাড়া গোয়াল ঘরটা এমনিতেই পড়েছিল, গোরুর পাট উঠে গেছে। সেখানেই আপাতত সুদামের রাতের আশ্রয় জুটেছে। মশা আর পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ঘুমপরীবা সুদামের কাছ ঘেঁষে না। কষ্ট যা হয় তা কহতব্য নয়। পল্যেগিন্নি একটা ছেঁড়াফুটো মশারি দিয়েছে। সেটাই যা একটু রক্ষে। তবে ঘুম ইদানিং পাৎলা হয়ে গিয়েছে। 'পুলিশ' শব্দটা ঘুমের মধ্যেও সুদামকে তাড়া করে।

ওদের দলের পাঁচজন ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাদের মুখ থেকে সুদামের ঠিকানাপত্তর পুলিশের জানতে বাকি নেই। আমিনচকে ওদের ঘনঘন আসা-যাওয়াতেই সেটা মালুম। মথুর পল্যে এক সন্ধেয় এসে বলে গিয়েছে, 'তোমার মতলবটা কি হে! আমাদের হাতে হাতকড়া পরাতে চাও না কি?'

'আর কটা দিন কাকা। চারদিক একটু ঠান্ডা হলে চলে যাব। এরা নিশ্চয় গোয়েন্দা লাগিয়েছে। দিনমানেও নজর রাখবে।' সুদাম বলেছিল। মথুর পল্যে নিজের মনে গজগজ করতে করতে চলে গিয়েছিল।

মনুরা বিপদে পড়ুক, এটা চায়নি সুদাম। সে পালাবে, এটা ঠিক। কিন্তু পালাবে কোথায়? পালিয়ে বাঁচতে হলেও তো টাকাকড়ি চাই। অথচ হাত একেবারে খালি। একবার ঠাকরুণচকের এক জোতদারের বাড়িতে তারা হামলা করেছিল। শূন্য হাতে

ফিরে আসতে হয়েছে। বাড়ি তো নয়, যেন গোলকধাঁধা। কিচ্ছুটি হাতাতে পারে নি। শূন্য হাতে ফেরার রাগে মাথা-গরম এক ছোকরা একজনকে খুন করে বসল। মার্ডার-টার্ডার না হলে পুলিশ আজকাল রা কাড়ে না। কিন্তু নরহত্যার জের আলাদা। পুলিশ যে এমন হন্যে হয়ে উঠেছে তা ওই মার্ডারটার জন্যে। তারই ধাক্কায় সুদামের টালমাটাল অবস্থা।

পল্যে মশাইয়ের বাড়িতে এমনিতে অবিশ্যি বেশ নিরাপদেই আছে সুদাম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে চৌহদ্দি। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাড়িতে লোক গাদাগাদি। পিছন দিকে গোয়াল ঘরটা একটেরে। তারপর বাঁশবাগান, পুকুর। একটা সুঁড়ি রাস্তা বাঁশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনেকখানি গিয়ে গাঁয়ের ভিতর-মাঠে পড়েছে। বাড়ি সার্চ করতে এলে ওই রাস্তা দিয়ে মাঠ ঝাঁপাতে পারলে তাকে আর পায় কে! পালাতে না হয় পারল, কিন্তু অকূলে ভাসার মতো বৈঠার জোর তার কোথায়? তার নৌকা যে হালভাঙা, পালছেঁড়া।

রাত এগারটা পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি টি-ভি, রেডিও চলে। পল্যে বাড়িতেই দু'কর্তার দুটো টি-ভি। বাড়িটা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। তারপর তিলেকে কেমন চুপচাপ হয়ে যায়। গোটা গ্রামটাও শবাসনে শুয়ে থাকা মানুষের মতো নিথর-নিঃসাড় হয়ে পড়ে। গোয়াল ঘরের টঙে শুয়ে থাকা সুদাম কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে না সঙ্গে সঙ্গে। ঘুম আসে না। ওর বোজা চোখের পাতার ওপর নাচতে থাকে কয়েকটা মুখ। নোটন, আতা, ভটকাই, করিম, শান্ত, তুলসী। ফেরোসাস সব ছেলে। ডাকাতি আর খুন জখমের বিদ্যেয় দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

ওদের পাল্লায় পড়েই আমিনচকের ঠাকুরভক্ত, কীর্তন গাইয়ে, চাষাভুষো বাপের নিতান্ত গোবেচারা, ভালমানুষ ছেলেটার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। কি কুক্ষণেই সে হাওড়ার দাসনগরে লেদমেশিনে কাজ শিখতে গিয়েছিল! রুজি-রোজগারের ধান্দা না করে উপায় ছিল না। নোটন-ভটকাইদের সঙ্গে ওখানেই চেনাশোনা। দিব্যি ভদ্দরলোকের মতো চেহারা সব। ভাল বাড়ির ছেলে। মুখচোখের চেহারায় গো-বেচারা ভাব, ঠান্ডা-ঠান্ডা কথাবার্তা। লোকের দায়ে-আপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু সময় বিশেষে অন্যরকম। এই বর্ণচোরা নয়া মাস্তানদের সুদামের চেনার কথা নয়, চিনতও না। ফলে সহজেই ওদের ফাঁদে পা দিল। মেলামেশাটা জমে ওঠার পর এক রাতে ওরা বলল, 'আজ একটা মজা হবে, বুঝলি সুদাম। আমাদের সঙ্গে চল।'

'কোথায়? খারাপ কিছু নয় তো?' সুদামের গলায় গ্রাম্য ভীরুতার ছাপ।

'চেহারাটা তো দিব্যি শক্তপোক্ত। এত ভয় পাচ্ছ কেন চাঁদু?' এই বলে ভটকাই ওর থুৎনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'আজ আমরা একটা অপারেশনে বেরোচ্ছি। ভয়ের

কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে মেশিন আছে।'

অপারেশন, মেশিন—শব্দগুলোর ব্যাপারে একটা অস্পষ্ট ধারণা ইতিমধ্যেই সুদামের গড়ে উঠেছিল ওদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে। সুদামের নাকে একটা মন্দ অভিসন্ধির গন্ধ এসে লাগে। সভয়ে বলে উঠেছিল, 'আমি ওসবে নেই ভাই।'

কিন্তু নেই বললে ছাড়ে কে! সুদামের শক্ত কব্জিটাকে সাঁড়াশির মতো মুঠোয় চেপে ধরে নোটন বলেছিল, 'লেদে প্যাঁচ কেটে হপ্তায় কত পাস? বাবাকে কত পাঠাস? মেয়েছেলের মতো প্যানপ্যানানি থামা বলছি।'

নোটনের কথার মধ্যে যেন ম্যাজিক ছিল। সুদামের প্রতিরোধ শিথিল হয়ে এসেছিল। সেই রাতে বোম্বে রোডের এক পাঞ্জাবীর ধাবায় হানা দিয়েছিল নোটনরা। যাকে বলে হাইওয়ে রবারি। সে রাতে সঙ্গে থাকা ছাড়া সুদামকে কিছু করতে হয়নি। সে শুধু গ্যাংস্টারের নির্দেশ মতো চারদিকে নজর রেখেছিল। রাত আড়াইটেয় ফেরার সময় ভটকাই ওর পকেটে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল। সুদামের এক মাস লেদ মেশিনে প্যাঁচ কাটার মজুরির সমান। সেই শুরু। তারপর ধাপে ধাপে কেবল নামা।

রাতে সে ঘুমোতো কারখানাতেই। এক রাতে কারখানা রেইড হল। কিছু নিষিদ্ধ অস্ত্রসমেত সুদামকে পেল ওরা। তারপর দু'বছর শ্রীঘর বাস। ছাড়া পাবার পর শহরে থাকা সম্ভব হয়নি। গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেই গেঁয়ো ভীরু যুবকটি নয়, ফিরে এল এমন একজন যার রক্তে শয়তানির বীজ।

সে বীজ উদ্গত হল আমিনচক এবং তার ধার-দিগরের জমিতে। ডাকাবুকো নষ্ট ছেলেরা এসে ভিড় জমাল সুদামের পাশে। আশেপাশের অঞ্চলের কিছু ধনীর বাড়ির ধনসম্পদ ওরা অবাধে হাল্কা করে ফেলল। কিন্তু ঝামেলায় পড়ে গেল ঠাকুরুণচকের জোতদার বাড়িতে হামলা করতে গিয়ে। মারবি তো মার একেবারে জোতদার মশাইয়ের ভাইপোকে। সে আবার রাজনীতি-টিতি করত। ওপর মহল থেকে চাপ এল থানার ওপর। বেশ ক'জনকে ওরা ছেঁকে তুলেছে। তবে পালের গোদাটাই বাইরে।

পুলিশের গন্ধ পাওয়া ইস্তক বাপ ওকে বাড়ি ঢুকতেই দেয় না। ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে বাড়ি ঢোকে। চাট্টি ভাত-তরকারি গিলে সরে পড়ে। মায়ের প্রাণ বলে কথা। হাঁড়ি চড়াবার সময় দু'মুঠো চাল নিতে ভোলে না। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ওইটুকুই। আর পাড়ার লোক দিন দুপুরেও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। তবে থানার লোকদের খবর দেয় না, নেহাৎ পাড়ার ছেলে বলেই। পালাবার কথা ভাবতে হচ্ছে সুদামকে। পল্যে বাড়ি ঠিক নিরাপদ নয়। যাকে বলে সত্যিকার অজ্ঞাতবাস। তাই তাকে করতে হবে কিছু দিন। কিন্তু কিভাবে হয়ে উঠবে সেটা?

## ।। দুই ।।

পল্যেদের বাগানের এক কোণে বসে এক বিকেলে সুদাম এসবই ভাবছিল। শীতের পড়ন্ত বেলা। বাগানের ফাঁকা চত্বরটায় গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়া। সেই কনেসুন্দর রাঙা আলোর বিকেলে ভিজে শরীরে গামছা জড়িয়ে যে লম্বাটে ছাঁদের শরীরটাকে বাগানের ফিতের মতো রাস্তাটা ধরে জল-পা আঁকতে আঁকতে সুদাম আসতে দেখল সে মনুর জাঠতুতো বোন লাবু। ভাল নাম লাবণ্য। সুদাম এমনিতে মেয়েদের দিকে তাকায় না। এ-বাড়িতে দীর্ঘকাল আসা-যাওয়া থাকলেও লাবণ্যকে সে নিতান্তই ওপর-ওপর দেখেছে। তবু তার মনে হল লাবু আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। রঙও যেন অনেক মলিন। ওর পুরুষ্টু অথচ হিল্‌হিলে শরীরের গড়নে চকিত আভাসেও পুরুষকে জাগিয়ে তোলার একটা ব্যাপার ছিল। এখন যেন সেটা নেই। অথচ কতই বা ওর বয়স! বড় জোর তেইশ-চব্বিশ।

মুখ নিচু করে আসতে আসতে লাবণ্য হঠাৎ মুখ তুলল। সুদামের সঙ্গে ওর চোখাচুখি হয়ে গেল। একটু ইতস্ততঃ করল, কি যেন ভাবল, তারপর গামছাটা টেনেটুনে শরীরটা ভাল করে ঢেকে এগিয়ে এল।

একটু বেশিক্ষণই যেন সুদামের দিকে চেয়ে রইল, তারপর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'তোমার খুব সাহস, না গো সুদামবাবু?'

সুদাম কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। লাবুর সঙ্গে তার তেমন কথাবার্তা হয়নি কখনও, তাই ওকে এভাবে কথা বলতে দেখে সে একটু অবাকই হয়েছে। লাবুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে উদাসভাবে একদিকে তাকিয়ে রইল।

'তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।' বলল লাবু। ওর চোখ অপলক, ঠান্ডা, স্থির।

'হুঁ, উচিত। কিন্তু—' সুদামের কথা জড়িয়ে গেল।

'মানুষ খুন করতে পার, অথচ পুলিশের ভয়ে পরের বাড়ি লুকিয়ে আছ? ছিঃ। এদের তুমি বিপদে জড়াচ্ছ কেন?'

'ঠাকরুণচকের মার্ডারটা আমি করিনি। বিশ্বাস করো।'

'করছি। মানুষ খুন করা তোমার কম্মো নয়।' একটু থেমে, লম্বা করে শ্বাস টেনে লাবণ্য বলল, 'হঠাৎ খারাপ রাস্তায় গেলে কেন?'

'মানুষের ইচ্ছে মতো সব কিছু হয় না। তুমিই বা হঠাৎ নোংরা রাস্তায় গেলে কেন?' সুদাম ঝাঁ করে বলে বসল।

লাবণ্যর মুখখানা তীব্র যন্ত্রণায় যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওর ব্যথার স্থানে সহসা সাংঘাতিক চোট লেগেছে বুঝি। মুখের স্বাভাবিক রঙ্ ফিরে আসতে বেশ একটু সময়

লাগল।

ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ইচ্ছেতে কিছু হয়নি। বিশ্বাস কর। আমার দোষ ছিল না।'

'আমারও তাই মনে হয়।' সুদাম বলল।

'পুলিশ তোমাকে ছাড়বে না। আজ না হোক কাল জানতে পারবে। এ-বাড়ির লোক মুশকিলে পড়বে। তুমি চলে গেলেই ভাল।' লাবণ্য বলল।

'জানি। হাতে টাকাকড়ি নেই যে!'

'টাকাটা কেউ যদি তোমাকে দেয়?'

'আমাকে আবার কে টাকা দিতে যাবে?' সুদাম অবাক হয়েই শুধলো।

'ধরো কেউ দিল!'

'তো নিলাম।'

'তার বদলে তুমি তাকে কি দেবে?'

লাবণ্য কি বলতে চায় ভেবে পেল না সুদাম। চেয়ে দেখল লাবুর ঠোঁটে তির্‌তিরে হাসি। সন্ধের ঘোর-লাগা মায়াবী আলোয় লাবণ্যকে অনেক কম বয়েসী দেখাল।

'তোমার অমন শক্ত কব্জি, চওড়া বুক, লম্বা ছাঁদের চেহারা—দেবার কিছু নেই বলছ?'

সুদাম তবুও কিছু বুঝল না। তার মনে পড়ল লাবণ্য একসময় থিয়েটারে প্লে করত। সেই নাটক থেকে এক চিলতে কথাবার্তা সে যেন তুলে এনেছে গাছগাছালিঘেরা বাগানের রঙ্গমঞ্চে।

লাবণ্য বলতে লাগল, 'তুমি ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছ। আর একজনের জীবনেও তাই ঘটেছে। তারও বড় যন্ত্রণা। সেও পালাতে পারলে বাঁচে। না, চলি। সন্ধে হয়ে এল। পরে আসব।'

লাবণ্য চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে সুদাম লাবণ্যের কথাই ভাবল। ওর জীবনে বিশ্রী একটা ব্যাপার আছে; ওর বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। স্বামী ওকে নেয় নি। বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যেই লাবণ্য মা হয়েছিল। সে সন্তান অবশ্য বাঁচেনি। স্বামী সঙ্গত কারণেই ঘরে ঠাঁই দেয়নি ওকে। সেই থেকেই ও বাপের বাড়িতে। লাবণ্য অবশ্য সন্তানের পিতৃত্ব প্রকাশ করতে চায় নি। শেষ চাপের মুখে মুখ খোলে। ওকে নষ্ট করেছে ওর কাকার ছেলে। মনুর ভাই। না, লাবণ্য লোভের ফাঁদে পা দেয় নি। মনুর ভাই ওর ঘুমন্ত অবস্থায় সুযোগ নিয়েছিল, একবার এক রকম ঝাঁঝাল ওষুধ নাকে চেপে ধরে খিদে মিটিয়েছিল। একেবারে ফিল্মী কায়দায়। ছেলেটা এক ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। পল্যেবাড়ির লোকেরা বেশ চাপা। তাই অন্দরমহলের ঘটনা চৌহদ্দির

বাইরে বিশেষ ছড়ায়নি। তবে কানাঘুষোয় জানতে পেরেছে সুদাম।

কিন্তু লাবণ্য নাটুকে ভাষায় কি সে বলে গেল তার খেই খুঁজে পাচ্ছে না সে। মনে হচ্ছে কষ্টে আছে মেয়েটা। এজন্য সুদাম কি করতে পারে? হ্যাঁ এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এটা ঠিক কথা। লাবণ্য এটা মনে পড়িয়ে দিয়ে ভালই করেছে। সে পালাবে । পালাবেই।

সকালবেলা বাড়ি গিয়ে মাকে বলল, 'আমায় শ'পাঁচেক টাকা দিতে পার?'

'পাঁচ টাকাও আমার হাতে নেই বাবা।' মা বলল।

বাবা আশেপাশেই কোথাও ছিল। এসে বলল, 'তুই কি আমার বাড়িতেও ডাকাতি করতে চাস নাকি? এখুনি বেরো। বেরিয়ে যা।'

সুদামের ভেতরের দস্যিটা রাগে ফুঁসে উঠল, ভাল মানুষটা ঘাড় হেঁট করল। বাপ গরিব সে জানে। ওদের কাছে পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। মায়ের পায়ে হঠাৎ সে একটা প্রণাম করে ফেলল। বলল, 'কাল থেকে আর তোমাদের জ্বালাতে আসব না। চললুম।'

'একটু দাঁড়া। আসছি।' এই বলে মা ভেতরে চলে গেল। একটু পরে ছোট পলিথিনের প্যাকেট এনে ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এটা নে।' সুদাম দেখল প্যাকেটে মুড়ি আর পেঁয়াজ রয়েছে। সুদাম আর দাঁড়াল না।

দুপুরে খেতে গেল না বাড়িতে। পেঁয়াজ-মুড়ি আর এক পেট জল খেয়ে কষে একটা ঘুম লাগাল। ঘুম ভাঙল শেষ বিকালে। আমিন চকে আজ ওর শেষ রাত্তির। সেই রকমই তো বলে এলো মাকে। সুতরাং চলে যেতে তাকে হচ্ছেই। কিন্তু খালি হাতে সেটা কি করে সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছে না।কিছু একটা উপায় হয়তো হয়ে যাবে। কি ভাবে? না তাও মাথায় আসছে না।

সুদামের মতো মানুষেরা খুব আবেগতাড়িত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে এবং যুক্তি-শৃঙ্খল রচনা করে ওরা কিছু ভাবতে পারে না। সুদাম অবিলম্বে শ্রান্ত বোধ করল আর ছোট্ট ব্যাটারি সেট রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে গান শুনতে লাগল। কিন্তু গানেও মন বসল না। তুলসীমঞ্চে বসে থাকতে থাকতে সে ক্রমশঃ রাত হতে আকাশে শুক্লা প্রতিপদের চাঁদ উঠতে দেখল। তারপর যখন দ্বিতীয়বার শেয়াল ডেকে উঠে রাতের গাঢ়তা জমিয়ে তুলল, তখন দেখল বাগানের ঘাস-পালা ডিঙিয়ে একটা চাদর ঢাকা মূর্তি তারই দিকে আসছে।

'কে?' চমকে উঠল সুদাম।

'চুপ। আমি লাবু।'

কাছে এসে বলল, 'এই ঠান্ডায় বসে আছ? শরীর খারাপ করবে যে!'

'জেলফেবৎ মানুষেব আবাব ঠান্ডা গবম।'

লাবণ্যব হাতে একটা মাঝাবি স্যুটকেশ। সেটা তুলসীমঞ্চে নামিযে বেখে লাবণ্য বলল, 'আজ বাতে পুলিশ আসবে। পল্যো বাড়ি সার্চ কববে। গোযাল ঘবটাও। পাকা খবব।'

'তুমি কি কবে জানলে?' সুদাম জিগ্যেস কবল।

'এ-বাড়িতেই তোমাব শত্তুব আছে। সে আমাবও শত্তুব। সেই খবব দিযেছে পুলিশকে।'

'তোমাকে বলল?'

'এ খবব কেউ বলে না। মুখ ফসকে বেবিযে পড়ে। শত্তুবটা কে বলতো?'

'মনুব ভাইযেব কথা বলছ? কিন্তু সে আমাব শত্তুব হতে যাবে কেন?'

'বা, তুমি থাকতে ওব অসুবিধে হচ্ছে না। ও তোমকে ভয কবে। ভিতুব ডিম তো। জানো, ও এখনও আমাব পিছনে লেগে আছে। ফাঁক ফোঁকব খুঁজে বেড়ায। জানোযাবটা আমাকে বেহাই দেবে না। আব—এ বাড়িতে বেশিদিন থাকলে মবে যাবো। বাবা দু'বেলা গালিগালাজ কবে। কাকিমা আমাকে বলে বেবুশ্যে, বৌদিবা বলে ভাইভাতাবি। কোন দিন আমি গলায দড়ি দিযে ঝুলে পড়ব। তোমাব অমন চওড়া বুক, শক্ত কব্জি—সে শুধু অন্যেব ক্ষতি কবাব জন্যে? লোকেব ভাল কবাব জন্যে নয?'

সুদামকে চুপ কবে থাকতে দেখে লাবণ্য বলে, 'চুপ কবে আছ কেন? একটা জানোযাব আমাব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তাই চাও?'

সুদাম এখনও চুপ।

লাবণ্যব আব তব সয না। ঝাঁঝাল গলায বলে, 'তুমি ডাকাত, না ছিঁচকে চোব?'

সুদাম এক লহমা স্থিব চোখে লাবণ্যেব দিকে চেযে বইল, তাবপব কঠিন মুঠোতে তাব মণিবন্ধ চেপে নিজেব দিকে টেনে নিল। লাবণ্য যন্ত্রণায ককিযে উঠল। এমন কঠিন পেষণ ডাকাতেবই হয, সে বুঝতে পাবল।

ছাড, লাগছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। ছাড়া পেযে তুলসীমঞ্চ থেকে স্যুটকেশটা তুলে নিযে বলল, 'এতে বাবাব দেওযা ছ'সাত ভবি সোনা আছে। বিযেব সময দিযেছিল। এতে আমাদেব চলে যাবে বেশ কিছু দিন। তাবপব তুমি একটা কাজ খুঁজে নেবে। দুজনেই আমবা দাগী,পোকায -কাটা। এদেশে আব না ফিবলেও আব কাবো মাথা ব্যথা হবে না। শুধু তোমাব মা হয তো কদিন কাঁদবে। ওবা গর্ভে ধবেছে ওদেব বড মাযা। ওবা এসে যাবে—পুলিশেব কথা বলছি। বেবিযে পড়ি চল।'

'চল।'

## ।। তিন ।।

একটু পরে দেখা গেল দুজন মানুষ মাঠ পার যে গাঁ-শেষের মস্তো উঁচু বাঁধটায় উঠে হাঁটতে শুরু করেছে। পুরুষটার হাতে স্যাটকেশটা। নারীর হাতে একটা পুঁটলি যাতে কিছু জামা কাপড় রয়েছে। আমিনচকের দুটো নষ্ট সন্তান চলে যাচ্ছে আমিনচক ছেড়ে হয়তো কিছু কালের জন্য, কিংবা বরাবরের জন্য। সেজন্য ওদের কারো মন ভারাক্রান্ত নয়। সুদামের বরং খুব হাল্কা লাগছে নিজেকে। কিংবা সুখী লাগছে, চাঁদের আলোয় এক চপলা কিশোরীর মতো লাগছে লাবণ্যকে।

দৃশ্যাটা প্রথম লাবণ্যর নজরেই পড়ল। 'ওই দেখ।' বলে উঠল সে।

সুদাম দেখতে পেল দক্ষিণের দিকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে দুটো হলদে শ্বাপদ চক্ষু দ্রুত এগিয়ে আসছে আমিনচকের দিকে। জিপের যান্ত্রিক শব্দটাও কানের পর্দায় বেজে উঠল পুলিশ আসছে।

সুদাম ভয় পেল না। তাড়াহুড়োও করলো না। এক হ্যাঁচকা টানে বাঁধকোলে নামিয়ে আনল লাবণ্যকে। বাঁধের প্রায় নিচেই গাইঘাটার খাল। শীতের দিন। হাঁটু জল। উঁচু পাড় থাকার জন্য খালের গর্ভস্থলী চোখ পড়ে না বাঁধ থেকে। লাবণ্যের হাত ধরে শীতসোহাগী ঠান্ডা জল পেরোতে পেরোতে সুদাম বলল, 'পুলিশ ডাকাত ধরতে আসছে, আর ডাকাত এদিকে ডাকাতি করে বামাল সমেত পালাচ্ছে।'

সুদামের উষ্ণ হাতের চাপ আনন্দে উপভোগ করতে করতে লাবণ্য বলল, 'এই যেন তোমার শেষ ডাকাতি হয়।'

শুক্লা প্রতিপদের চাঁদের নিচে সমাজছাড়া, গোত্রহীন মানুষ দুটিকে অলৌকিক রূপময় দেখাচ্ছিল।

অর্ক

# দহন

পাহাড়ের সানুদেশে একটি ক্ষুদ্র শিলাসনে বসেছিল মানুষটি। অলস কৌতূহলে তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল পরিপার্শ্বের গাছপালায়, লতাগুল্মে, পল্লবে ও পুষ্পগুচ্ছে। দিনের পড়ন্ত বেলায় এই স্থানটিতে এসে অবকাশ যাপন ওর একটি প্রিয় ব্যসন। অবশ্য দিবাভাগের চার প্রহরের সামান্য সময়ই ওর জীবন ধারণের জন্যে ব্যয় হয় বাকিটুকু অবকাশ এবং তা অফুরন্ত।

সহসা ওর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রখর হয়ে উঠল। সানুদেশে ইতস্ততঃ ছড়ানো গাছপালার নিচে এবং উন্মুক্ত আকাশলে একটা চলমান শরীর ক্ষণে প্রদীপ্ত, ক্ষণে ছায়াময় হয়ে এগিয়ে আসছে। একটা চলচ্ছবি যেন। ওর হাতে তীরধনুক। চঞ্চল চোখ দেখছে ইতিউতি। চারপাশের প্রকৃতির মতোই স্বচ্ছন্দ-সহজ। সংক্ষিপ্ত বস্ত্রখন্ড ও ঊর্ধাঙ্গের কাঁচুলি ছাড়া আর কোনো বেশবাসের উপকরণ নেই। কানে বনপুষ্পের কুন্ডল, কবরীতে বনফুলের সাজ। মৃগয়ায় বেরিয়েছে এই অরণ্যকন্যা, তারই মধ্যে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে মোহিনী সাজে। এটাই নারীর স্বভাবধর্ম। একটু এগিয়ে আসতে মনে হলো তার আদলে কোন মূর্তি রচনা করলে রাজ-ভাস্করও ধন্য হবে। বস্তুত এই বনবালাবে যেন মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য থেকে খসিয়ে আনা হয়েছে। তার দেহবর্ণ প্রস্তরকৃষ্ণ নয়, অরণ্যলতার মতো উজ্জ্বল শ্যাম।

শিলাসনে বসা মানুষটি আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোধ হয় অকারণ। কিংবা কারণ আছে যা সে নিজেই জানে না।

নারী যুবতী। ক্রমশ কাছে এল সে। কিছুটা ব্যবধানে সহসা তার গতি স্তব্ধ হল। নারীসুলভ সাধারণ কৌতূহলে তাকাল সে মানুষটার দিকে। এক মুহূর্ত বিস্ময়-কৌতুক মেশানো নয়নে চেয়ে রইল। তারপর ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসি;

কিছু বলা প্রয়োজন। সেটাই শোভন। মানুষটি তাই বলল, —মিলল শিকার?

মেলেনি। যুবতীর হাত শূন্য। তা যে চোখে পড়েনি মানুষটির তা নয়। নিতান্তই

সৌজন্যমূলক প্রশ্ন। এক সারি দাঁতের ঝিলিক ফুটে উঠল যুবতীর সুশ্যাম আননের পটভূমিতে।

বলল,—পাখিগুলো দুষ্টু। খুব ফাঁকি দিয়েছে আজ। ঘেরাঘুরিই সার।

—পাখি মারতে তোমার ভাল লাগে?

—খুব। কেন, তোর লাগে না? বিচিত্র ভঙ্গিতে গ্রীবা হেলাল যুবতী।

—না, আমার কষ্ট হয়। জীবহত্যা খারাপ কাজ।

—ইর্‌রে। শীৎকারের মতো শোনাল যুবতীর কণ্ঠ। বলল,—এমন কথা কখনও তো শুনিনি। শিকার খেলায় খুব মজা, বুঝলি রে। তুই একদিন আমার সঙ্গে শিকার খেলতে যাবি?

—না। আমি তো ভালরকম তীরধনুকই ধরতে জানি না।

—সে আমি শিখিয়ে দোব।

—আমি শিখব না!

—শিখতে দোষ কি! পাখি না হয় না-ই মারলি। তুই অন্যরকম মরদ আছিস। আমাদের এখানকার মরদের মতো নয়। তোকে নিয়ে তারা হাসাহাসি করে।

—আমার মধ্যে হাসির কি আছে?

যুবতী বলে, —তুই নিজের মনে গান গাস, বাঁশি বাজাস, একা একা চুপ করে বসে থাকিস, মেয়েদের দিকে তাকাস না, —এগুলো কি পুরুষের কাজ? তুই একটা খ্যাপা-পাগল আছিস। তোকে অন্যরকম করে গড়েছে মারাং বোঙা।

মারাং বোঙা অর্থাৎ সূর্যদেবতা। এখানকার আরণ্যকদের প্রধান দেবতা। এমন কঠিন অভিযোগেও পুরুষটির মুখের হাসি ম্লান হয় না। বরং হাসতে হাসতে বলে, —তাই বুঝি! ঠিকই বলেছে। আমি একটু অন্যরকম। আচ্ছা বেশ, শিখব আমি তীর ধনুকের বিদ্যা। ঠিকই বলেছ, শিখতে কোনো দোষ নেই।

—শিখতে গেলে এ জায়গাটা খুব ভাল। এখানেই আসবি তুই।

—আমি তো প্রায়ই আসি। কিন্তু আমার তো কোনো তীরধনুক নেই।

—সে আমি আনব তোর জন্যে। এরকম সূয্যিডোবা বেলায় আমি আসব।

—বেশ।

একটা ঠোঁটটেপা হাসি উপহার দিয়ে স্বচ্ছন্দসঞ্চারী কাঠবেড়ালির মতো যুবতীটি পাহাড়ের সোপান বেয়ে নেমে যায়। পাহাড়ের নিচে একটি জনপদ, ওদের বাড়ি। স্থানীয় এক সর্দারের কন্যা, নাম ঝোরা। অর্থাৎ ঝরনা বা জলপ্রপাত। সেইরকমই উচ্ছল ও বেগবতী ওই যুবতী।

সানুদেশের উচ্চাবচ ভূমিতে এরকম মাঝেমাঝেই দেখা হয় ওদের। কখনও সামান্য

দৃষ্টি বিনিময়, কখনও দুটি একটি কথা। আজকের মতো এত কথা কোনোদিন হয়নি। মানুষটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হয়তো অকারণ। কিংবা মনের গভীরে কোনো কারণ আছে যা সে টের পায়নি।

ঝোরা চলে যাবাব পর দীর্ঘক্ষণ সে শিলাসনে বসে থাকে ধীব স্তব্ধ। তাব সংস্কারহীন দীর্ঘ চুল উড়তে থাকে আবণ্যবাতাসে। অযত্নে বেড়ে-ওঠা শ্মশ্রুগুম্ফে চিক্‌চিক্ করে জাফরানি বোদ। মসৃণ সরল কপাল থেকে থেকে রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভাবনা-তরঙ্গিত মনেব চিত্রকল্প হয়ে ওঠে সমগ্র মুখমণ্ডল। একদা সে সুগৌর ছিল। এখন যত্নহীন জীবনযাপনে কিছুটা আতাম্র। বয়স বোঝা কঠিন। তবে যুবক। একটু পরিণত বযসের যুবক। দৃষ্টিনন্দন আকৃতি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তীক্ষ্ণ গঠন ও দৈহিক কাঠামোয় উঁচু বংশেব ছাপ স্পষ্ট। চাপল্যবর্জিত অথচ প্রসন্ন ভাবভঙ্গি। একটু বা গম্ভীর। কোনো নারীর যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু এই পুরুষ।

চেহারাতেই বোঝা যায় এই অরণ্যরাজ্যের সে কেউ নয়। এটা কৃষ্ণকাযদের রাজ্য। এখানে সে আগন্তুক। একদিন বেরিয়ে পড়েছিল ঘব থেকে। ঘুবতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ে। জায়গাটি ভাল লেগে যায়। তার মিষ্ট-ভদ্র আচরণে এখানকাব মানুষ তাকে গ্রহণ করেছে। আছে সে পাহাড়তলীতে কুটির বেঁধে। জনপদবাসীরাই গড়ে দিয়েছে কুটিব। বনের ফল, ঝরনার জল তার খাদ্যপানীয়। পল্লীর লোকেরা অযাচিতভাবে কেউ দিয়ে যায় খাদ্যশস্য, কেউ দুধ, কেউ মধু। মূল্য কেউ নেয না, দেবার মতো সঙ্গতিও নেই তার। বস্তুত সে এখন কপর্দকশূন্য।

মানুষটিব গুণপনার মধ্যে যা আছে তা হল তার মিষ্ট ব্যবহার, বাঁশি বাজানোর ক্ষমতা আর তার চমৎকার গানের গলা। তার গান বুকের মধ্যে দাগ রেখে যায়। এমন অনাবিল অন্তরের মানুষকে কারো আপন করে নিতে দেরি হয় না। তবু কোথায় যেন একটা অলঙ্ঘ্য বাধা রয়ে গেছে। মানুষটি সবারই আপন, অথচ সবার থেকে দূরে। তার পরিচয়ও কেউ জানে না। জানতে চাইলে এক টুকরো হাসির উপহারে সে নিজেকে আড়াল করে। সবাই তাকে ডাকে 'পরদেশী' বলে। তাতে তার অবশ্য আপত্তি নেই।

একদা সে ছিল কাজের জগতে বন্দী। কাজের যেন শেষ ছিল না। তার রীতি-চরিত্রও ভিন্ন ভিন্ন। তার শিক্ষণীয় বিষয়সূচীতে কত বিষয় যে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখন সেই কাজের শেকল গেছে খুলে। অফুরান ছুটিতে ডুবে আছে সে। কখনও সে সারা দিনমান ঘুরে বেড়ায়, কখনও কুটিরে শুয়ে শুয়ে প্রহরের পর প্রহর ভাবনার জাল বুনে চলে। কখনও বা পর্বতসানুর নির্দিষ্ট শিলাসনটিতে বসে থাকে চুপচাপ; তবে যেখানেই থাকুক, সন্ধে ঘনাবার আগেই ফিরে আসে কুটিরে। তার ক্লান্ত শয়নে

কখনও উঁকি মেরে যায় বিগত জীবন, কখনও ঝোরার মুখ। শ্যামাভ প্রস্তরের সেই বিগ্রহ কিছুটা হয়তো অন্যমনস্ক করে দেয় তাকে। সেই কল্লোলিত দেহকান্তি যেন তার মনের পটে ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর রেখে যেতে চায়। এক দুর্বোধ্য কষ্ট দীর্ণ করতে থাকে মানুষটিকে।

।। দুই ।।

আলতো আঙুলের ছোঁয়ায় চমকে মুখ ফেরায় পরদেশী। ঝোরা। এত নিঃশব্দ চরণে এসেছে যে বিন্দুমাত্র টের পায়নি। আজ তার সঙ্গে একজোড়া ধনুক। একটা হাতে, অন্যটা কাঁধে। রীতিমতো রণসাজ।

—চল, আজ তোকে তীর ছুঁড়তে শেখাব। বলে সে।

পরদেশী বিপন্ন মুখে বলে, —ওতে আমার মন নেই! তার চেয়ে বাঁশি বাজাই, তুমি শোন।

—এসব কি পুরুষ মানুষের কাজ? আর এরকম নরম নরম চেহারা পুরুষকে মানায়? পুরুষমানুষ হবে শাল-সেগুনের মতো শক্ত। তবে না পুরুষ!

পরদেশীর ক্ষীণ প্রতিরোধ টেকে না। উঠতেই হয়। কিছু দূরে একটা মহুয়া গাছ। সেটাকে চাঁদমারি করে ঝোরা তীরন্দাজি শেখাতে শুরু করে। তার নিষ্ঠা দেখে অস্ত্রগুরু দ্রোণের কথা মনে পড়ে যায় পরদেশীর। কিন্তু শিক্ষাদাত্রীর নিষ্ঠা যতখানি শিষ্যের ততখানি নেই।

ঝোরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, —তুই ফাঁকি দিচ্ছিস পরদেশী।

পরদেশী হাসে, —আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

—হতেই হবে। নাহলে আমি ছাড়ব না।

নির্জন পর্বতসানুতে অস্ত্রবিদ্যার পাঠ দান চলে। পরদেশীর ব্যর্থতায় মাঝে মাঝে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ঝোরা। তীব্র-তীক্ষ্ণ তার কথার দংশন। ধারাল তীরের মতোই তা বিদ্ধ করে পরদেশীকে। আহত পুরুষটি তখন হয়ে ওঠে একলক্ষ্য নিষাদ। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় গুরুর সমস্ত নৈপুণ্য শিষ্য চুম্বকের মতো টেনে নিয়েছে। ছুটন্ত শৃগাল পর্যন্ত তার অব্যর্থ শরসন্ধানে বিদ্ধ হয়। ঝোরা অবাক হয়ে বলে, —আশ্চর্য! বাপের কাছে মাসের পর মাস ধরে যা শিখেছি কদিনেই তুই তা শিখে ফেললি!

পরদেশী বলে, —এমন তো হবার কথা নয়। কি জানি কি করে শিখে গেলাম!

—শুধু তীরের বিদ্যে নয়, আরো অনেক কিছু শিখতে হবে।

—কি হবে শিখে? কি লাভ?

—পুরুষ মানুষের এসব শিখতে হয়। না, এরকম নরম শরীর চলবে না। শরীরটা শক্ত করতে হবে। সেগুন গাছের গোড়ার মতো শক্ত।

—সে আবার কিভাবে হবে? পরদেশী একটু অবাকই হয়।

—আমরা খরগোস ধরার খেলা খেলব।

—সে আবার কিরকম?

—বুনো খরগোস খুব দৌড়তে পারে। আমরা খরগোসকে তাড়া করব। ধরা যাবে না। কিন্তু তাড়া করতে করতে আমরা নাজেহাল করে তুলব। আমরাও নাজেহাল হব। এরকম কিছুদিন খরগোস ধরার খেলা খেললেই শরীর হয়ে উঠবে পাথরের মতো কঠিন। এ খেলায় খুব মজা। ভাল লাগবে।

হাস্যকর খেলা। তবু খেলতেই হয়। ঝোরার ইচ্ছের লাগামে এমনভাবে সে বাঁধা পড়েছে যে তার নিজরে ইচ্ছের কোনো জোর নেই। জোর খাটাতেও সে যেন চায় না। হয়তো ভাবে—নারীর ইচ্ছের মূল্য দেওয়াই ভদ্র পুরুষের কাজ। আসলে গোটা ব্যাপারটাকেই সে একটা কৌতুকের খেলা বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু খেলাটা কঠিন শ্রমের। পরদেশী হাঁফিয়ে ওঠে। অনভ্যস্ত শ্রমে সর্বাঙ্গে ব্যথা ধরে যায়। কিন্তু ঝোরার কঠোর আদেশ অগ্রাহ্য করে সাধ্য কি তার! খেলার পর তার ব্যথার্ত শরীরে সে বন্য ওষধিলতার রস লেপন করে। কোমল পরিচর্যায় তার ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করে। নারীহস্তের সেই স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ওষধিলতার চেয়েও এক ঝাঁঝালো মাদকরস তার অন্তরে সঞ্চারিত করে। পরদেশী তা কি টের পায়! সে কেবল জানে অতনুদেব।

দিনে দিনে বদলে যায় পরদেশীর দেহাকৃতি। কুটিরে আয়না থাকলে বুঝতে পারত তার মুখাকৃতি, শারীরিক ভঙ্গিমা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় সব মেদ ঝরে সে হয়ে উঠেছে এক দুর্মদ পুরুষ। আগে ছিল পেলব, নারীশোভন। এখন সে বীরাঙ্গনারও কাম্য।

এরপর হঠাৎই একদিন ঝোরার আসা বন্ধ হয়ে যায়। মাস চলে যায়, ঝোরার দেখা মেলে না। পরদেশী ভাবে—ঝোরা বন্য নারী, এদের মন বোঝা ভার। হয়তো তাকে নিয়ে দু'চারদিন মেতে ওঠার খেয়ালিপনা এসেছিল। সেটা কেটে গেছে।

।। তিন ।।

পান্নাগড় রাজ্যের কুমার রত্নসেন বেশ ছিল তার পুঁথিপত্রের জগৎ নিয়ে। রাজার সে জ্যেষ্ঠসন্তান, সে হিসাবে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী। কিন্তু না আছে তার রাজা হবার লোভ, না রাজ্যজয়ে আগ্রহ, না শস্ত্রবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ, না নারী ও সুরার প্রতি আসক্তি। কেবল ঝোঁক তার শাস্ত্রের দিকে। তার পাঠকক্ষটি নানা আকারের পুঁথির জাদুঘর যেন। অশ্বারোহণের চেয়ে ব্যাকরণে তার পটুতা বেশি। দেশবিহারের চেয়েও প্রিয় ঘরের কোণ, রূপসী নারীর চেয়েও প্রিয় তুলিকলম। সোমরস অপেক্ষা কাব্যরস। বীরদের কীর্তিগাথা অপেক্ষা তার কাছে অধিক আকর্ষণীয় জৈমিনি-পতঞ্জলি-ভবভূতি।

অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় সে আরাম পায় না। তূরী-ভেরীর নাদ অপেক্ষা ভাল লাগে বংশীধ্বনি। রত্নসেন বীর নয়, শিল্পী। এমন যুবরাজকে নিয়ে মহারাজ জয়সেনের ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক এবং তিনি ভাবিত।

রত্নসেনের স্বভাবে যে নারী-শীতলতার একটা দিক আছে সেটা প্রাসাদের কারো অজানা নয়। বয়সের প্রশ্নে ব্যাপারটা কিছুটা অস্বাভাবিক অবশ্যই। অবশ্য এর একটা কারণও আছে। নিতান্ত সাবালক বয়সেই সে মাকে হারায়। বিমাতাদের সস্নেহ ক্রোড়ও সে পায়নি। বেড়ে উঠেছে ধাত্রীমাতার কোলে। দুর্ভাগ্যবশত তার স্বভাবটি ছিল খুবই কর্কশ। ধাইমার স্নেহচ্ছায়া পেলে হয়তো সে অন্যরকম হত। কিন্তু তা ঘটেনি। বাইরে প্রশ্রয় না পেয়ে সে পুঁথির জগতে মনের খোরাক খুঁজে ফিরেছে। হয়ে উঠেছে আত্মমগ্ন, গম্ভীর স্বল্পবাক্‌। বৈমাত্রেয় ভগিনীরাও এই গম্ভীর স্বভাবের অগ্রজটিকে এড়িয়ে চলেছে। পিতার নৈকট্যও সে পায়নি তেমন, কারণ রাজকার্যে তিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত।

মহারাজ জয়সেন বৃদ্ধ না হলেও প্রৌঢ়ত্ব স্পর্শ করেছেন। ভেবেছিলেন জ্যেষ্ঠকুমারের হাতে সিংহাসন তুলে দিয়ে রাজকার্য থেকে অবসর নেবেন। কিন্তু সে বাসনা বুঝি মেটে না। যুবরাজ সম্পর্কে যা তাঁর কানে এসেছে আদৌ আশাজনক নয়। যে রাজ্যকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন তার ভার অযোগ্যের হাতে সমর্পণ করতে তিনি পারেন না। তা হোক না সে তাঁর আত্মজ, তাঁর জ্যেষ্ঠ তনয়।

পুত্রকে ডেকে তিনি বলেছেন, —জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সিংহাসনের অধিকার তোমারই। কিন্তু একজন কবি, দার্শনিক অথবা বৈয়াকরণের হাতে আমি সিংহাসন তুলে দিতে পারি না। রাজা হতে গেলে অবশ্যই কিছু শাস্ত্রজ্ঞান থাকা দরকার। তবে শাস্ত্রজ্ঞান এবং রাজ্যচালনার রীতিনীতি জানাও কিছু কম প্রয়োজনীয় নয়। এবার থেকে এসব দিকে তোমাকে মনোযোগী হতে হবে।

রত্নসেন মৃদুকণ্ঠে বলেছে, —সিংহাসনে আমার কোনো লোভ নেই। পুঁথিপত্র নিয়ে বেশ আছি।

—রাজপুত্রের পক্ষে এ কোনো গৌরবের কথা নয়। শুনেছি মৃগয়া, প্রমোদযাত্রা, নর্তকীদের নাচগানে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। অত অনাগ্রহ কিসের?

—এসবে আমি আনন্দ পাই না।

—এও কিছুটা অস্বাভাবিক। একজন রাজকুমারের জীবন আর সাধারণ নাগরিকের জীবনে কিছু প্রভেদ আছে। এটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শোন কুমার, আমি তোমার বিবাহের কথা চিন্তা করছি। অবশ্য আগে রাজ্যাভিষেক, তারপর বিবাহ। নানা রাজ্য থেকে সম্বন্ধ এসেছে। রাজারা তাঁদের কন্যাদের চিত্র পাঠিয়েছেন। আমার আদেশ সেগুলো দেখে তুমি পাত্রী নির্বাচন করবে।

—বিবাহে আমার কোনো আগ্রহ নেই পিতা।

—কোনো রাজপুত্রের পক্ষে বিবাহে অনাসক্তি হাস্যকর। আর যৌবনধর্ম পালন জীবধর্মের মধ্যেই পড়ে, একথা ভুলে যেও না। তুমি সন্ন্যাসী নও, গৃহী, —এটাও মনে রেখো। যাই হোক, চিত্রগুলো দেখে তুমি ভাবী বধূ নির্বাচন করবে—এই আমার আদেশ।

পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারল না পুত্র। চিত্র এল। সেগুলি দেখল রত্নসেন। তারপর মহারাজকে জানাল—কোনো চিত্রই তার আকর্ষণ জাগাতে পারেনি।

মহারাজ শুধোলেন, —এর কারণ? রাজকুমারীদের কেউ কি সুরূপা নয়? সুতনুকা নয়?

—বরং তার বিপরীত। সকলকেই আপনারা সুরূপা সুতনুকা বলবেন। কিন্তু সবাইকে আমার মনে হয়েছে জীবন্ত পুতুল। এরা মহার্ঘ অলঙ্কার, বস্ত্র আর প্রসাধন ছাড়া কিছু বোঝে বলে মনে হয় না।

—নারীর পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। তোমার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে কুমার।

মৃদুস্বরে অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে রত্নসেন বলেছে, —রাজ্য, নারী, বিবাহবন্ধন—কিছুই আমি চাই না পিতা।

পুত্রের অবাধ্যতায় বিরক্ত হলেও মহারাজ জয়সেন কোমল কণ্ঠেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, —তোমাকে যেসব চিত্র দেখানো হয়েছে তার মধ্যে একটি হল সোমপুর রাজ্যের রাজা বিক্রমজিতের কন্যা শ্যামশ্রীর। বিক্রমজিৎ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অযাচিতভাবে রাজকুমারীর সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এ আমাদের আশাতীত সৌভাগ্য। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার অর্থ সোমপুরকে শত্রুরাজ্য করে তোলা। অপমানিত বিক্রমজিৎ যদি পান্নাগড় আক্রমণ করেন তাহলে আমরা বিপদগ্রস্ত হবো। সেক্ষেত্রে পান্নাগড়ের ক্ষতির দায় বর্তাবে তোমার ওপর। শোন রত্নসেন, এই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত জানাবার দরকার নেই। ক'দিন ভেবে দেখার জন্যে সময় দিলাম।

—সপ্তাহ, মাস, বর্ষ—কোন কিছুতেই আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না পিতা। যা আজ বলেছি তা বর্ষ পরেও বলব। রত্নসেনের কণ্ঠ অবিচলিত।

এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় জয়সেনের। মুখ হয়ে ওঠে ক্রোধরক্তিম। কঠোর কণ্ঠে বলেন, —তুমি রাজবংশে বেমানান। রাজপ্রাসাদে বাস করারও তুমি অযোগ্য।

ভিতরের এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখখানা বিবর্ণ হয় রত্নসেনের। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকে। তারপর ধীর স্বরে বলে, —আপনি ঠিকই বলেছেন পিতা। আমি রাজপ্রাসাদে থাকার যোগ্য নই।

এর পরের প্রভাতেই নিখোঁজ হয়ে যায় রত্নসেন। নিত্য প্রভাতের মতো সেদিন

সকালেও অচার্য বিষ্ণুভদ্র কুমারের পাঠ-প্রকোষ্ঠে এসেছিলেন। কথা ছিল পাতঞ্জল ভাষ্যের নতুন একটি অধ্যায় বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু অনেক বিলম্ব করেও কুমারের দেখা পেলেন না। ক্রমশঃ বার্তা রটে গেল যে কুমার রত্নসেন গৃহত্যাগ করেছেন।

পান্নাগড় থেকে অনেক দূরে এক নির্জন পাহাড়তলীর কুটিরে বসে রত্নসেনের কথা ভাবতে ভাবতে পরদেশীর ঠোঁটে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে।

।। চার ।।

বনপাহাড়ী দেশটিতে ঋতুপতি বসন্ত সমাগত। চৈত্রদিন বহন করে এনেছে নতুন পল্লব, সুগন্ধ পুষ্প, দক্ষিণ সমীর, পিকরব, রঙের প্লাবন। অশোক, পলাশ ও রক্তকাঞ্চনের শোভায় অরণ্য যেন চেলাঞ্চলে শোভাময়ী নববধূ। এমন দিনে পরদেশী বড়ই আনমনা। বনতলে, বনশীর্ষে, পাহাড়তলী ও পাহাড়চূড়ায়—যেখানে যায় পুষ্পিত ব্রততী ও শাখীসমূহ তাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু এমন দিনে তার মন বোধহয় অন্য এক অভ্যর্থনা চাইছিল।

তার অন্তরের ভাষা কি পৌঁছেছিল কারো কাছে? কে জানে! কিন্তু এক প্রভাতে ঝোরা এল তার কুটিরদ্বারে। অনেকদিন পরে। তার শরীরটা কিছু কৃশ হয়েছে। মুখখানি আনত। যেন দুঃখভারে ম্লান। বনের বাসন্তী ঐশ্বর্যের সে যেন বিপ্রতীপ বিগ্রহ। মাথায় নেই পুষ্পসজ্জা। বাহু, মণিবন্ধ ও গ্রীবা নিরাভরণ। ঝোরা যেন একটি সজীব রিক্ততা। তার হাতে একটি ক্ষুদ্র মৃৎকলস। কিছু যেন বহন করে এনেছে। পরদেশীকে দেখে সে ম্লান হাসে। তপঃকৃশা যোগিনীর মতো দেখায় তাকে।

পরদেশী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, —তোমার কি অসুখ করেছিল? জানতে পারিনি তো!

ঝোরা ম্লান হাসে, —আমরা জংলী মেয়ে। আমাদের মন খারাপই বা কি, শরীর খারাপই বা কি! পাখি আর খরগোস শিকার, মৌচাক ভাঙা, কাঠ কাটা—এসব করতে করতেই তো দিন যায়। শরীর খারাপ হবার সময় কোথায়? তবে মনটা কেন যেন মাঝে মাঝে অন্যরকম হয়ে যায়। মন খারাপ নিয়ে পড়ে থাকব তারো তো সময় নেই। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছা করল তাই এলাম। তুই কেমন আছিস রে পরদেশী? ভাল আছিস?

উত্তর দিতে পরদেশী একটু সময় নেয়। তারপর বলে, —কি জানি ভাল আছি কিনা। আজকাল নিজেকে ঠিক বুঝতে পারি না।

—এ আবার কি কথা! তোরা, ভব্যসভ্য আদমিরা, অন্যরকম। কথাবার্তার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। আচ্ছা পরদেশী, তুই কি আমাকে ভয় পাস?

—ভয়! কেন?

—কোনো কোনো পুরুষ মেয়েদের ভয় পায়।

—তাই আবার হয় নাকি?

—হয়। পান্নাগড়ের রাজার ব্যাটা মেয়েদের ভয় পায়। সেই ভয়েই সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

পরদেশী চমকে উঠে বলে,—তুমি তার কথা জানলে কি করে?

—বাপ বলেছে। আমার বাপ কাঠ মধু পাতা বিক্রি করতে পান্নাগড়ে যায়। কদিন আগে গিয়েছিল। ওই রাজার ব্যাটার গল্প বলতে বলতে বাপ যত হাসে শুনতে শুনতে আমিও তত হাসি। রাজামশাই ব্যাটার বিয়া দিতে চেয়েছিল। বিয়ার ভয়ে ব্যাটা পালিয়েছে। মানুষটা পাগল।

এক চিলতে হাসি তির্‌তির করে কাঁপে পরদেশীর ঠোঁটে। বলে, —আচ্ছা, রাজপুত্তুর যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাইত তুমি কি করতে?

ঝোরা মুখে কাপড় গুঁজে হাসে—ভালই তো। কত বাদ্যিবাজনা, আলো, গয়নাগাটি, দাসদাসী, —কত সুখ!

—আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

ঝোরা সহসা পূর্ণায়ত দৃষ্টি মেলে ধরে পরদেশীর মুখের ওপর। চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে,—ঝমরু সর্দারের মেয়েকে এখানের অনেকেই চায়। পাশের গাঁয়ের লছমন সর্দারের ব্যাটা হিম্মতের অনেক দিন থেকেই আমার ওপর নজর। সা-জোয়ান চেহারা। বাঘের সঙ্গে লড়তে পারে এত তাগত। আমার বাপকে বলেছে বিয়া করতে চায় আমাকে। তুই কি লড়তে পারবি তার সঙ্গে?

—লড়াইয়ের কথা আসছে কেন?

—আমাদের দেশে নিয়ম হল এক মেয়েকে দু'জনে বিয়া করতে চাইলে তাদের মধ্যে লড়াই হবে। তাতে একজনের মরণও হতে পারে। যে জিতবে মেয়ে তার। কিন্তু হিম্মত সর্দারের সঙ্গে তুই এঁটে উঠতে পারবি কি? সে মানুষ নয়, দত্যি। তুই মারা পড়বি পরদেশী।

—আমি মারা গেলে তোমার কি ক্ষতি?

—সে তুই বুঝবি না পরদেশী।

—কিন্তু আমার কথার জবাব তো পেলাম না।

—কি কথা?

—আমাকে তুমি বিয়ে করতে চাও কিনা।

—সে কথা এখন থাক। শোন, এই ভাঁড়ে মহুয়াফুলের মধু আছে খেও। জঙ্গ ল থেকে নিজে যোগাড় করেছি। কাল পুণ্যিমে, সাঁঝবেলাতেই জ্যোছনা উঠবে।

আমি আসব। দুয়োর খুলে রেখো।

এই বলে চলে যায় ঝোরা। বনপথের আঁকেবাঁকে আলোছায়ার আলিম্পনে থেকে থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার শরীর। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

পূর্ণিমার চাঁদ যথারীতিই ওঠে পরের সন্ধ্যায়। কুঠিরদ্বারে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় বসে থাকে পরদেশী। বনভূমি কুহরিত হয়ে ওঠে কোকিলের গানে। অরণ্যজ পুষ্পগন্ধে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে বনভূমি। মলয়পবনে মাতাল হয়ে ওঠে বৃক্ষশাখা। চাঁদের অমিয়ধারা ঝরে পড়ে বনস্পতি থেকে তৃণাঙ্কুর—সর্বত্র। রাত্রি ক্রমে প্রবীণা হয়ে ওঠে। কিন্তু ঝোরার দেখা নেই। চাঁদ হেলে পড়ে একসময়। ঝোরা বোধহয় এল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুটিরে প্রবেশ করে পরদেশী। তার বুক ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

দুয়ার খোলাই থাকে। আগল দেয় না। দুয়ার খুলে রাখলে বিপদ হতে পারে। এই বনভূমিতে ভালুক নেকড়ে কিংবা শার্দূলের আভাব নেই। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা মনেই জাগে না পরদেশীর। সহসা সে যেন জীবনের প্রতি মমতাশূন্য হয়ে পড়েছে।

ঝোরা যখন এল না তখন বুঝতে হবে তার কাছে কোন এক হিম্মত সর্দারের দামই বেশি। পরদেশী সেইরকমই বুঝল। আর বুঝল নারী পুরুষের কাছে সব চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে পৌরুষ, তারপর অন্য কিছু। কিন্তু প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর চমকে ওঠে সে। তার বুকের উপর পড়ে আছে রক্তকাঞ্চনের একটি অম্লান মালিকা। কে রেখে গেল? ঝোরা নিশ্চয়ই। তার ঘুমের অসতর্কতায় সে নিঃশব্দ চরণে এসে রেখে গেছে তার আত্মসমর্পণের আভিজ্ঞান। পরদেশীর মনে হল কোনো পুরুষের নারীর কাছে রাখা জটিলতম জিজ্ঞাসার এমন মধুর উত্তর আর কেউ কখনো পায় নি। এক্ষেত্রে মহাকবি কালিদাসের নায়করাও ভাগ্যহীন। অন্যমনস্কভাবে পরদেশী যে কখন মালাটি নিজের গলায় পড়ে নিয়েছে তা সে খেয়ালও করল না।

।। পাঁচ ।।

সামান্য একটা পুষ্পমাল্যের এত যে দাম তা আগে জানা ছিল না পরদেশীর। মালাটিকে সে কতবার যে দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার ইয়ওা নেই। বারবার ঘ্রাণ নিল, বুকে জড়িয়ে ধরল। দেহের সঙ্গে মালাটিকে যেন সে মিশিয়ে দিতে চাইল। অথচ এর চেয়ে সুন্দর আর মহার্ঘ্য মালা তার কাছে নতুন কিছু নয়। একদা ফুল ছিল তার নিত্যদিনের বিনোদন। কিন্তু সে ছিল প্রয়োজনের অঙ্গ। আর এ মালায় আছে হৃদয়ের পরাগ। এ মালার দাম হিসেবের বাইরে।

বাইরে বলেই বাঁশি-বাজানো গান-গাওয়া মানুষটি একদিন সোজা চলে গেল ঝমরু সর্দারের কুটিরে। বলল, —তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই সর্দার।

ঝমরু সর্দার কারো হৃদয়তত্ত্ব বোঝার মানুষ নয়। অবাক হল, বিরক্তও হল। হো

হো করে হেসে বলল, —চাল নেই, চুলো নেই, তোর সঙ্গে ঝোরার বিয়ে? আমি গাঁয়ের সর্দার আছি না? একটা কথা তোকে শোন বলিরে পরদেশী। পাশের গাঁয়ের লছমন সর্দারের বিটা হিম্মত আমার মেয়েকে বিয়া করতে চায়। কথাবার্তাও এগিয়ে গেছে।

—তোমার মেয়ে তাতে রাজি?

যেন একটা আশ্চর্য কথা শুনেছে এমনি ভাবে সর্দার বলে,—পাগলের কথা শোন। বিয়ে দেবো আমি, মেয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার কি দাম? এ বিয়েতে হিম্মত অনেক কিছু দেবে। একশো টাকা, পাঁচবিঘা জমি, একজোড়া বলদ। আরো কত কি। আমাদের এখানকার নিয়ম হচ্ছে মেয়ে তরফকে এটা-ওটা দিতে হবে। ছেলে তরফে দেবার নিয়ম এখানে নেই। তা তুই এসব পাবি কোথা?

—যা চাইছ সব যদি দিই?

—তাতেও ঝামেলা আছে। সে তুই পারবি না।

—কি সেটা?

—লড়াইতে হিম্মতকে হারাতে হবে তোকে। সেটা সোজা কাজ নয়। সে একটা বুনো বরা। তাকে এঁটে ওঠার মতো ছোকরা এ দিগরে নাই।

—কিন্তু লড়াই করতে হবে কেন?

—সেটাই যে নিয়ম রে বাপ। বলি সেই তো আগে বিয়া করতে চেয়েছে, তাই তো! মেয়ের ওপর তার অধিকার আগে, তাই নয়? লড়াই ছাড়া ফয়সালা হবে কি করে? আমি বলি কি, তুই সরে দাঁড়া রে পরদেশী। প্রাণ গেলে আর ফেরে না!

—বেশ, আমি লড়াই-ই দেব। এই আমার শেষ কথা সর্দার। বলে পরদেশী।

সর্দার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এই বিদেশীটা পাগল নাকি?

লড়াইটা কিভাবে হবে, সশস্ত্র না নিরস্ত্র, এটা বেছে নেবার অধিকার প্রতিপক্ষের। অর্থাৎ পরদেশীর। ইচ্ছে করলে সে তীরন্দাজির প্রতিযোগিতায় নামতে পারত কিংবা দৌড়ের। এতে তার বাড়তি সুবিধে ছিল। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে সে বেছে নিল খালি হাতের লড়াই। নিরস্ত্র দ্বৈরথ।

লড়াইয়ের জন্যে ঘোষিত দিনটিতে জঙ্গলদুনিয়া যেন ভেঙে পড়ল রণস্থলে। নারীপুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবারই প্রবেশ অবাধ। সকলেই মজা দেখতে এসেছে। এক বাঁশি-বাজিয়ে আর গাইয়ে খ্যাপার সঙ্গে জংলী বাঘের লড়াই—মজার ব্যাপার বৈকি।

রঙ্গস্থলে প্রবেশ করল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন প্রবেশ করল আরণ্যক হিংস্রতা আর দুর্মদ পৌরুষের প্রতিমূর্তি হয়ে। তার চোখে খুনের নেশা। নেশার প্রবলতায় সে

অস্থির। অন্যজন স্থিরনিশ্চল, প্রতিজ্ঞাসংহত। চোখ দুটি নিরাবেগ, শান্ত। তার দৃষ্টি কেবল একবার ভিড়ের প্রতিটি মানুষকে ছুঁয়ে গেল। স্থিরনিবদ্ধ হল এক স্থানে এসে। ঝমরু সর্দারের পাশে ঝোরা দাঁড়িয়ে। তারই দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলকে। নির্নিমেষে। প্রস্তরমূর্তির মতো ধীরস্তব্ধ। ওর বুকের ভিতর কি কোনো ভয় কিংবা উৎকণ্ঠা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে? জানার উপায় নেই, কারণ বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই।

হয়তো একজন ছাড়া দর্শকদের আর সকলেই নিশ্চিত ছিল যে এই লড়াইয়ে হিম্মত সর্দারই জয়ের মালা পরবে। কৃষ্ণকায় কবাটবক্ষ হিম্মতের পাশে কিছুটা পলকা চেহারার গৌরবর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে কিঞ্চিৎ ম্লানই দেখাচ্ছিল। কিন্তু লড়াই শুরু হতেই বোঝা গেল লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের হিসেব আগে থেকে করা সহজ নয়। যোদ্ধাদের চেহারার ওপর জয়-পরাজয়ের বাজি ধরা যায় না। হিম্মতের মুষলের মতো বাহু, কণ্ঠে ক্রুদ্ধ রণ-আস্ফালন। পরদেশীর কণ্ঠ ভাষাহীন, সে মহাভুজও নয়। কেবল তার চোখে বিদ্যুতের দীপ্তি। ওঝা যে ক্ষিপ্রতায় বুনো সাপ ধরে তার অঙ্গ-সঞ্চালনে সেই ক্ষিপ্রতা। তার মনোযোগ গদাযোদ্ধার নয়, তীরন্দাজের। হ্যাঁ, সে একলক্ষ্য নিষাদ। মহাবলী হিম্মত ক্রুদ্ধ হস্তীর মতো বৃংহণ তুলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীটি তিলেকে সরে যায়। তার হাল্কা শরীর যেন বাতাসে ভাসছে। হয়তো লড়াইয়ের মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে পর্বতসানুতে খরগোসের পিছনে ছোটার দৃশ্য। এই মুহূর্তে সে সেই খরগোস। আত্মরক্ষার সেই আশ্চর্য কৌশল দেখতে দেখতে দর্শকরা চিত্রার্পিতবৎ।

হিম্মতের আস্ফালন কখন থেমে গেছে। টলছে তার আপাতমস্তক ঘর্মাক্ত শরীর। এই অবস্থাটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল পরদেশী। উর্ধ্বচারী শ্যেনপক্ষী যেমন শিকারের ওপর ছোঁ মারে তেমনি ক্ষিপ্রতায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নরশার্দূলটির ওপর। তারপর কি যে হল ভাল করে বোঝার আগেই সকলে দেখল হিম্মতের ভূলুণ্ঠিত শরীরের ওপর চেপে বসেছে পরদেশী।

বিচারকেরা তাকে জয়ী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ায়। মেঘ গর্জনের মতো মন্দ্রস্বরে বলে ওঠে, হে অরণ্যবাসিগণ, আমিই বিজয়ী। তোমাদের বনরাজ্যের আইন অনুসারে ঝমরু সর্দারের কন্যা আমারই প্রাপ্য।

সেই গম্ভীর নাদে সবাই চমকে ওঠে। চমকে ওঠে পরদেশী নিজেও। এরকম পৌরুষমন্ডিত স্বর যে তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে পারে এ তার ধারণার বাইরে।

—এ মেয়ে তোমার, তোমার। সমস্বর সমর্থন আসে চারদিক থেকে। বোঝা যায় সবাই খুশি। কেবল সর্দারকন্যা খুশি কিনা তা তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে না পরদেশী। তার স্তব্ধগম্ভীর মুখে আবেগের ছায়াপাতমাত্র ঘটেনি।

পরপ্রভাতের সূর্য যখন সবে উঠেছে, সোনার জরি ঝলকাচ্ছে গাছ-পালায়, গিরিপাদমূলের এক নিভৃত ঝরনায় ঊষাস্নান সেরে বরতনু এক নারী অঙ্গবাসে নিজেকে আবৃত করছে, পরদেশী এসে দাঁড়াল ঝরনাতলায়। সেই সুশ্যাম ভাস্কর্যের দিকে ক্ষণেক তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। পূর্ণ নয়নে নারীটিও চেয়ে রইল তার দিকে।

মৃদুস্বরে বলল,—একদিনেই কেমন যেন হয়ে গেছিল পরদেশী। হয়েছে কি তোর?

—আমি হেরে গেছি ঝোরা। তোমার কাছে। কাল সারারাত ঘুম ছিল না চোখে। বাঁশি বাজাবার চেষ্টা করলাম, বাঁশিতে সুর এল না। গান গাওয়ার চেষ্টা করলাম, গান ফুটল না। কোন্ মন্ত্রে তুমি আমাকে বশ করেছ জানি না।

ঝোরা কথা বলল না। হাসল কেবল। যে হাসি বিজয়িনী নারীরা চিরকাল হেসে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে বলল,—ঝরনাতলায় পুরুষ কেন? এ তো মেয়েদের জায়গা।

পরদেশী বলল,—আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি ঝোরা। কয়েকদিনের জন্যে ঘরে যেতে হবে। বধূবরণের আয়োজন করতে হবে তো!

পরদেশীকে চমকে দিয়ে ঝোরা নাগরিকসুলভ পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলে উঠল,—পান্নাগড়ের রাজপ্রাসাদে আমাকে কি মানাবে? মহারাজ. জয়সেন কি এক অরণ্যকন্যাকে বধূ হিসেবে মেনে নিতে চাইবেন?

—আমার পরিচয় তুমি জান? কিভাবে জানলে? পরদেশীর কণ্ঠে অপরিমাণ বিস্ময়।

—সে কথা এখন নয়। সময় আসেনি। কিন্তু আমার কথার উত্তর? আচ্ছা, আমাকে একটু জহুরির চোখ দিয়ে দেখ তো।

জহুরি-চোখেই দেখতে থাকে পরদেশী। গৌরবর্ণা বলা যেতে পারত। কিন্তু নবপল্লবের লাবণ্যেও কম শ্রীময়ী নয়। আশ্চর্য সুতনকা। যৌবন যেন কল্লোলিত হয়ে আছে দেহের উপকূলে। পরদেশী আস্তে আস্তে বলল, —কোনো রাজার ঘরেও তুমি অনাদরের পাত্রী নও।

।। ছয় ।।

পরবর্তী পূর্ণিমায় ঝমরু সর্দারের দীন কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াল বরযাত্রী-বাহিনী। বাহিনীই বটে। অন্তত একশোজন ঘোড়সওয়ার। বাদ্যিকার জন পঞ্চাশ। ঘোর রোলে বাজছে ঢোলডগর, বরাঙ্গে বহুমূল্য সাজ। তার কি জেল্লা, কি বাহার! সেই পোশাকে সোনা আর মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি। চেনা বর, তবু যেন অচেনা।

বাসরঘরের নিভৃতিতে ঝোরা বলল, —মহারাজ জয়সেন কি আমাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত?

প্রত্যুত্তবে একটি গজদন্তেব পেটিকা থেকে একটি বহুমূল্য বত্নহাব বেব কবে পবদেশী পবিযে দিল ঝোবাব গলায।

– কি এটা? শুধলো নববধূ।

—স্বযং মহাবাজ এটি বধূমাতাকে আশীর্বাদ হিসেবে পাঠিযেছেন। কোনো কথাই গোপন কবিনি, সব বলেছি তাঁকে। তোমাব ওপব তিনি খুবই তুষ্ট। তোমাব জন্যেই তো তিনি ফিবে পেলেন তাঁব পুত্রকে। তাঁব সিংহাসনেব উত্তবাধিকাবীকে। শোন, আব একটি অধিকাব তাঁব কাছ থেকে আমি চেযে নিযেছি। আমাদেব পবিবাবেব নিযম হল বাজবধূবা কোনোদিন পিতৃগৃহে আসতে পাববে না। তোমায মুখ চেযে এ নিযম তিনি ভাঙতে বাজি। এ তোমাব চিবনির্বাসন নয, আসাব পথ খোলা বইল। আমাকে যে নতুন কবে গডেছে তাব প্রতি এ মহাবাজেব অনুগ্রহ।

এই অবণ্যপল্লী থেকে পান্নাগড ছয ঘোডাব পথ। অর্থাৎ একটানা পান্নাগড যেতে হলে ছ'বাব ঘোডা বদলাতে হবে। এই দীর্ঘ পথে প্রান্তব, বনানী ও পাহাড ছাডা আব কিছু নেই। পবদিন যেতে যেতে বাত হল। পডল এক বিস্তীর্ণ বনানী। যুববাজেব নির্দেশে লোকলস্কব অনেকটা এগিযে বা পিছিযে। চতুর্দোলা আসছে পিছনে পিছনে। বত্নসেন ঝোবাকে তুলে নিযেছে নিজেব অশ্বে। সে তাব বাহুলতা দিযে জডিযে আছে বত্নসেনেব আযত পৃষ্ঠদেশ।

মুখ ফিবিযে বলল,—এবাব বল আমাব পবিচয তুমি পেলে কি কবে?

—তোমাব পটচিত্র দেখে। পান্নাগড থেকে এনেছিল বাবা। তোমাব সব কথা বলল। চিত্র দেখে চিনলাম তোমাকে। স্থিব কবলাম জয কবব তোমাকে। দেখতে চাইলাম পান্নাগডেব উদাসীন বাজকুমাব নাবীব মোহিনীমাযা অস্বীকাব কবে কিভাবে। শোন পুরুষ, নাবীকে তুচ্ছ কবাব ক্ষমতা কোনো পুরুষেবই নেই।

বত্নসেন হেসে বলল,—হেবে গিযে যে এত সুখ তা তো আমাব জানা ছিল না।

—ভাগ্যে পবে জানলে! তাই তো তোমাকে পেলাম। কিন্তু এখনও ভয আমাব গেল না। তুমি সেই আগেকাব বত্নসেন হযে যাবে না তো বাজপুবীতে গিযে? সেই পুঁথিপত্তব, সেই গানবাজনা নিযে মেতে উঠবে না তো?

বত্নসেন কুহকভবা গলায বলল, —আমি তোমাব পবদেশীই বযে যাব চিবকাল।

**আশাববী**

# অনিকেত

আজ সকাল থেকেই থমকে থমকে যাচ্ছে মেনকার গেরস্থালির কাজ। সাত ভোরে গা থেকে ঘুম ঝেড়ে ফেলে সেই যে হাত-পাগুলোকে সে খেলাতে শুরু করে তারা দম ফেলার ফুরসৎ পায় মাঝরাত্তিরের লাগোয়া। আজা সে যথারীতি ঘুম থেকে উঠেছিল রাত ফুরোবার আগেই। নতুন-গাঁ নামের এই চাষা-গাঁটার চারধারের গাছগাছালি, প্রান্তর, খোয়াইয়ের মতো জমি, উচ্চাবচ ডাঙা ভুঁই তখনও ভিজে ভিজে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। এই আঁধারঢাকা অলৌকিক পৃথিবী ক্রমশ তার চোখের সামনে চেনা দুনিয়া হয়ে উঠল। খেতখামার বাড়িঘর সোঁতা আলাদা হয়ে দেখা দিল সূয্যিঠাকুরের আলোর আর্শীবাদে। ওপারের বাঁধে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ কাজের তাড়নায় চলাচল শুরু করেছে, সেই দৃশ্যপটও নজরে ধরা দিল মেনকার। অন্যদিন এইসব দেখতে দেখতে মেনকাও মেহনতব্যস্ত জনমনিষ্যিদের একজন হয় যায়। কিন্তু আজ সবই ভিন্নরকম। কোথা থেকে রাজ্যের আলিস্যি এসে তার আঁটোসাটো গতরকে পেয়ে বসেছে। হাত যেন চলে না, পা দুটি নড়ে না। চলতে চলতে হঠাৎ চুপ হয়ে যায় খাটাখাটুনির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো। মেনকা আজ বড়ই বিমনা।

খোপের ভেতর হাঁসগুলো উসখুস করছে। ডাঙা নয়, এই তরুণ প্রভাতে ওরা ঘাস শ্যাওলা ও জলজ গুল্মের গন্ধভরা জলের গন্ধ চায়। গোয়ালে গরুগুলো অস্থির পদদাপে মেনকাকে ডাকাডাকি করছে। নিত্যদিন সকালে ওরা ঘাস জমিতে দাঁড়িয়ে শিশির নরম তৃণের স্বাদ নেয়, রোদস্নান করে। মেনকার কোমল শুশ্রূষা হাঁস ও গরুগুলোর প্রতি সকালের পাওনা। মেনকার হৃদয় কঠিন নয়। ওদের রীতি মাফিক ব্যবস্থা করে সে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল। উঠোনের পশ্চিম কিনারায় মাথা উঁচু রাংচিতের বেড়া। বেড়ার গা থেকে মাটির গড়ান নেমে লালমাটির নাবালে মিশে গেছে। ওখানে তরি-ফসল ফলে। লাউ কুমড়ো আলু মটর কপি, ডগমগে ঝাড়ালো রাংচিতের ঘন বিন্যাসের ফাঁক দিয়ে মেনকা জমির দিকে তাকাল। মাটি কোপাচ্ছে

মানুষটা। এক মুখ দাড়ি। এলোমেলো লম্বাচুল। মুখখানা একটু চৌকো। চওড়া ধরণের কপাল। রঙ একসময় হয়তো ফর্সা ঘেঁষেই ছিল, এখন তামাটে। রোগাটে কিন্তু হাড়মোটা শরীর। অনেক পথ পেরিয়ে আসা শ্রান্ত মুসাফিরের মতো লাগে মানুষটাকে। মলিন তামাটে শরীরটায় ঘামের দরিয়া। ওর কোদল শূন্যে উঠছে, বাতাস কেটে নেমে আসছে অবিরাম। কাজে ফাঁকি নেই। মেনকাদের নতুন মাহিন্দার।

জোরাল শ্বাসের আওয়াজটা এত দূর থেকেও কানে আসে। হাঁপাচ্ছে। একবার কোদাল ফেলে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কপালের ঘাম মুছল। বুকখানা হাপর হেন হাঁপাচ্ছে। বোঝা যায় মানুষটা ইতিমধ্যে ক্লান্ত। অথচ সিকি কাঠা জমিও গেল দু'ঘন্টায় হাসিল করতে পারেনি। মেনকাদের এই নতুন মানুষটি কাজে তেমন দড় নয়। পাটের গাঁট বাঁধতে, ধান আছড়াতে, খড়ের গাদি দিতে, কোন কাজেই এলেম নেই। নৌকো বাইতেও পারে না। অথচ ও সবাইকে খুশি করতে চায়, থাকতে চায় সর্বক্ষণ কাজে লেগে। আবার ও হাতের মুঠিতে বাগিয়ে ধরল কোদালের মূঠ। মেনকাদের আবাদে মাস তিনেক হল লোকটা কাজে লেগেছে।

মেনকা ভারি কোমল নজরে, দেখছিল মানুষটিকে। মানুষটার চেহারা এমন কিছু আহামরি নয়। কিন্তু কেন যেন মনে হয় ও মাহিন্দারটারদের নয় কেউ। ওর জাত আলাদা, ও অন্যরকম। ও যেন অন্য কিছু হতে পৃথিবীতে এসেছিল। এখন ঠিকানা হারিয়ে এই গাঁ-দিগরের কুম্ভীপাকে ঘুরে মরছে। শুধু আজ নয়, গেল তিন মাস ধরে কথাগুলো খুব আবছাভাবে, অ-ধরা ভঙ্গিতে মেনকাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবে আজ সেটার দাপট একটু বেশি। মেনকার চোয়াল থেকে থেকে কঠিন হয়ে উঠেছে, দাঁতে দাঁতে যেন ঘষটানি লাগছে। ভেতরে ভেতরে ও যেন কঠিন শপথ নেবার চেষ্টা করছে।

তিন মাস আগের সেই সন্ধেটা এখনও পরিষ্কার মনে আছে মেনকার। সময়টা তখন ফাল্গুনের শেষ। সারা দিনের তাতের পর বিকেলের দিকে একটা হাল্কা উড়ু-উড়ু মিষ্টি বাতাস বইতে শুরু করেছে। মাঠমাঠালির ওপর নেমে আসছে দিনান্তবেলার মায়াময় ছায়া। মেনকার বাবা মাঠ থেকে ফিরেছে। মেনকা জলার ধারের ঘাসজমি থেকে দড়ি ধরে গাই গোরু নিয়ে ফিরছিল। সেই সময় ওরা এল। সামন্তকাকা, বুধো সামন্ত। পাশের গ্রামের লোক, গ্রাম-পঞ্চায়েতের একজন হোমরা-চোমরা। বুধো কাকা যে মানুষটাকে সাইকেলে সওয়ার করে নিয়ে এসেছিল সে অচেনা জন। গায়ে একটা গেরুয়া শার্ট। আধময়লা পাজামাটার ঝুল খাটো। একমুখ দাড়িগোঁফ। সেই জঙ্গল ভেদ করে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। মানুষটা নিজের

মধ্যেই ডুবে ছিল, কোন দিকে তাকাচ্ছিল না। অথচ ওর দিকে একপলক তাকিয়েই মেনকার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছিল। একে কি সে দেখেছে কোনদিন?

সাইকেলেটাকে দাওয়ার খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বুধোকাকা বলল, 'নতীশদা, আপনার কাছেই এলাম। অনেক চাষবাস তো আপনার। এই ছোকরাটিকে রাখতে হবে। কাজকম্মো যা বলবেন করে দেবে। খেতে দেবেন দু'বেলা। হাতখরচ যেমন বুঝবেন দেবেন। ওর খাঁই কিছু নেই।'

মেনকার বাবা নতীশ সাঁপুই অভিজ্ঞ মানুষের জরিপ-অভ্যস্ত চোখে আগন্তুককে দেখছিল। দেখতে দেখতে ওর চোখ কুঁচকে উঠছিল বারবার। মুড়ির বাটি ফেলে রেখে চোখের ইশারায় নতীশ একপাশে ডেকে নিয়ে গেল বুধো সামন্তকে। অর্থাৎ কথা আছে।

নতীশ বলল, 'একে কদ্দিন ধরে চেনো? বাড়ি কোথায়? এ অঞ্চলে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

বুধো সামন্ত বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। এ অঞ্চলের নয়। ওর কোথায় বাড়ি ও বলতে চায় না। বোধহয় রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। পাছে খবর চলে যায় এই ভয়েই হয়তো 'ঠিকানা জানাতে চায় না।'

'তোমার সঙ্গে চেনাজানা হল কি করে?'

'আমার তো অনেক বাড়িতে যাতায়াত। শেয়াগড়ের একটা বাড়িতে ও কাজ করত। সেখানেই প্রথম ওকে দেখি। তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়।'

'তা সেখানে অসুবিধেটা কিসের? চলে আসতে চাইছে কেন? ঝামেলা টামেলা হয়েছে?'

'না, না, সব কিছু না। ছোকরা এমনিতে খুব ভাল। কারো বিরুদ্ধে ওর কোন অভিযোগ নেই। ওর বিরুদ্ধেও কেউ কিছু বলেনি। তবে—'

নতীশ সাঁপুই সপ্রশ্নচোখে তাকাল, 'তবে—'

বুধো সামন্ত খানিক ইতস্ততঃ করে বলল, 'ওর স্বভাবটা একটু অদ্ভুত। কোন জায়গায় বেশি দিন থাকতে চায় না। তাহলে নাকি মায়া পড়ে যাবে। মনে হয় ওর জীবনে কোন আঘাত-টাঘাতের ব্যাপার আছে। তা সেসব ঘেঁটে আমাদের কি লাভ? আপনার অসুবিধা হলে বিদেয় করে দেবেন।'

নতীশ সাঁপুই কাঁচা-পাকা দাড়িতে—তিন চার দিনের খেউরি না করা দাড়ি মুখে, হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ব্যাপার কি জানো, অনেকদিন আগে একটু ঝামেলা হয়েছিল। বছর সতের আগে। কোত্থেকে এইরকমই এক অচেনা ছোকরা এসে কাজ নিয়েছিল বাড়িতে। ও যে পুলিশের নজরে আছে তা কি করে জানব বলো? সেও

ছিল দিব্যি ভালমানুষ। এক রাতে পুলিশের হামলা হল। সে তো পালিয়ে বাঁচল। তারপর আমাদের ভোগান্তির একশেষ। তাই একটু সতর্ক হয়ে গেছি আর কি! তা তুমি যখন বলছ রেখেই দেখি কদিন।'

তিন মাস আগের সেই সন্ধেমুখে বাবা আর বুধোকাকার মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল সব পরিষ্কার গাঁথা আছে যেন। একটা শব্দও খসে যায়নি সেই গাঁথনি থেকে। দিন দুই পরেই একটা ঝোলা ব্যাগ আর একটা পুঁটুলি নিয়ে এখানে এসে পড়ে মানুষটা। তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেল দখিনে বাতাস আর কোকিল ডাকার দিনগুলো। গরমের দিন ... তাও কাটতে চলেছে। টিকে গেছে নতুন মাহিন্দার। তবু আজো যেন নতুন অতিথি—প্রথম দিনের মতোই এক-সমুদ্র দূরে দাঁড়িয়ে এমনি ও আবছা হয়ে আছে যে অতদূরে বুঝি মেনকার নজর চলে না।

তুচ্ছ একজন মাহিন্দরকে নিয়ে মনিবকন্যা মেনকার এত কৌতূহল কেন? আসলে ও সতের বছর আগে দেখা এক সদ্য তরুণের মুখের সঙ্গে এই যাই-যাই-যৌবন মানুষটির মুখচ্ছবি মিলিয়ে নিতে চায়। প্রায় দেড় যুগ আগে তাদের বাড়িতে কাজের লোক হয়ে এসেছিল তরুণটি। কিশোরী মেনকা সম্পর্কের দূরত্ব ভুলে, কাঁচা বয়সের চপলতায় তার নাম দিয়েছিল—মুসাফির। মুসাফির বলেই ডাকত তাকে। কথাটা শিখেছিল মেনকা যাত্রা শুনে। তারপর এক রাতে সে চলে গেল কোথাও। ওর আপন পরিচয় ফাঁস হতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কেবল এক কিশোরীর মধ্যে রেখে গেল স্থায়ী বুক-ব্যথা। এরপর মেনকার স্বামী-সংসার হয়েছে, এক সময় সে পাট চুকেবুকেও গেছে খুব তাড়াতাড়ি। ক'বছরের নতুন সংসার ফেলে রেখে নিঃসন্তান মেনকা চলে এসেছে বাপের বাড়িতে। সেই কৈশোরক বুকব্যথা আজো যায়নি। সপ্তাহ মাস বৎসরের পলিতে বুক ব্যাথাটা যদি বা চাপা পড়ে গিয়েছিল আবার নতুন করে তাতে আঘাত বেজেছে। থেকে থেকে তার মনে হয় এই উলুঝুলু চুল আর গোঁফদাড়ির জঙ্গলে আড়াল-পড়া মুখখানা সেই তরুণের। মুসাফিরের।

মেনকাদের বিরাট সংসারে সেই একরকম গিন্নি। গিন্নিপনা যাকে করতে হয় তাকে খুব বেশি আড়াল-আবডাল মেনে চললে চলে না। আর মেনকা খুব একটা লাজুক গোছের মেয়েও নয়। বাড়ির লোক আর জন মুনিষদের জন্যে সে শুধু রাঁধেই না, খেতেও দেয়। অন্য সময় তার মুখে কথার খই ফোটে, কাজের লোকদের সঙ্গে হাল্কা হাসি-পরিহাসেও যোগ দেয় কিন্তু ওই অচিন পুরুষটির সামনে সে অন্যরকম। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠাঁই পেতে ভাত-তরকারি ধরে দিয়ে সে সরে যায় একান্তে। আশ্চর্য, লোকটার বাড়তি কিছুর দরকার হয় না। মুখ নিচু করে খায় নিঃশব্দে, মুখ ফুটে চায় না কোনদিন। এ কি সঙ্কোচ, লজ্জা? একদিন ভাত-ব্যঞ্জন বেশি করে

সাজিয়ে দিয়েছিল মেনকা। লোকটার আহার এত সুনির্দিষ্ট যে বাড়তি ভাত তরকারি বেঁচে গেল। কোনদিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করেই বলল, 'বেশি-বেশি দেবেন না। আমি খুব কম খাই।'

বেমানান 'আপনি' শব্দটাকে ঠেলে দিয়ে একরকম জোর করে 'তুমি' শব্দটাকে টেনে এনে মেনকা বলেছিল, 'কেন? খেতে পার না কেন? সারাদিন খেটেও খিদে হয় না?'

'বোধহয় পেট মরে গেছে। হয়তো পেট ভরে খেতে না পেয়ে।'

'সে কি। কেন? পেট ভরে খেতে পাওনি কেন?

'সে অনেক কথা। সে থাকগে।'

'এখানে তো ভাতের অভাব নেই। আমাদেব প্রচুর চাষবাস। ভরপেট খাবে। তোমার স্বাস্থ্যও তো দেখছি ভাল নয়। আগে ভাল ছিল নিশ্চয়ই।'

'কি জানি। আমি বোধহয় বরাবরই এইরকম। আপনি তো আর আমাকে আগে দেখেননি।'

'কে বললে!' মেনকার ধীরস্থির গলা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, 'বোধহয় দেখেছি। আচ্ছা, তুমি আগে কখনও এখানে আসো নি? এই বাড়িতে?'

কপালঝাঁপা চুল দাড়ি আর গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখখানা একবার মাত্র তুলে তাকিয়েছিল। অবাক চোখ দুটো সংলগ্ন-স্থির ছিল মেনকার আকণ্ঠ-উৎসুক মুখখানার ওপর। তারপর মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'আমি মুসাফির দরবেশ মানুষ। ভেসে ভেসে বেড়াই। কোথায় গেছি না গেছি—সব কি আর মনে আছে?'

'মুসাফির!' তীক্ষ্ণ চাপা আর্তনাদ হয়ে মেনকার গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাটা।

মানুষটি কি তা খেয়াল করেছিল? কে জানে! ও খুব স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, 'আপনার আজ মনটা বোধহয় ভাল নেই।'

মনটা বিকল হয়েই গিয়েছিল মেনকার। সেইদিন সারাটা রাত তার শয্যাকন্টকী হয়েছিল। এমন আরো কয়েকবার হয়েছে তার।

একাকিত্বভরা অবসরে মেনকা মনের কুলুঙ্গি থেকে টুকরো টুকরো নানান ঘটনা পেড়ে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিজের মনে। ভাবে। ভাবতে ভাবতে টের পায় কোথায় যেন পাড় ভাঙার শব্দ হচ্ছে। কঠিন তটভাগ হঠাৎ-আবর্তে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। সে তার মনেব গাঙের পাড়ি। এ ভাঙন সে রোধ করবে কি করে?

*   *   *   *   *

কিছু কিছু ঘটনা ঘটে সংসারে বড়ো আকস্মিক। হিসেবের বাইরে। গেরস্থঘরের নিত্যকার কাজ সেরে মেনকা তখন সবে একটু শরীর জুড়োবার আয়োজনের উদ্যগ করছে, দুপুরের দেহে ভাটির টান লেগেছে, এমন সময় ওরা এল। সাত বছর আগে রবিনকে দেখেছিল মেনকা, কিন্তু দেখামাত্রই চিনতে পারল। পনেরো-ষোলর ছেলেটি এখন বাইশ তেইশের ভরা যুবক। রবিনকে দেখে মেনকা এমন হাঁ হয়ে গেল যে অঙ্গের অগোছাল বসন গোছগাছ করতেও ভুলে গেল। রবিন সাইকেল রাখতে রাখতে বলল, 'কি গো বৌদি, চিনতে পারছ না নাকি?'

মেনকা শ্বাস টেনে বলল, 'পারছি। আয় বোস।' দাওয়ায় মাদুর পেতে দিয়ে বলল—'কি ব্যাপার বলতো? রাস্তা ভুলে?'

রবিন হাল্কা গলায় বলল, 'এমনিও কি আসতে নেই? জানো বৌদি তোমার কথা খুব মনে পড়ে। কতবার ইচ্ছে হয়েছে চলে আসি, লজ্জায় আসা হয়ে ওঠেনি।'

'আমার কথা যে খুব মনে পড়ে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সেজন্যেই এক যুগ পরে এলি! তুই যে এত লাজুক সেটাও তো জানা ছিল না।'

রবিন বলে যেতে থাকে, 'সবই ভাগ্য। নাহলে বিয়ের চার বছরের মধ্যে দাদা চলে যাবে কেন? কি স্বাস্থ্য ছিল দাদার! ভাবাই যায় না ব্যাপারটা।'

মেনকা অনেক চেষ্টায় বুকের ভেতরের আলোড়ন রোধ করল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে বুক হাল্কা করে বলল, 'ওসব পুরনো কথা যাক। কি মতলব নিয়ে এসেছিস সত্যি-সত্যি বল তো।'

'সত্যি কথাটা হল তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'তোমার আসল বাড়িতে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িই তো মেয়েদের আসল বাড়ি।'

'খুব কথা বলতে শিখেছিস। তা সে তো ছেড়ে এসেছি কবে। অ্যাদ্দিন পরে হঠাৎ ওকথা কেন?'

'সে জবাব আমি দিতে পারব না। বাবা পাঠাল, আমি এসে গেলাম—এই হচ্ছে কথা। অলকার বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে। বাবা বলছিল—বাড়ির মেয়ের বিয়ে, অথচ বাড়ির বড়বৌ থাকবে না, এ কি করে হয়?'

'এতকাল তবে চলছে কি করে?'

'বৌদি, তুমি ভারি উল্টোপাল্টা বলছ। দোষ দু'তরফেরই ছিল। সে সব কথা থাক না। তুমি না গেলে বাবা খুব কষ্ট পাবে। অলকাও তোমার কথা খুব বলছিল। ও খুশি হবে তুমি গেলে। নিজের বোন বলে বলছি না, ও তোমাকে সত্যিই ভালবাসে।

সাত-আট বছর আগে ও কত ছোট ছিল। তোমাকে বৌদি নয়, মায়ের মতো দেখত। ও কিন্তু খুব আশা করে আছে।'

রবিন বাড়িয়ে বলেনি। মেনকার সঙ্গে অলকার সম্পর্ক ছিল অনেকটা মা-মেয়ের মতো।

বলল, 'হ্যাঁরে রবিন, তোর বৌদি না হয় গেল। কাজকর্ম করল। তারপর?'

'তারপর বাড়ির বৌ বাড়িতেই থাকবে।'

'ওমা, আসতে দিবি না?'

'সে বাবা জানে। বাবার ইচ্ছে তুমি ওখানে পাকাপাকি থেকে যাও। অলকাই বাড়ি সামলাত। ও তো চলে যাচ্ছে, বাড়ি সামলায় কে?

'তুই বরং বাড়িতে নতুন দাসী নিয়ে আয়।'

'দাসী! তার মানে বিয়ে! ও বাবা, ওসব হবে-টবে না এখন। ফাদারের কানে কে যেন ঢুকিয়েছিল কথাটা। ওল্ড ম্যান খেপে টেপে একশা। এবার মনের কথাটা বলতো, যাচ্ছ কিনা।'

মেনকা হেসে বলল, 'বলবার মালিক আমি নাকি? সংসারের কর্তা তো বাবা। বাবাকে বল। আমি গেলে এখানের সংসার দেখবে কে?'

রবিন ঘাড় নাড়ল, 'আমি ওসব ওল্ড ম্যানদের মুখোমুখি হতে পারব না। ভয় করে। আমি বরং দিন দুই পরে আসব। তুমি বলে-কয়ে রেখো। কিন্তু তোমার মতটা তো জানা হল না। বাবাকে গিয়ে কিছু বলতে হবে তো!'

উত্তর দিতে একটু দেরিই হল মেনকার। আস্তে আস্তে বলল, 'আসছে বার যখন আসবি বলব। এখন নয়।'

চা-জলখাবার খেয়ে রবিন চলে গেল। দেখতে দেখতে বিকেলও ঘনিয়ে এল। রাতজাগা শরীরটাকে বিশ্রাম দিতে একটু ঘুমিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল মেনকা। হল না। ভাতঘুমের পক্ষে এখন অবেলা। গাই গোরুটা অনেকক্ষণ এক খুঁটোয় আছে; জল দেখাতে হবে। মেনকা ডাঙার দিকে গেল। খুঁটো তুলে একটু দূরে খুঁটো পুতল। ঘাসজমিতে বসে পড়ল। এখান থেকে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত নাবাল জমি দেখা যায়। ওর বাবা নতীশ সাঁপুইকর্তার রাজ্যপাট। মানুষজন কাজ করছে মাঠে। মেনকার চোখ ঘুরে ঘুরে ফিরল একটি মানুষের খোঁজে যাকে ঘিরে আছে দুর্ভেদ্য রহস্য। সে নেই। চারদিকের প্রকৃতি শান্ত। তার মনে তবে এত তরঙ্গ কেন? ভাবল মেনকা।

রবিন আসাতেও খুশিই হয়েছে। এই দেওরটিকে সে খুব স্নেহের চোখে দেখত। অলকাকেও। কিন্তু রবিন না এলে ভাল হত। আধ যুগেরও আগে ফেলে আসা

সংসারটা থেকে যে ফরমাস এসে পৌঁছল তা তো এক নতুন উপদ্রব। এর জন্যে সে তৈরি ছিল না আদৌ। তেইশ বছরে সে মাথায় সিঁদুর দিয়েছে, ছাব্বিশে মুছে ফেলতে হল। তিন-চার বছরের অন্যরকম জীবন। তারপর আবার ফিরে আসতে হল আবাল্য চেনা গ্রামটায়। এরপর অনেক অনেক নিস্তরঙ্গ দিন কেটে গেছে। প্রথমদিকে কোথায় যেন জোড় মিলছিল না এখানকার দিনগুলোর সঙ্গে ফিরে আসার পরের দিনগুলোর। একটা সুক্ষ্ম ফাটল দেখা দিয়েছিল। সময় তার ওপর প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। জোড় মিলে গেল কুমারী জীবনের সঙ্গে বৈধব্য-পরবর্তী জীবনের। তাহলে আবার দুঃখের জায়গাটা খোঁড়াখুঁড়ি কেন?

কিন্তু সিদ্ধান্ত তো এত সহজ নয়। শ্বশুরমশায়ের ওপর অভিমান অবশ্য তার কম নয়। খানিকটা ওঁর জেদাজেদিতেই তাকে সে বাড়ি ছাড়তে হয়। কাঁচাবয়েসী পুত্রবধূকে ঘরে রাখার সাহস পাননি মানুষটা। এদিকে তার বাবাও মেয়েকে ঘরে আনার পক্ষে। এইসব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত মেনকার ফিরে আসা। কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে যখন ডাক এসেছে সে-ডাকও ফেরানো কঠিন। একবার গেলে ফেরাও কি সহজ? একটা ফাঁদের মত ওঁৎ পেতে আছে ওদের সংসার। তাহলে?

অনুচ্চারিত প্রশ্নটার তীব্র অনুররণ যেন ছড়িয়ে গেল বিশ্বচরাচরে। মাটি থেকে মেঘমণ্ডল পর্যন্ত বিছিয়ে গেল সেই জিজ্ঞাসার নিরুচ্চার ধ্বনি। তারপর অন্তরের মধ্যে সে পাড়ি ভাঙার শব্দ শুনতে পেল। নদীর ওপারে চর জেগে উঠতে চাইছে, নতুন একটা চর।

মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল নিয়ে মানুষটা বসেছিল বাঁধের ঢালে। বিড়ি টানছিল আস্তে আস্তে। কবে কোন্ দূর অতীতে ও সিগারেট খেত। সিগারেটের স্বাদ ও এখন প্রায় ভুলে গেছে। তা বিড়ির সোয়াদ ওর ভালই লাগে ইদানিং। মিতব্যয়ী হওয়াতে ওর হাতে শ'তিনেক টাকা জমেছে। সেগুলো ও পলিথিনের প্যাকেটে পুরে ঘুমোবার চাটাইয়ের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। তিনশো টাকা ওর কাছে এখন অনেক টাকা।

বাঁধের ওপরের কুঁড়েঘরটা ওর দুপুরের বিশ্রাম এবং রাতের ঘুমোবার জায়গা। ওখান থেকে এক মিনিট হাঁটলে সাঁপুইদের বাড়িটা। মেটে বাড়ি, তবে মস্তো। একখানা চার কুঠুরির মাঠকোঠা। সেটার লাগোয়া আরো একখানা ঘরে ওকে থাকতে বলেছিল। সে থাকতে চায়নি। এই কুঁড়েঘরটা ওর ইচ্ছেমতো এখানে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ও ভাল আছে। ও প্রকৃতি নিয়ে ঘর করতে ভালবাসে। মানুষের সংসার থেকে অদূরবর্তী নির্জনতা, রৌদ্র, অন্ধকার, পাখি ও বন্য কুসুম ওর প্রিয়।

একলা থাকে বলেই অবসর মুহূর্তে ওর ভাবনা ভেবে সময় যায়। একাকিত্ব ভাবনা ডেকে আনে। যেমন এখনই ও ভাবছে নানান ভাবনা, এই সাঁঝবেলার ঝুঁঝকো

অন্ধকারে। এই বারমাঠে, বিশ বা তিরিশ বছর আগে গজিয়ে ওঠা নতুন গাঁটায় পথে প্রান্তরে মানুষের সাড়া বড় কম। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ সাঁপুইদের ছাড়া আর দুটো সচ্ছল চাষী-পরিবারের বাড়ি মাত্র আছে এ-দিগরে। সেহেতু মাঠচরা গোরু এবং কৃষাণের দল সাঁঝ নামার আগেই ফিরে গেছে গোয়ালে, গৃহে। এখন প্রান্তর-শস্য গাছগাছালিসহ প্রকৃতি ধ্যানী তাপসের মতো মৌনব্রতী। এমন সব সময়ে যে কোন নিরিবিলি-স্বভাব মানুষেরই মন নিজের মনে কথা বলে ওঠে। ভাবনাদের পাখা গজায়।

ওরও একটা অতীত আছে। সব মানুষেরই থাকে। এবং ও অতীতের কথা ভেবে চলে। সেই অতীত হিরণ্ময় নয়, সীসের মতো বিষণ্ণ। ওর বালক বয়সের অভিজ্ঞতা ভারি বিষাদময়। কেষ্টপুর—এটাই ছিল ওদের গ্রামের নাম। দু'কুঠুরির মেটে বাড়িটা সত্যিকার অর্থেই গরীবখানা। সেটার অন্দরমহলে অসচ্ছলতা থৈ-থৈ করত। ওর বাবা মারা গিয়েছিল ওর যখন বছর আটেক বয়স। জমিজমা ছিলই না বলতে গেলে। ওর প্রায় মুখ্যু মা ওর মুখে কিভাবে যে নিত্যদিন খাবার তুলে দিত সে-রহস্যের কিনারা আজো ও করতে পারেনি। মায়ের মুখখানা খুব মিষ্টি, সেখানে যেন নরম পলিমাটির পেলবতা। সেই শ্রীময়ী রমণীর স্নেহঝরা চোখই ছিল ওর একমাত্র আশ্রয়। ওর লেখাপড়ায় মাথা ছিল। খাতা-পত্তর ইত্যাদি সমস্ত অভাবের মধ্যেও ছেলেদের মধ্যে আলাদা একটা সমীহ ও আদায় করে নিতে পেরেছিল। মাস্টারমশাইরা বলতেন, 'তোর হবে।'

কি একটা যেন কারণে কেষ্টপুরের বাড়িতে বেশিদিন থাকা হয়নি ওদের। শীতের এক সকালে ওর মা ওকে ঘুম থেকে তুলে বলল,—'খোকা, আমরা এখানে আর থাকব না। কিছু নেই আমাদের যাতে এখানে থাকতে পারি।'

'কোথায় থাকব তবে?'

'অনেক দূর এখান থেকে। আমার এক জাঠতুতো দাদার বাড়ি। তাদের অবস্থা ভাল। সেখানে তোর লেখাপড়াও হবে। ভাল ইস্কুল আছে।'

এগার মাইল রাস্তা হাঁটতে হয়েছিল। সে যেন দেশান্তরের পথ। সূয্যি ওঠা বেলায় বেরিয়ে ওরা গন্তব্যে পৌঁছেছিল দুপুরবেলায়। গোটা রাস্তাটা মা আর খোকার কত কথা! খোকার কত প্রশ্ন আর মায়ের কত জবাব। সে সব কি আর আজ মনে থাকে!

এই নতুন বাড়ি একটা গঞ্জ মতো জায়গায়। জায়গাটার নামও গঞ্জ দিয়ে। হরিগঞ্জ। বর্ধিষ্ণু জায়গা, বিস্তর অবস্থাপন্ন লোকের বসবাস। মায়ের জাঠতুতো দাদা—মানে ওর মামা। ফলে বাড়িটা মামাবাড়ি। মামাবাড়ির অবস্থা ভাল, একতলা সাদারঙের সাবেকী ধরনের বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। অবস্থা ভেদে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সুর পালটায়। ওর মা যদি ছেলের হাত ধরে দাদার বাড়িতে ক'দিনের জন্যে শখের

বেড়ানো বেড়াতে আসত তাহলে ওরা হত মর্যাদার অতিথি, সমাদরের জিনিস। কিন্তু হতভাগিনী গিয়েছে আশ্রিত হয়ে, গলগ্রহেরা চিরকালই অলিখিত বান্দা অথবা বাঁদী। ওর মা যাবার পরদিনই আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থার নিয়মে সেখানে বাঁদী হয়ে গেল। অবশ্য সে সব বোঝার বয়স হয়নি ওর তখন, বুঝেছে পরে। শুধু এটুকু বুঝেছিল যে মা এখানে অন্য রকম হয়ে গেছে, মায়ের এখানে অনেক কিছু করতে মানা যা নিজের বাড়িতে ইচ্ছে মতো করতে পারত। বুঝেছিল মা এখানে তার খোকনসোনার পাতে বড় মাছের মুড়ো কিংবা দুধের চাঁছি তুলে দিতে পারবে না।

না পারুক, এসব নিয়ে কচি বয়সে খুব বেশি কেই বা ভাবে? লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল মামা। ও তখন হাইস্কুলে পড়ছে। ভাল ছাত্র হিসেবে নাম হয়েছে। ও এতেই খুশি। মামার ছেলেগুলো গবেট। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বিড়ি ধরেছে, গোপনে তাড়ি-টাড়িও খায়। মামাতো ভাইদের মধ্যে বড়জন আগে ছিল সমান ক্লাশে, পরে পড়ল পিছিয়ে। আর ও তরতর করে সামনের দিকে চলল এগিয়ে। দু'ভাইয়ের মধ্যে বাকিজনও বড়রই মতো। সেও মহাজনের পথই ধরেছে। ওদের জন্যে দুঃখ পেত ও। আর ওরা ওকে করত ঈর্ষা। সে করুক, তবে এই অভাজন ছেলেটির মধ্যে পদার্থের খোঁজ পেয়ে মামা-মামীর মনেও যে ঈর্ষার গরল ফেনিয়ে উঠবে সে আর ও কি করে জানবে?

ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার আগে মা কেন যে দুম করে মারা গেল! তবে যে লোকে বলে দুঃখকষ্ট মানুষের পরমায়ু বাড়ায় আর সুখী লোকরাই টুক করে চলে যায়! এক্ষেত্রে অন্তত তা হয়নি। মা ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে যেতে একদিন নেই হয়ে গেল।

সময় থেমে থাকে না। আর পৃথিবীর কাজকর্মও চুপ করে থাকে না। মায়ের মরণের পর কষ্ট ভুলতে ও যেন লেখাপড়াকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরে ছিল। ইস্কুলের শেষ পরীক্ষার ও এমন নম্বর পেল যে সবাই বলল, —'সাবাস ছেলে।' কেবল মামাই গম্ভীরমুখে বলল, 'ঢের বিদ্যে হয়েছে। এবার বাড়ির কাজকর্ম কর। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না।'

'কলেজে পড়ব না?' হতভম্ব ছেলেটির আর্ত জিজ্ঞাসা।

'তাহলে নিজের রাস্তা দেখ।' 'মামা বিকট গলায় বলেছিল।

এরকম অবিস্মরণীয় দিন তো জীবনে বেশি আসে না। তা এটাও অবিস্মরণীয় দিন বৈকি। দুমড়ে বেঁকে গিয়েছিল ওর মনটা। হরিগঞ্জে সেটাই ওর শেষ দিন।

প্রকাণ্ড এক গাঙের ধারে হরিগঞ্জ। রূপনারাণ। হরিগঞ্জের কাছে রূপনারাণ একেবারে রূপের পশরা সাজিয়ে বসেছে। আকাশের কিনারা ছুঁয়েছে গেরুয়া জলের বিস্তার।

সেই জলবিস্তারে ভেসে ভেসে বেড়ায় ডিঙি নৌকা, গয়নার নৌকো—ছোট ও ঢাউস মধুকরেরা। উপকূলেও অনেক নৌকা। মামাবাড়ি থেকে নদীকূল গেঁয়ো মানুষদের হাঁটাপথে দশ বারো মিনিটের দূরত্ব। জায়গাটা বড় প্রিয় ছিল ওর। মনের মধ্যে মেঘ করে এলে ও রোদ্দুরের খোঁজে আসত রূপনারাণের উপকূলে। মনের মেঘ কাটিয়ে নতুন করে জেগে উঠত। চড়ে বসত কোন নৌকায়, সাত-দরিয়া ঘোরা মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে গল্পে জমাত। তো সেই অবিস্মরণীয় দিনটায় মনমরা হয়ে ও নদীর ধারে এসে দেখল সব খাঁ খাঁ করছে। মাল্লারা কেউ নেই। হয়তো গঞ্জে সওদা করতে গেছে। ও একটা ঢাউস নৌকোয় চড়ে নৌকোর ঘরের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। বিকেলের মিষ্টি আলোয় রূপনারাণ তখন বড়ো রূপবান, কিন্তু সে সব দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না ওর। ও অন্ধকারের আড়াল চাইছিল, জলের হিন্দোলায় দুলতে দুলতে আর ঢেউয়ের গান শুনতে শুনতে কখন যে ওর চেতনা থেকে চরাচর লুপ্ত হয়ে গেছে টেরও পায়নি। ঘুম যখন ভাঙল দিনের আলো ফুটে উঠেছে। কতকগুলো অচেনা মুখ অবাক চাহনি নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। সেও অবাক। কারণ রাতের জোয়ার যেখানে তাকে এনে ফেলছে সেটা অচেনা এলাকা, অজানা ভূমি। আশ্চর্যের কথা, দাঁড়িমাঝিরা রাতে কেউ তার অস্তিত্ব টের পায়নি। এই নৌকোটায় ও আগে কখনও চড়েনি। তাছাড়া হরিগঞ্জে অগুণতি নৌকোর আসা-যাওয়া। সব মাঝিমাল্লাকে সে চিনবে কেমন করে?

নৌকোটা লাট-অঞ্চলে যাচ্ছিল গোলপাতা সওদা করতে। ফিরতি রাস্তায় ওকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবে, মাঝি বলেছিল। ও ফিরতে চায়নি, বলেছিল ওর বাড়িঘর নেই, স্বজন নেই, ও ফিরবে না। সেই যে ওর ঠিকানা হারিয়ে গেল সেই থেকেই ও নেই-ঠিকানা। ও অনিকেত। ওর কোন নিকেতন নেই।

ইচ্ছে করলে ও আর পাঁচজনের মতো ভাগ্যগঠনের কাজে লেগে যেতে পারত। ইচ্ছেই করল না। নৌকার জীবন কিছুদিন, জলে জলে আর নতুন গাঁ গঞ্জ দেখা। তারপর জল ছেড়ে এল ডাঙায়। গত চোদ্দ পনেরো বছর ধরে ঘুরেছে ভারতীয় মানচিত্রের প্রান্ত প্রত্যন্তে, কোথাও থিতু হয়নি বেশিদিন। পরিব্রাজকের মতো বেড়িয়েছে শুধু, ভিতরের কি একটা ধাক্কায় কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। একসময় ওর মন ইঁট-কাঠ-লোহা ছেড়ে জলা-জঙ্গল ধান ভুঁই নদীর সান্নিধ্য চাইল। শহর নিরুত্তাপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রতিযোগিতার তীর্থ। গ্রাম উত্তাপময়, মাটি সনাতন ও অকৃত্রিম। নতুন গাঁয়ের ঠিকানায় এসে অনিকেত কি নিকেতনের স্বাদ পেয়েছে? হয়তো বা। এখানে ওর বেশ কেটে যাচ্ছে দিন, পালাবার চাড় নেই, ও টের পায়।

আধপোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে, নতুন একটা ধরিয়ে, আবার ও ভাবনাস্রোতে ডুবে

গেল।

সাঁপুইদের বাড়ির সকলেরই তাকে জড়িয়ে একটা অদ্ভুত সংশয়-সন্দেহ রয়েছে। বিশেষ করে ওই তিরিশ-পেরুনো বিধবা মেয়েটার। মেনকার। মেয়েটার হাবভাব কেমন অন্য রকম, ঠিক মুনিবকন্যার মতো নয়। ওর নরমসরম ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক লাগে না। তার কাছে মেনকা যেন আলাদা মন নিয়ে আসে। সেই মন সুবাসিত, মধুময়। ওকে নিয়ে মেনকার এত কৌতূহল কিসের? একটা উড়ো-উড়ো কাহিনী কানে এসেছে। বছর সতেরো আগে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল আঠারো উনিশ বছরের এক ছোকরা। ওদের বাড়ির ফাইফরমাস খাটত। দেখেই বোঝা যায় ভালঘরের ছেলে। ওর সঙ্গে রাতবিরেতে নাকি দেখা করতে আসত অনেকে। সলা-পরামর্শ করত। কোথা থেকে তারা আসত আর কিসেরই বা পরামর্শ কেউ জানে না। রাত ফুরোবার আগেই তারা সব চলে যেত কে জানে কোথায়। তারপর একরাতে পুলিশ এল। আর ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল। সেই সময় বাংলা জুড়ে খুনোখুনির রাজনীতি চলছিল। ছেলেটা বোধহয় ওই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কেউ ছিল। এরপর আর ওর কোন্ খোঁজ পাওয়া যায়নি। মেনকার সন্দেহ সে-ই এতদিন পরে ফিরে এসেছে মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল নিয়ে। অদ্ভুত সন্দেহ। এই জলাভুঁই আর তেপান্তরঘেরা গাঁটায় সে তো সত্যি সত্যি কখনও আসেনি আগে। এসেছে কি?

কিশোরী মেনকার একদা আলাদা টান ছিল সেই ছেলেটার দিকে, ও টের পেয়েছে। ছেলেটি যাবার আগে মেনকার মনের অকর্ষিত ভূমিতে কোমল আবেগের শস্য আবাদ করে গিয়েছিল। পরে সেই শস্যের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। মেনকার জীবনে অন্য কৃষাণ এসেও সে ফসল গোলায় তুলতে পারে নি।

কিন্তু সে নিজেই বা কেন ফসলের ভাগ নিতে যাবে? অধিকারই বা কোথায়? অথচ তা সে করতেই পারে, নিতেই পারে ফসলের ভাগ, যেহেতু মেনকাই তাকে অধিকার দিতে চায়। কিন্তু—

'কিন্তু' আছে, একটা সুবৃহৎ সুবিশাল 'কিন্তু'। দিতে চাইলেই কি সবকিছু নেওয়া যায়, বিশেষ করে তা যদি হয় নারীর মনের রঙ?

প্রশ্নটা নিজেকে শুধিয়েই ও চমকে উঠল। চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল ওর। প্রবলভাবে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁকা মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে তুলতে চাইল যেন, —না, নিতে নেই। নেব না। আমি অনিকেত।

ও ভয় পেল। এখানে আসা অব্দি এই প্রথম ভয়। ও হঠাৎ টের পেল গত পনেরো বছরে যা হয়নি গেল তিন মাসে তাই হয়েছে। এখানে ওর শেকড় নেমে গেছে অনেক গভীরে, এখানে ওর চারপাশে নতুন পলির সর পড়েছে। নিজেকে

একটা নদী অনুভব করে ও বুঝতে পারল নতুন চর জেগে উঠছে। শেকড়টা এখনও ছেঁড়া যায়, চরটাকে ভাঙনে বিধ্বস্ত করে দেওয়া যায়। তারপর বড় দেরি হয়ে যাবে।

মস্তিষ্কের কোষ থেকে ঘুমেরা তখনও নিঃশেষে ঝরে যায় নি, ও উঠে পড়ল। সন্ধেবেলাতেই সামান্য জিনিষপত্তর গোছগাছ করে রেখেছিল। আগড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমে ওর চোখে পড়ল দিগন্তে হেলেপড়া চাঁদ, তারপরে হাতের নাগালে এক রমণীমূর্তি। মেনকা।

'তুমি'? কিছুটা জড়ানো গলায় ও বলল। তুমি ছাড়া অন্য সম্বোধন ভাবতে পারল না ও। আবার বলল, 'তুমি আজ আসবে বলে মনে হচ্ছিল।'

মেনকা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তাই বুঝি চলে যাচ্ছ! আচ্ছা, তুমি কি কখনও আগে এসেছিল?'

'না। সে অন্যজন।'

'তুমি তাহলে কে? মাহিন্দার তো তুমি সেজেছ শখ করে।'

'আমি অনিকেত।'

শব্দটার মানে নিশ্চয়ই জানে না মেনকা। তবু কেমন করে যেন বুঝে নিল মানেটা। 'অনিকেতদের ঘর ফাঁদতে নেই, না?' বলল সে।

অনিকেত বলল, 'না, নেই।' একটু থেমে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি মেনকা।'

মেনকা বলল, 'আমিও সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছিলাম। কাল সকালে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আমি চলি।' অনিকেত বলল।

'কোথায় যাবে?'

'আমার তো কোন ঠিকানা নেই। তুমি তোমার ঠিকানা পেয়ে গিয়েছ, তাই না মেনকা?'

'কাল সন্ধে পর্যন্ত পাইনি। খুঁজছিলাম। এইমাত্র পেলাম। আচ্ছা, তুমি এসো।'

অনিকেত ও মেনকা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল ওদের চোখগুলো লোনাজলের উৎস হয়ে উঠেছে।

**আশাবরী**

# পুষ্পকীট

মউলীকে ট্রাকে তোলার ইচ্ছে একদমই ছিল না বিক্রম পাণ্ডের। না নিতে হলেই সে সবচেয়ে খুশী হত। তবু যে নিয়েছে তার মধ্যে খানিকটা সহানুভূতির ব্যাপার ছিল। এই জঙ্গলপথে ট্রাক তো ঘন ঘন আসে না, আবার কতক্ষণে ওর ভাগ্যে আর একটা জুটবে তার ঠিক কি! এ দিকে সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। এই সব ভেবেই ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মউলীকে নিজের ট্রাকে তুলেছে বিক্রম।

প্রথমে বিক্রম তো ওকে দেখেও দেখেনি। বাচ্চা-কাচ্চা ছেলেমেয়েতে ট্রাক তখন বোঝাই হয়ে এসেছে, আর মউলী তখনও বিক্রমের দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে পটের ছবিটি হয়ে রাস্তায় কিনারাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন চালু, গাড়ি স্টার্ট নেবে নেবে, মউলীই চেঁচিয়ে উঠেছিল নিজের মান মর্যদা জলাঞ্জলি দিয়ে, ও ড্রাইভার আমাকে নেবে না?.......... ড্রাইভারবাবু নয়, শুধু ড্রাইভার। আর কথাটাও যদি অনুরোধ, শোনাল কতকটা হুকুমের মত। বিক্রমের মান মর্যাদাবোধ একটু প্রখর, তুচ্ছতাচ্ছিল্য সে একেবারে সইতে পারে না। তার তামাটে রঙটা যে গাঢ় বেগ্‌নীরঙ ধরেছিল সেটা সেই অস্ত বেলায় কেউ হয়তো লক্ষ্য করেনি। কিন্তু গলার ঝাঁঝ সবারই কানে গিয়েছিল।

নেওয়া না নেওয়ার কি আছে। কোম্পানির ট্রাক, উঠতে বারণ করছে কে? তা বলে ওঠার জন্যে সাধতে হবে এমন কি কথা আছে? এই বলে বিক্রম একবার দেখে নিয়েছিল। মউলীর চোখ দুটোয় বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেল। সেটা রাগে না বিস্ময়ে বোঝা শক্ত। মহলশুকা মাইনসের একজন সামান্য ট্রাক-ড্রাইভার যে এ ভাবে তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে বিস্ময় হয়তো সেই ভেবেই। আর বিস্ময় হয়তো এই কারণেও যে তার দেহের আশ্চর্য ভাস্কর্যকে মুগ্ধ দৃষ্টির উপহারে অভিনন্দিত করে না এমন পুরুষও আছে দেখে। কিন্তু নাগিনী ফুঁসে উঠতে গিয়েও ফণা গুটিয়ে নিয়েছিল সম্ভবত একান্ত নিরুপায় হয়েই।

গাড়ি চালাতে চালাতে বিক্রম বুঝতে পারছিল ট্রাকে মউলীকে ঠাঁই দিয়ে ভুলই করেছে। এ মেয়ে যে কোন কঠিন চরিত্র পুরুষকেও অন্যমনস্ক করে দেবার ক্ষমতা রাখে। বার বার সে হারিয়ে ফেলছিল নিজেকে। এই চড়াই-উৎরাইয়ের অন্ধকার পথে অসতর্ক হওয়ার কি মানে তা সে ভাল করেই জানে। সমস্ত চেতনাকে সে তাই তেরশো ফুট ওপরকার দশ ফুট চওড়া রাস্তা, স্টিয়ারিং আর ব্রেকটার ওপর সজাগ করে রাখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মনের আয়নায় ভেসে ওঠা একটা মুখের ছবি বে-হুঁশ করে দিচ্ছিল তাকে।

আঠাল চটচটে ঘন অন্ধকার ট্রাকের হেডলাইটের আলোকবৃত্তের বাইরে যেন জমাট হয়ে বসে রয়েছে। মস্ত মস্ত শালের গুঁড়িগুলো পথের পাশেই শিকার উদ্যত শ্বাপদের মত ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিপিছল রাস্তায় ট্রাকের টায়ার একটা টানা কাৎরানির শব্দ তুলছে। সামান্য অসতর্ক হলেই গাড়ি স্কিড করবে। হয় কোন শালের গুঁড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ, নচেৎ সোজা ঢাল বেয়ে অতল খাদে নেমে যাওয়া। গাড়ি আর তার সওয়ারিগুলো সব লাশ হয়ে যাবে। বিক্রম তাই মনটাকে গুটিয়ে একরত্তি করে ব্রেক, স্টিয়ারিং ইত্যাদি যন্ত্রের মধ্যে সঁপে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সব ছেড়ে তার মনের আরশির ফ্রেমে একটা মুখের ছবি ভেসে ওঠে। বিক্রম চিরদিন জেনে আসছে তার মন প্রভুভক্ত ঘোড়া। তবে আজ কেন ঘোড়াটা বল্গার শাসন না মেনে এলোমেলো ছুটছে? তবে কি তার বুকের কোনখানে এই মেয়েটির নাম উজ্জ্বল আখরে লেখা আছে? আখর যদি কোথাও থাকে তো সেটা ঘৃণার কালি দিয়েই লেখা, অনুরাগের রাঙা রঙ দিয়ে নয়। আসলে মউলীর ওপর তার প্রচন্ড ঘৃণা। সে অবশ্য স্বীকার করে যে মউলী রূপসী, কালো রঙে আর দেহের সুষমায় চোখজুড়োনো রূপের ছটা, মহুয়ার মত যেন মদির। কিন্তু ও নিষ্কলঙ্ক ফুল নয়, ওর পাপড়িতে পাপড়িতে কলঙ্ক।

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে খুব নিরীহ একটা কাজই করে। মহলশুকা মাইনসের গেস্ট হাউসের রাঁধুনী। কিন্তু ও খনিবাবুদের রাতের সোহাগবধূও। গেস্ট হাউসের মান্যগণ্য অতিথিদের নিশিরাতের পণ্যা। আর পাঁচজন এটা কানাঘুষোয় জানে, বিক্রম জানে নিজের চোখ দিয়ে। সে জানে মউলী দিনের বেলায় খনির অতিথিদের জন্যে শুধু মুখরোচক খাবারই বানায় না, রাতের বেলা নিজেও তাদের এক সুখাদ্য হয়ে ওঠে! এরপর বিক্রম যদি ওকে ঘেন্নার চোখে দেখে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?

হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার..........

স্টিয়ারিং-এর একটা প্রচন্ড মোচড়ে বাঁকের মুখটা সামলে নিল বিক্রম। ডান কাঁধটা ব্যথায় ককিয়ে উঠল যেন, ককিয়ে উঠল বুঝি ভারী ট্রাকের ইস্পাতের গতরটাও। খুব সময়মত পেছন থেকে কেউ হুঁশিয়ারি দিয়েছে, না হলে এতক্ষণে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেত। একটা ভয় মাখানো গুঞ্জন উঠল বিক্রমের পিছন দিকে। কেবল তার মধ্যে একটা বেসুরো হাসি উপহাসের ভঙ্গীতে নানা পর্দায় বাজতে লাগল কিছুক্ষণ। অন্ধকারের মধ্যেও সবার থেকে আলাদা করে গলাটা চিনতে পারল বিক্রম। হাসির মধ্যে এমন গমক-চমক-গিটকিরি মউলী ছাড়া আর কার গলায় থাকতে পারে? হাসি থামলে সেই গলা সকৌতুকে কথা বলে উঠল, কি গো ড্রাইভার, দারু পিয়েছ নাকি? নাকি ভাবছিলে কারো কথা? কার কথাই বা ভাববে? তোমার কি আর পেয়ারের জেনানা আছে? সেই দুঃখেই মরতে যাচ্ছিলে নাকি?

বিক্রম কিছু বলল না, দাঁতে দাঁত ঘষল কেবল। মেয়েটার ভাবনা ভাবতে গিয়েই তো আর একটু হলে সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছিল। বন্ধুরতা এবং ঘন ঘন বাঁক বাদ দিলে মহলশুকা মাইনস্ এমন কিছু বেশী দূরে নয়। বাকি রাস্তাটুকু নির্বিবাদেই ট্রাক চালিয়ে এলো সে। কিন্তু মনটা তার বড় ভারী হয়ে আছে। বুঝতে পারল আজ অনেকক্ষণ ধরে তার বুকের তটরেখায় ঢেউ ভাঙবে।

বিক্রম একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। জীবনটাও তার বিচিত্র ধরনের। বিহারের এক অজ পল্লীতে জন্মেছে সে। নানা কারণে লেখাপড়া বেশী দূর এগোয়নি। বাবা তাকে চাষের কাজে জুড়ে দিয়ে অল্পবয়সে বউ এনে সংসারী করে দিতে চেয়েছিল। কোনটাতেই সে ঘাড় পাতেনি। এক দেহাতী বন্ধু পাটনায় ট্যাক্সি চালাত। বাড়ি থেকে পালিয়ে পাটনায় এসে সেই বন্ধুর কাছে দিনকতক ছিল সে। সেখানে ড্রাইভিংটা ভাল রকমই রপ্ত করে ফেলে সে। তারপর কলকাতায় এসে প্রাইভেট কার চালায় কিছুকাল। ওখানে মোটামুটি সুখেই ছিল। কিন্তু শহরে তার মন টেকেনি, তাছাড়া এক জায়গায় একনাগাড়ে অনেক দিন থাকাও তার ধাতে সয় না। আসলে ও স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ, কোন বাঁধনে বন্দী থাকার ব্যাপারটা ওর স্বভাবেই নেই। শেষকালে অনেক ঘাটের জল খেয়ে উড়িষ্যার এক জঙ্গলমহালে। এখানে এসে মন্দ কাটছিল না তার। চাকরি মানেই অবশ্য পরাধীনতা, তাহলেও মানুষগুলি এখানে বড্ড ভাল। আর ভাল লাগে এখানের অরণ্যে-পাহাড়ে মেশা প্রকৃতি। শাল-পলাশ-মহুয়া-দুধকীর অনাদ্যন্ত বিস্তারের মধ্যে তার প্রাণটা যেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। সে বেশ একটু কবি ধাঁচের মানুষ কিনা।

কিন্তু তার এই সহজ অনাবিল জীবনে একমাত্র দুষ্ট ক্ষত ওই মউলী। মেয়েটাকে নিয়ে সে যে ভাবতে চায় তা নয়, কিন্তু তার অনিচ্ছার দেওয়াল ফুঁড়েও মউলী কেমন করে যেন এসে যায়—অনেকটা এই অরণ্যভূমিব ঝড়ের মত। বেশ শান্ত বনভূমি, হঠাৎ যেন লক্ষ নাগিণী ফুঁসে উঠল, রুদ্র নটরাজের প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল। তার মনেও এই রকম ঝড় আসে মাঝে মাঝে, সেই ঝড় আনে মউলী। মেয়েটা কেন তাকে এত ভাবায় সে বুঝতে পারে না। ওর ভাবনায় বুকের মধ্যে চৈত্রমাস নামে না, হৃদয়ও সুবাসিত হয়ে ওঠে না, কি একটা আক্ষেপের জ্বালায় জ্বলতে থাকে বুকটা। তবু ভাবা চাই। সে বুঝতে পারে না মউলীকে সে ঘৃণা করে, নাকি অন্য কিছু।

আজও সে ওরই কথা ভাবছে ঝোপড়ির তক্তাপোষে শুয়ে, অন্ধকারের মধ্যে। কষ্টিপাথরে তৈরি একটা আশ্চর্য ভাস্কর্য তার চোখের সামনে ভাসছে, আদিবাসীদের দুরন্ত প্রাণৈশ্বর্য দিয়ে গড়া একটা দুর্জয় যৌবন। কিন্তু আশ্চর্য, এই নিবিড় ও অন্তরঙ্গ অন্ধকারের যাদু তার রক্তকে তুফানের নদীতে পরিণত কবে না, বরং একটা বোবা কান্না গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে। তার চোখের সামনে একটা মেয়ে নোংরা পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ভাবতে গিয়ে তার শ্বাসরোধ হয়ে আসে যেন। কিন্তু কি-ই বা সে করতে পারে? পরিত্রাণের উপায় তো মউলীর হাতেই ছিল। বিয়ে-থা করে ও সংসারী হতে পারত। এক সময় অনেক ছোকরাই ওকে ঘরে তুলতে চেয়েছিল। ও-ই তাদের বিমুখ করেছে। সর্বনাশেরও বোধ হয় মাদকতা আছে। তাতেই ডুবেছে মেয়েটা।

নিভৃত অন্ধকারে আজকে ভাবনায় পেয়েছে বিক্রমকে। ভাবতে থাকে, আচ্ছা, তার ওপর মউলীর মনোভাবটা কি রকম? মউলী কি তাকে একটু অন্য নজরে দেখে? যে নজরে জওয়ানী দেখে একজন জওয়ানকে? যুবতীধরম সে অবশ্য ভাল বোঝে না। কিন্তু মেয়েদের ভাবভঙ্গীর যে ভাষায় অনুরাগ ফুটে ওঠে তা সে বুঝবে না এত বোকাও নয়। তার দৃপ্ত পুরুষালি চেহারা মেয়েদের কাছে অবহেলার জিনিসও নয়। কিন্তু সে কি একটা মধুর মুহূর্তও মনে করতে পারে যখন তার দিকে চেয়ে মউলীর চোখের কালো তারায় বিজলী ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল? না নেই তেমন মুহূর্ত। বরং মউলী তার সঙ্গে এমন সুরে কথা বলেছে যেন সে একটা আনাড়ী বালক ছাড়া কিছু নয়। কুণ্ঠা সঙ্কোচশূন্য সহজ ব্যবহার, কিছুটা অবজ্ঞাসূচক, যেন মহলশুকা খনির ট্রাক ড্রাইভার তার হুকুমের গোলাম।

এই তো সেদিন সন্ধেবেলার কথা। হঠাৎ ডেকে বলল, ও ড্রাইভার, দুটো মহুয়ার

বোতল এনে দাও তো।

অনুরোধ নয়, হুকুম। ভেতরে ভেতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলেছে, মহুয়া কি হবে? এই তো সেদিন বিলিতি এনে দিলাম।

বাবুর শখ, দিশি খাবে। যাও এখন, খুঁজে নিয়ে এসো।

বিক্রম কিন্তু তক্ষুণি-তক্ষুণি নড়েনি, নড়তে পারেনি। তার চোখজোড়া কখন অজান্তে ওর দেহের ওপর। ওর শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পেঁচিয়ে ছিল চমৎকার একটা প্রিন্টেড শাড়ি। শরীরের যেখানে যেটুকু অনাবৃত অংশ সেখান থেকেই যৌবন ঢেউ ভাঙছে। পুরুষের সেই মুগ্ধ চোখের পূজা কোন নারীরই না চেনার কথা নয়। বে-শরম হাসিতে ছটফটিয়ে উঠেছিল মউলী—কি এত দেখছ গা? আ, আমার কপাল! আমি বলি বুঝি আমার ওপর বাইরের বাবুদেরই নজর। তুমি তো শুনি ভালমানুষ। শেষকালে তোমার চোখেও রঙ ধরল? আমাকে সাঙা করো না। বউ সাজতে বড্ডো ইচ্ছে করে গো!

সেই প্রখর বিদ্রূপ কানে বিষ ঢেলে দিয়েছিল বিক্রমের। পালাতে পথ পায়নি। পিছন থেকে কানে ভেসে এসেছিল উচ্ছল ভঙ্গিল হাসির স্রোত।

কলকাতার এক দোস্ত—সে লিখিপড়ি আদমি, বলত, বুঝলি বিক্রম, সভ্য মানুষ হল শের-এর জাত। যেখানে গেছে সেই জায়গাটাকেই খারাপ করে দিয়েছে। ওদের শুধু আছে লোভ আর ভোগ। নিঃশ্বাসে আছে বিষ, দুনিয়ার সব ঠাঁই সে বিষে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়া জানা বন্ধুর সব কথা সে ঠিক ঠিক বোঝেনি তখন। বুঝতও না এই জঙ্গলে না এলে। এখন বুঝেছে সভ্য মানুষদের থাবার নখে কতখানি বিষিয়ে গেছে এই জঙ্গল দুনিয়া। বুঝেছে খনি মালিকদের পায়ের ছাপ পড়ার আগে এই জঙ্গল ছিল পবিত্র মন্দিরের মত। স্বাধীন একদল বনচর বাস করত এখানে, তাদের জীবন ছিল এখানকার পাহাড়-গাছগাছালির মতই নিষ্কলুষ। তারপর একদিন অরণ্যের ঘুম ভেঙে গেল শহর থেকে বয়ে আনা যন্ত্রের কোলাহলে। একদল ধূর্ত ভদ্রবেশধারী লোক কেমন করে যেন বুঝে গেল এখানকার পাহাড়ের ভাঁজে মুখ লুকিয়ে আছে কুবেরের রত্নাগার। গাছপালা কেটে পাহাড় ফাটিয়ে ধরিত্রীর গর্ভ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হতে লাগল ধাতুপিণ্ডের ভ্রূণ। সভ্যতা-যন্ত্রের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হল অরণ্যবাসীদের। স্বাধীন জীবন আটকা পড়ল খনি শ্রমিকের শেকলে। তারা পেল অর্থ আর বিলাসিতার স্বাদ। এলো ক্রীশ্চান মিশনারীরা। ঈশ্বর-পুত্র যীশুর মন্ত্রে দীক্ষিত হল বাস্তব কিছু সুবিধাভোগের শর্তে। সর্ব অর্থেই তারা হল স্বধর্মচ্যুত। মউলীর মত অজস্র মেয়েরা হারিয়ে ফেলল নিজেদের শহুরে বাবুদের আনন্দলীলার উৎসবে।

ঝোপড়ির অন্ধকারে, নিদ্রাহীন শয্যায় ভেসে চলে বিক্রম বিরতিহীন। হঠাৎ তার খেয়াল হল একটা বিনিদ্র রাত্রি উপহার দিতে চলেছে সে এমন একজন রমণীকে যার জন্য সে কিছু করতে পারবে না। সমস্ত দেশের খনি অঞ্চল জুড়ে এমন কত মউলী সভ্যতার বর্বর আকর্ষণে তলিয়ে যাচ্ছে তার কি ঠিক ঠিকানা আছে? কি সে করতে পারে মউলীর জন্যে? না, মেয়েটার জন্যে তাকে বোধ হয় ছেড়ে যেতে হবে এই এলাকা। এভাবে সে থাকতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে সে। চিরকাল তো সে ভেসে বেড়ানো মানুষই। আবার না হয় ভেসে পড়বে। জীবন মানেই তো ভেসে চলা, বেড়িয়ে বেড়ানো।

বিক্রম সেই ধাঁচের মানুষ যারা চলে নিজের খেয়ালে এবং নিজের খেয়ালের ওপরও যাদের কোন হাত নেই। ওই যে হঠাৎ একরাতে তার মনে হয়েছিল সুন্দরগড়ের জঙ্গলে আর নয়, সেটা শুধু মনে হওয়াই নয়, সে স্থিরই করে ফেলল অন্য কোথাও চলে যাবে। মউলীই এর একমাত্র কারণ তা নয়, আসলে মানুষটাই বন্ধনহীন। তার এই সিদ্ধান্তে কেউ কেউ আশ্চর্য হল, কেউ কেউ তার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে উপহাস করল। কিন্তু বিক্রম তার সিদ্ধান্তে অটল। সে যাবেই।

সময়টা তখন ফাল্গুনের শেষ। বনভূমি সেজেছে নতুন সাজে। মহুয়া গাছে বোল ধরেছে, শালেরা ছেয়ে গেছে নবমঞ্জরীতে। সেই শেষ ফাল্গুনে কি যেন একটা উৎসব ছিল আদিবাসীদের। আশপাশের মুণ্ডাপল্লী থেকে উদ্দাম মাদলের আওয়াজ ভেসে এসেছে দুরন্ত বসন্ত বাতাসে। বিক্রম তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে এসেছে ঝোপড়িতে। মনটা ভারাক্রান্ত। দু-একদিনের মধ্যেই সে চলে যাবে এখান থেকে। জায়গাটা তার বড় ভাল লেগেছিল। বুকে তাই একটা ভার চেপে আছে। খনি কর্মীদের সবাই ঝেঁটিয়ে চলে গেছে উৎসব দেখতে, কেবল সে একলাই ঝোপড়িতে শুয়ে আছে বিষণ্ণ অন্ধকারে। একটু তন্দ্রামত এসে গিয়েছিল বোধ হয়। তন্দ্রাটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল দরজা ধাক্কায়।

কে? বিরিজলাল নাকি?

না, আমি। দরজা খোল। .....দরজার ওপাশে চাপা ফিসফিসে একটা গলা।

বিরক্ত বিক্রম দরজা খুলে একেবারে যেন জমে পাথর হয়ে গেল। বাইরের আলো-আধাঁরির মধ্যে যে দীর্ঘ নারীদেহটা দাঁড়িয়ে হাজারটা মেয়ের মধ্যে পলকপাত মাত্রেই তাকে চিনে নিতে পারে সে। ওই তরঙ্গিত দেহ-ভাস্কর্য চাপা দেওয়ার মত অন্ধকার আসেনি দুনিয়ায়। বিস্মিত বিক্রম কি বলবে ভেবে পেল না।

মউলী হাসল অস্ফুট—কি গো ড্রাইভারবাবু, বোবা হয়ে গেলে নাকি! একটা মানুষ এলাম, ঘরে বসতেও বলবে না?

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে বিক্রম বলল, এসো।

ঘরে ঢুকে মউলী তক্তপোষে জাঁকিয়ে বসল। বিক্রম কুপী জ্বালাতে যাচ্ছিল, মউলী বলল, থাক। চাঁদের আলো আছে কিছুটা, ও-ই বেশ।

বিক্রম অস্বস্তিভরে বলল, এত রাতে কি মনে করে?

মউলীর গলায় হাসির ছোঁয়া—ইচ্ছে হল, চলে এলাম। আসতে নেই নাকি?

ঝোপড়ির ভেতরের কটু ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে সস্তা স্নো-পাউডার আর ফুলের গন্ধ নাকে এলো বিক্রমের। আলো-আঁধারিতে সঠিক ঠাহর করতে না পারলেও সে বুঝল মউলীর অঙ্গে মোহিনীর সাজ। মাথার ভেতরটা ওর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল। মতলব কি এই ছলনাময়ীর?

পরব দেখতে গেলে না যে ড্রাইভারবাবু?

সম্বোধনের নতুনত্বটা কানে গেল বৈকি বিক্রমের। ড্রাইভার নয়, ড্রাইভারবাবু! মেয়েটা এত রাতে তার সঙ্গে তামাশা করতে এলো নাকি?

ইচ্ছে করল না। ....সহজ গলায় বলল বিক্রম।

তুমি নাকি চলে যাচ্ছ এখান থেকে?

হ্যাঁ। ভাল লাগছে না এখানে আর।

আমি জানি কেন তুমি চলে যেতে চাইছ।

তাই নাকি? কি বল তো?

আমি জানি আমাকে ঘেন্না কর তুমি। সেই ঘেন্নাতেই—ঠিক কিনা বল? তুমি চলে যেও না ড্রাইভারবাবু।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল বিক্রম। মউলীর গলার সুরটা অন্য রকম লাগছে। ব্যথিত, বিষণ্ণ। তবু সে ভেতরের ফেনিয়ে ওঠা ভাবাবেগ দমন করল, না, যেতে আমাকে হবেই। একটা কথা বলি, হয়তো তার সময় হবে না। তুমি ভুল রাস্তায় চলেছ, ও রাস্তা ছেড়ে দাও।

মোহিনী মেয়েটার গলা হঠাৎ যেন কান্নায় বুজে এলো—আমারও খুব খারাপ লাগে ড্রাইভারবাবু। কিন্তু কি করব? আমার ফেরার রাস্তা কোথায় বলে দাও। দাগী মেয়েকে কে ঘরে নেবে?

বিক্রমের সহসা মনে হল এ মেয়েটা সাংঘাতিক অভিনেত্রী। তাকে নিয়ে একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের খেলা খেলতে আসেনি তো। সে যাক্, এ নিয়ে কিসের ওর এত মাথাব্যথা। এত রাত নিশুতি, একলা এক যুবকের ঘরে এক যুবতীর অভিসার, মানেটা জলের মত পরিষ্কার। সবাই যাকে নিষ্কলঙ্ক বলে জানে তার নামের গায়ে একটা কালো চিহ্ন এঁকে দিতে চায়। অকস্মাৎ রূঢ় গলায় সে বলে উঠল, রাত দুপুরে

নাটক করতে এলে নাকি? যাও, চলে যাও বলছি।

কঠোর আঘাতটা সামলে নিতে একটু সময় গেল বোধ হয়। তারপর ফোঁপানো গলায় বলল, যাব? আমার যে কথা ছিল ড্রাইভারবাবু। আমি যে—

না, কোন কথা নয়। তুমি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

হ্যাঁ, তাই।

যেন কত শান্ত ভঙ্গীতে উঠল মউলী। যেন সে অন্তবিহীন রৌদ্রের পথ হেঁটে এসে একটা ছায়াতরুর নীচে বিশ্রামশয্যা রচনা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেউ তাকে বিতাড়িত করেছে। হয়তো অন্ধকারে আরো কিছু না-বলা বাণীর আক্ষেপ ওষ্ঠ স্ফুরিত করেছিল তার, কিন্তু সে কেউ দেখল না। তার দীর্ঘ আবছায়া শরীরটা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমের মনের অন্ধকার দিগন্তে এই অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণটা বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল। মনে হল মউলী অভিনয় করতে আসেনি, এসেছিল তার বিরাট বুকের ছায়ায় আশ্রয় খুঁজতে। আর বুঝল, ঘৃণা নয়, সহানুভূতি নয় মউলীকে সে ভালবাসে, অসম্ভব ভালবাসে! কীষ্ট-দুষ্ট হলেও ও তার পূজাব ফুল।

সুন্দরগড় ছেড়ে আর যাওয়া হল না মহলশুকা মাইনসের ট্রাক ড্রাইভার বিক্রম পাণ্ডের। এখানকার পাথুরে মাটি আর সুনিবিড় অরণ্যের প্রেম তো ছিলই, তার চেয়ে গভীরতর এক আকর্ষণ—এক নারীর অশ্রুভেজা আকুলতা বন্ধনহীন মানুষটাকে বেঁধে রাখল চিরকালের জন্যে।

# প্রতিচ্ছায়া

গায়ে জড়ানো ভিজে গামছাটা খুলতে খুলতে গৌরী বলল, 'কালীপুকুরের জলটা বেশ ঠাণ্ডা। তাই ওখানে চান করতে যাই। কিন্তু আর ওখানে যাব না মা।'

সন্ধ্যামণি শুধলো, 'কেন রে?'

'ওখানে বড় ছিনেজোঁক।'

সন্ধ্যামণির ভুরু কুঁচকে উঠল, 'এই গরমের দিনে জোঁক!'

'ওদের গরম-বাদলা নেই। আজ নিয়ে তিন দিন। ওই অম্বিকে পাছাল—'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল সন্ধ্যামণির, 'কি করেছে পাছালের পো?'

'চান করছিলাম, লোকটা আড়াল থেকে দেখছিল।'

'সত্যি বলছিস? দেখতে ভুল হয়নি তো?'

গৌরী প্রথমে হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। তারপর মুখে বলল, 'না।'

'ঠিক আছে। দেখছি ব্যাপারটা। আস্পর্ধা কম নয় তো! উচিত শিক্ষা দিয়ে দোব। দেখে নিস।'

গৌরী ভয় পাওয়া সুরে বলল, 'ওসবে কি দরকার মা? পাঁচ কান হবে। বদনাম ছড়াবে। লোকটার সঙ্গে বয়সের অনেক তফাৎ যে! কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। সবাই আমাকে দুষবে।'

সন্ধ্যামণি উত্তর দিল না। ওর ঠোঁটে একটা ফিকে হাসি লেগে আছে। গৌরীর যা বয়স তাতে ওই রকম রহস্যময় ফিকে হাসির আড়ালে সবসময় একটা মানে থাকার কথা। কিন্তু মানেটা ঠিক আঁচ করতে পারছিল না সন্ধ্যামণি। সে জরিপ-করা চোখে মেয়ের উন্নত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়ের চোখেমুখে চটক আছে, ছিরিছাঁদ আছে, স্বীকার না করে উপায় নেই। নিটোল দুটো গাল বেয়ে ননীর মতো নরম ঢল নেমেছে। টানা ভুরু, চোখের নিচেটা ভাসাভাসা। ঠোঁটের গড়নও ভারি মিষ্টি। নদীর ধারের রাঙা মাটির মতো গায়ের রঙ। চাবুকের মতো ছিপছিপে ছটফটে

আর টান-টান শরীর। সন্ধ্যামণি মনে মনে স্বীকার করল এ-শরীরের দিকে চোখ পড়লে মুনিরও জপতপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের লোকেরও মাথা ঘুরে যেতে পারে। আশ্চর্য কিছু নেই। তবু অম্বিকা পাছালকে 'নাই' দিয়ে লাভ নেই, একটু সমঝে দিতে হবে।

হঠাৎ মায়ের দিকে চোখ পড়াতে গৌরী বুঝতে পারল মা ওকেই দেখছিল। আবদার মাখানো গলায় বলল, 'আমার বয়সে তুমিও দেখতে শুনতে ভাল ছিলে, সবাই বলে। এখনও ভাল আছ। শুধু একটু মোটা হয়ে গেছ, এই যা। মোটা হলে আমিও তোমার মতো হয়ে যাব, তাই না মা? 'একটু থামল গৌরী। দম নিল। তারপর বলল, 'আচ্ছা মা, তোমার নাকি অম্বিকা পাছালের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল?'

'কে বলেছে এসব?' সন্ধ্যামণির গলায় জননীসুলভ সুর বাজল, 'কোত্থেকে শুনলি?'

'মালতী বৌদি বলছিল।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল। তারপর নামো গলায় বলল, 'সত্যি নয়?'

'ওসব উড়ো কথায় কান দিও না। মানুষ কেচ্ছা বানাতে পারলে আর কিছু চায় না।

সন্ধ্যামণির রান্নাবাড়ার কাজ বাকি ছিল। মা চলে গেলে গৌরী নিজেকে নিয়ে পড়ল। ভিজে কাঁপড় ছাড়তে ছাড়তে সে মিনিট কুড়ি আগেকার সময়টাতে ফিরে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে ও কালীপুকুরে চান করতে যাচ্ছিল। বেশ একটেরে পুকুরটা। মূল সড়ক থেকে একটা চোরারাস্তা বেরিয়ে এসে কালীপুকুরে পড়েছে। পাড়ে ঘন গাছগাছালি। পুকুরটা ছোট কিন্তু গভীর। ভাঙাচোরা একটা ঘাটলা থাকায় গভীরতা অসুবিধের সৃষ্টি করে না। গভীরতা আর ছায়াময়তা মিশে কালীপুকুরের জল গরমের দিনেও হিমশীতল। চারপাশের নির্জনতাটা উপরি পাওনা। মাঝেমাঝে বাতাস উঠে জলের শরীরে বিলি কাটে। তখন ঢেউ ওঠে। ঢেউ না থাকলে জলের স্বচ্ছতা শাপলা ডাঁটার মূল পর্যন্ত যেন উদোম করে দেয়। এমন জলের আরশিতে গৌরীর মতো অষ্টাদশী তার কুমারী-শরীরের ছবি দেখতে ভালবাসবে, এতে আর আশ্চর্য কি! গৌরী তাই দেখছিল। সতেরো পার হবার পর গৌরী মনে মনে পৃথিবীর সব বয়স্কা রমণীর সমবয়সী। এখন সখীদের সঙ্গ তার বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। সে মাঝে মাঝে একলা হতে চায়। আর সেইজন্যই তার নির্জন কালীপুকুর বেছে নেওয়া। কিন্তু সে কি করে বুঝবে ডাগর-ডোগর রূপসীরা যেখানে যায় সেখানেই নির্জনতার সুর কেটে যায়।

গোরাপানা রঙ বলে ওর নাম গৌরী। তা নিরিবিলি আর পাখির শিস দেওয়া আমেজী দুপুরে কালীপুকুরের ঠাণ্ডা জল তুলে নিয়ে খোলা ঘাড়ে, মুখে, নগ্ন বাহুতে মলমের মতো করে মাখাচ্ছিল, তারপর হঠাৎ চোখ তুলেই একেবারে ফ্রিজ শটের

নমুনা। পরিষ্কার বুঝতে পারল পুকুরের ওপারের লতাপাতাঘেরা বেড়াটার আড়াল থেকে কে যেন তাকে দেখছে। খানিকক্ষণ চোরা চোখে সেদিকে চেয়ে রইল। মানুষটাও ওদিকে অনড়। কিন্তু তার অস্তিত্ব ঠিকই টের পায় গৌরী। মানুষটা কে তাও টের পায়।

না, কোনো ছেলেছোকরা নয়। লোক অম্বিকা পাছাল। চল্লিশ পার হয়ে গেছে লোকটার। পাঁড়মাতাল। কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না। জমিজিরেত কিছু আছে, বসতবাড়িটাও মন্দ নয়। কাজকর্ম না করেও কোনোরকমে চালিয়ে নেয়। সাতসকালেই দু'পাত্তর চড়িয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোয়। তারপর টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। দু'একদিনের জন্যে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যায় মাঝেমাঝে। বাড়িতে ওর চাল এবং চুলো দুটোরই অভাব নেই, তবে স্বভাবটাই ওরকম। থিতুস্বভাবের লোক না। জীবনে ওর নাকি দুঃখবেদনা আছে। তবে সেটা ঠিক কি তা ও মুখ খুলে কাউকে বলে না। পাড়ার অল্প-সল্প লেখাপড়া-জানা বউঝিয়েরা আড়ালে বলে, দেবদাস পাছাল। তা সে যাই হোক, এ কেমন লোক বাপু যে ওর জ্বালায় গৌরী তার অষ্টাদশী শরীরটাকে তারিয়ে তারিয়ে দেখতে পারবে না জলের আয়নায়! ভীষণ, ভীষণ রাগ হয়ে যায় গৌরীর। চান মাথায় ওঠে। কোনোরকমে কাকচান সেরে দুপদাপ করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে। বাড়ি ফিরে মাকেও সব বলে। একটুও লুকোয় না। তারপর মা কাজে চলে গেলে গৌরী ভাবতে থাকে, —লোকটা দেখতে এখনও কিন্তু বেশ। চল্লিশ-পেরুনো বলে মনেই নয় না। মনে হয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। এত মদ খায়, অথচ শরীরটা এতটুকু টসকায়নি। অনেক কাঁচাবয়সী ছোকরার চেয়েও চেহারা ভাল। ওর সঙ্গে নাকি মায়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল! লোকে তো বলে। অবিশ্যি মা এ নিয়ে মুখ খোলে না। মায়ের সঙ্গে বিয়ে হলে এই লোকটাই হয়তো তার বাবা হত। কি জ্বালা! বাবার বয়সী লোকটার তার দিকে নজর! তবু রাগের ঝাঁঝটা কেন যে ফিকে হয়ে আসছে গৌরীর! কেন যে লোকটার ওপর রেগে থাকতে পারছে না!

মেয়ে যখন এদিকে এসব ভাবছিল তখন মায়েরও ওদিকে কাজে মন বসছিল না। সন্ধ্যামণি কুড়ি বছর আগে ফিরে গিয়েছিল, যখন ওর বয়স ঠিক আজকের গৌরীর মতন। তার জীবন-নাটকে অম্বিকা পাছাল এক সময় কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিল। অম্বিকা তখন বাইশ আর সন্ধ্যামণি সতের-আঠারো। বিয়ে হতে যাচ্ছে, ভেঙে গেল। অম্বিকা অপছন্দ করার মতো ছেলে ছিল না। দেখতে ভাল, বাড়ির অবস্থাও ভাল মোটামুটি। সামান্য লেখাপড়াও জানে অম্বিকা। সংসার ছিমছাম। সবই ঠিকঠাক, তবু বিয়েটা হল না। অম্বিকার নামে বদনাম রটেছিল। তাতে অবিশ্বাস করেনি সে। অমন কার্তিক-কার্তিক দেখতে ছেলের কারো খপ্পরে পড়া আশ্চর্য নয়। তারপর যার সঙ্গে

বিয়ে হল সেও গাঁয়েরই ছেলে। সে লোকটা বছর দুই হল চলে গেছে। সন্ধ্যামণির শাঁখা-সিঁদুরহীন জীবনে এখন সম্বল বলতে সংসারের দুঃখকষ্ট এবং গৌরী। এমন দুর্ভাগিনীর মেয়ের দিকে অম্বিকা পাছাল নজর দিতে যায় কেন? এক সময় ঘা খেয়েছিল বলে আজ কি লোকটা তাকে শাস্তি দিতে চায়? ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

সন্ধের ঘোর-নামা বাঁশবাগানের রাস্তা দিয়ে পাছালবাড়ি যেতে যেতে সন্ধ্যামণি নিজের মনটাকে শক্ত করে তোলার তালিম দিচ্ছিল। তার মিঠে গলায় যেন কড়া সুর বাজে। ভাগ্য ভাল, অম্বিকা বাড়িতেই ছিল। ওকে দেখে খুব একটা অবাকও হল না। দুয়োরে দাঁড়িয়ে উঠোনে প্রতীক্ষমানা নারীটিকে এক পলক তাকিয়ে দেখল, তারপর সহজ গলায় বলল, 'ভেতরে এসো। পিসি বুড়ো মানুষ, ঘুমোচ্ছে। বাড়িটা একটেরে। তোমার নালিশ কারো কানে যাবে না।'

ঘরের এককোণে পিদিম জ্বলছিল। ভেতরটা আলো-আঁধারি। তক্তাপোষে বসে আরাম করে পা ছড়িয়ে দিয়ে অম্বিকা বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন? ইচ্ছে করলে বসতে পার। অবিশ্যি চেয়ার-টেয়ার নেই, বিছানাতেই বসতে হবে।'

সন্ধ্যামণি বসল না। কঠিন গলায় বলল, 'নালিশ করতে এসেছি জানলে কি করে?'

হাসল অম্বিকা, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। না হলে মিছেমিছি আসতে যাবে কেন?'

সন্ধ্যামণি তর্কের দিকে গেল না। ভণিতা করবারও চেষ্টা করল না। সোজাসুজি বলল, 'মেয়েদের চান করার সময় কালীপুকুরে তুমি উঁকিঝুঁকি মার কেন?'

অম্বিকা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘাড় হেলাল, 'উঁহু মেয়েদের নয়। মেয়ের। তোমার মেয়ের। ওর নাম তো গৌরী, না? গৌরীই নিশ্চয়ই একথা বলেছে তোমাকে?'

'তবে কে বলবে? গৌরী কি বানিয়ে বলছে বলতে চাও?'

'না। যা সত্যি তাই বলেছে।'

'তোমার লজ্জা করে না মেয়ের বয়সী একটা মেয়ের দিকে নজর দিতে?'

'না। মেয়েদের দেখতে পুরুষ মানুষের ইচ্ছেই করে, লজ্জা করে না। চানের সময় ওদের দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে।' যেন বেশ মজা পেয়েছে, এরকম ভঙ্গিতে বলল অম্বিকা।

'লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের গা ধোওয়া দেখার বয়স আছে তোমার? তুমি তো আধবুড়ো।'

'তোমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে সন্ধ্যামণি। আমার দাঁত নড়েনি, টাক পড়েনি, চুলদাড়িও পাকেনি। বিয়ের বাজারে পাত্র হিসেবে এখনও দাম আছে। আঠারো-কুড়ির

মেয়েরও বোধহয় আমাকে অপছন্দ হবে না।'

'নোংরা। শয়তান।' সন্ধ্যামণি গোক্ষুরের মতো হিস হিস করে উঠল, 'তোমাকে বিশ্বাস নেই, সব করতে পার। কুড়ি বছর আগে পারুলের সর্বনাশ করেছিলে বলে যা রটেছিল তা মিথ্যে নয় তাহলে?'

অম্বিকাকে এবার একটু গম্ভীর দেখাল। বলল, 'ঘটনাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে, তাই না?'

'এখনও করি। মাতালদের অসাধ্য কি আছে?'

'এতদিন পরে এসব কথা বলে কি লাভ?'

'লাভ নেই। যা বলতে এসেছিলাম সেটাই বলে চলে যাচ্ছি। তুমি ওভাবে মেয়েটার দিকে নজর দেবে না।'

ফুর্তিবাজের মতো হাল্কা গলা করে অম্বিকা বলল, 'ওখানে চান বন্ধ করে দিলেই হয়। তোমার বাড়ি বয়ে তো আর নজর দিতে যাচ্ছি না। সেটা কোরো না মাইরি, তোমার মেয়েটা পাড়ার সবসেরা দেখতে।'

'ঠাট্টা থাক। শোন কালীপুকুরে ও যাবেই। পুকুরটা তোমার কেনা নয়।'

'রাস্তাঘাটও তোমার কেনা নয়। রাস্তা দিয়ে আমি যাবই। আর উঁকিঝুঁকিও মারব।'

'এই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'একসময় বিমুখ করেছি বলে বদলা নিতে চাও?'

অম্বিকা উত্তর দিল না। রসিয়ে রসিয়ে খ্যাঃ খ্যাঃ করে হাসতে লাগল। মুখে একটা থুৎকার দেওয়ার শব্দ তুলে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সন্ধ্যামণি। বাঁশবনের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে বলল, —'অলপ্পেয়ে পুরুষের জন্যে মেয়েরা পুকুরঘাটে যেতে পারবে না, মগের মুল্লুক নাকি? গৌরী কালীপুকুরে যাবে, যাবে, যাবে। দেখব পাছালের পো কি করে! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব না!'

পরপর গোটা চার সম্বন্ধ বাতিল হতে টনক নড়ল সন্ধ্যামণির। আজকালকার ফ্যাশান অনুযায়ী পাত্ররা নিজেরাই বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখতে এসেছিল। অন্তত দুটো ছেলে গৌরীর পাশে দাঁড়াবার মতন। সবারই গৌরীকে পছন্দ। কিন্তু গৌরীর কাউকে পছন্দ হলো না। আশ্চর্য। নানা ছুতোনাতায় কেটে দিল। এই ছেলেটা হাঁদার মতো, এই ছেলেটা মেয়েলি মেয়েলি, সেটা কাঠখোট্টা ইত্যাদি। এদিকে মেয়ে তো লম্বা লম্বা পা ফেলে উনিশের দিকে এগিয়ে চলেছে, শকুন-শেয়ালরা ওঁৎ পেতে আছে। মেয়েকে পরের ঘরে না পাঠালেই নয়। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে একদিন মেয়ের মুখোমুখি হল সন্ধ্যামণি। মা-মেয়ের মাঝখানে বাপের আড়াল নেই, সুতরাং যা কিছু

জিজ্ঞাস্য মেয়েকে সরাসরি শুধোতে হয়। সন্ধ্যামণি শুধলো, 'তোর ব্যাপারটা কি বলত? এতগুলো ভাল ভাল পাত্র এল কাউকেই মনে ধরল না। এর মানে?'

মাটিতে নখ ঘষতে ঘষতে গৌরী বলল, 'মানে তো আগেই বলেছি। এখন আমার বিয়ের চেষ্টা করো না মা।'

'এ আবার কি রকম কথা? আইবুড়ো থাকবি নাকি?' সন্ধ্যামণি শাণিত চোখে তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে, ওর মনের অলি-গলির খোঁজ নেবার চেষ্টা করল, 'তুই কৃষ্ণাদের বাড়ি টিভি দেখতে যাস। ওখানে তো অনেক ছেলে ছোকরার ভিড় হয়, না?'

'হ্যাঁ, হয়।'

'ওদের মধ্যে কোন ছোকরা? রতন, সুশান্ত, শ্যামল, মেনো?'

'ওদের কথা আসছে কেন?'

'ওদের কার সঙ্গে ফেঁসেছিস বল না।'

'ধ্যুৎ', কি যে আজে বাজে সব ভাবছ!' গৌরী অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল,'এখন আমার বিয়ের চেষ্টা তোমাকে করতে হবে না।'

কখনও রাগে গন্‌গনে আঁচ হয়ে, কখনও গলা খাদে নামিয়ে, কখনওবা গলা নামিযে, আবেগে মেয়েকে অনেক বোঝাল। কিন্তু কঠোর-কোমল সংলাপে মেশানো সেই নাটকে গৌরী সবক্ষণ শ্রোতার ভূমিকার পালন করে গেল। সন্ধ্যামণি ওর মুখ থেকে একটি কথাও খসাতে পারল না। ঘাড় শক্ত করে মাটির দিকে চেয়ে রইল। মেয়ের এই হাবভাবের নেপথ্যে কেউ একজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কে সে?

মেয়ে যেখানে যেখানে যায়, যার যার সঙ্গে মেশে—সব জায়গাতেই খোঁজ খবর নিতে কসুর করে না সন্ধ্যামণি। কিন্তু মেয়ের স্বভাব-চরিত্তির একেবারে সফেদ-সাদা, কেউ নিন্দেমন্দ গাইল না। অদ্ভুত কান্ড। কিন্তু সন্ধ্যামণি সব জায়গায় খোঁজ নিলেও এক জায়গায় খোঁজে নি। দরকার মনে করে নি। সে জায়গা তার হিসেবের বাইরে।

সে হিসাবটা কোন দিনই মিলত না। কিংবা যখন মিলত তখন সন্ধ্যামণির কিছু করার থাকত না। তার আগেই ঘটল ব্যাপারটা। গৌরী সেদিন পাশের গাঁয়ের পিসির বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়েছিল। রাতে বাড়ি ফিরবে না। সন্ধে তখন উৎরে গেছে বহুক্ষণ। সন্ধ্যামণি একলা। পাঁচিলের বাঁশে আগড়টা আগল-আঁটা। বাড়িতে কেউ নেই—এমন সময় কেউ যদি আগড়টা ধরে ঠেলা মারে তাহলে ওর ভয় পাবার কথা। ভয়-পাওয়া গলায় ও বলল, 'কে?'

'আমি অম্বিকা। দরজা খোল।' বাইরে থেকে সাড়া এল।

এক মুহূর্ত দ্বিধা। তারপর কুপী হাতে নিয়ে সন্ধ্যামণি দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি হঠাৎ?'

আম্বিকার লম্বা শরীরটা উঠোনে এসে দাঁড়াল। একটা পিড়ি টেনে নিয়ে দাওয়ায় বসতে বসতে বলল, 'গাঁয়ের লোক, চেনা মানুষ, এত ভয় পাচ্ছ কেন? নেশা করে আসিনি, নেশা করা ছেড়ে দিয়েছি। বুঝলে সন্ধ্যা, বড় কিছু ত্যাগ মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েই করতে পারে মানুষ। যেমন বিয়ে করলাম না একটি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। এই বয়সেও বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছিল তাও করব না—সেটাও এক মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে। বেচারা বড্ড ছেলে-মানুষ। বয়সের খুব তফাৎ।'

'কার কথা বলছ?' সন্ধ্যামণির গলায় তীক্ষ্ণ সুর বেজে উঠল।

আম্বিকা হাল্কা গলায় বলল, 'যে আমার মদ ছাড়িয়েছে তার কথায় বলছি।'

'সে কে সেটাই বল না।'

'শুনলে খুবই অবাক হবে। বিশ্বাস করতে চাইবে না। মন শক্ত করো, আমি গৌরীর কথা বলছি।'

'গৌরী! সন্ধ্যামণির গলা চিরে উঠে এল কথাটা, 'মিথ্যা কথা।'

'না সত্যি।' অম্বিকার গলা চড়ল না, বলল, 'গৌরী আমাকে বিয়ে করত চায়। আশ্চর্য, কি রকম যে মেয়েটা! বলতো ওকে আমার বিয়ে করা মানায়, না সাজে? একেবারে পাগলী।'

'তোমার-আমার সম্বন্ধ হয়েছিল, এসব জেনেও?'

'হ্যাঁ, ওসব ও জানে। ওটা ওর মনে দাগই কাটেনি। সত্যি একালে মেয়েরা বড় অদ্ভুত।'

'তোমার নামে যে বদনাম রটেছিল তাও ও জানে?

'জানে বৈকি। তবে বিশ্বাস করে না। ও যেটা বিশ্বাস করে তা এইরকম—পারুল মেয়েটা অন্য ছেলের সঙ্গে মিশে নিজের সর্বনাশ করে, সে ভেগে পড়ে। পারুল চেয়েছিল আমাকে বিয়ে করতে। আমি রাজি হইনি। তখন ওরা আমার নামে কেচ্ছা রটায়, আর এটাই সত্যি। গৌরী যা বুঝেছে আর একটি মেয়ে তা বোঝেনি, বিশ্বাসও করেনি। দুর্ভাগ্য আর কি!'

সন্ধ্যামণি ভাঙ্গা গলায় বলল, 'আর বলো না। তুমি এখন যাও।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছ? আরে তোমার তো আকুলি-বিকুলি করে অনুনয় বিনয় করার কথা। আমি জামাই হতে চাইলে সত্যিসত্যি তুমি আটকাতে পারবে না। তুমি আধবুড়ো ভাবলে কি হবে, তোমার মেয়ের চোখে বেশ ছোকরা।'

'সেই যে মাস ছয়েক আগে তোমার বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছিলুম তুমি তার

বদলা নিতে চাও?'

অম্বিকা জিভ কাটল, ছিঃ-ছিঃ। জিদ বজায় রাখতে কালীপুকুরের ধারে যেতাম। তাতেই তো ঝামেলাটা ঘটল। সেটাই বিচ্ছিরি অন্যায়। তার উপর আবার অন্যায় করব? কি যে বলো না! গৌরীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে আমি প্রায় পথে এনে ফেলেছি। মেয়েটা ভারী বাধ্য আমার। এখন ও বুঝতে পারে আমাকে বিয়ে করলে ওর নানা অসুবিধে। নিন্দে-ঠাট্টার চোটে গাঁয়ে থাকাই মুশকিল। একটা সুপাত্তর ঠিক করেছি, মেয়ে মোটামুটি রাজি।'

সন্ধ্যামণি লম্বা শ্বাস ফেলে বুকটা হাল্কা করল, 'এই যদি তোমার মনে ছিল তবে কালীপুকুরে উঁকি দিতে যেতে কেন?'

একটু চুপ করে থেকে অম্বিকা বলল, 'আমি যাকে দেখতে যেতাম তার নাম সন্ধ্যামণি। তুমি কি জানো গৌরীর বয়েসে তুমি অবিকল দেখতে ওই রকম ছিলে? প্রথম ওকে দেখেই চমকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন তুমি। সেই কাঁচা বয়সের তোমাকে দেখতেই লুকিয়ে চুরিয়ে যেতাম ওখানে। মাঝখানে গৌরী যে অমন ভুল করে বসবে ভাবতেই পারি নি।'

'সত্যি বলত ওকে ভালবাসনি?'

'ভাল আমি বরাবর একজনকেই বাসি। তার নাম সন্ধ্যামণি।'

এরপর দু'জনেই নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ কথা নেই। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অম্বিকা বলল, 'কিন্তু সে বোঝাটাও ইদানিং বড্ড ভারী-ভারী লাগে। দূরে গেলে বোধ হয় ভাল থাকব। শিগগিরই আসানসোলে চলে যাচ্ছি। ওখানে একটা কাজ পেয়েছি।'

'দেশ ছেড়ে দেবে?'

'ঠিক তা নয়। তবে আমি তো ভবঘুরে। আমার দেশ-বিদেশ সব এক। এখানে থাকতে ভরসাও হয় না। তুমি দেহ, গৌরী তোমার প্রতিচ্ছায়া। দুটোই কখনও চোখে পড়বে। তাতে ভারী কষ্ট। পালানোই ভাল। কখনও সখনও আসব। আচ্ছা, এখন চলি।'

'দাঁড়াও।'

অম্বিকা একটু আশ্চর্য হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর পায়ে সন্ধ্যামণির মাথাটা নত হয়। প্রণাম ভক্তিশ্রদ্ধার প্রকাশ। তবু হাত পায়ের ছোঁয়াছুঁয়িতে কেন যে দুটো শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তা কেউ ওরা জানে না।

আশাবরী

# হিমবাহ

গ্রীষ্মের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে ভাতঘুম দিচ্ছে আলতাপাটি গ্রাম।

পথঘাট ধু-ধু। জ্যৈষ্ঠের খর রোদ্দুরে বড় তাপ। চৈতি গাজনের সন্ন্যিসিদের ধুনি জ্বলছে যেন চারদিকে। ঘূর্ণি বাতাসে শুকনো বাঁশপাতা উড়ে বেড়ায় গগনে গগনে। মরা অশ্বত্থের ডালে বসে একটা কাক ডাকছে—কা-কা। উড়ন্ত চিল ভাসছে মহাশূন্যে। তাই দেখে কোন বালক যেন চেঁচিয়ে উঠল,—চিল.....চিল.....চিল্‌লো। গরমের দিনের ফসল-ক্ষেত থেকে শেষ চাষীটিও ঘরে ফিরে গেছে। এই নিস্তরঙ্গ-স্তব্ধ দুপুরে আলতাপাটি গ্রামের আঁখিপাতে নিদ নেমেছে।

কিন্তু নিদ নেই যোগেন কয়ালের বিধবা বউ মঙ্গলার চোখে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে বসে আছে রাস্তার ধারে, আমগাছের জালি-কাটা ছায়ার নিচে। চোখ দুটি তার গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের মতোই উদাস। কিংবা যেন খাঁ-খাঁ মরুপ্রান্তর। তার রুখু চুলগুলো ওড়াওড়ি করছে দামাল বাতাসে। চোখের তারকাযুগল স্থির। এক কেন্দ্রবিন্দুতে লগ্ন হয়ে আছে। অথচ এই অখিল চরাচরে সেই কেন্দ্রবিন্দু কোথাও নেই। আকাশ ও মাটির মধ্যবর্তী বিশাল শূন্যতায় নজর ছড়িয়ে দিয়ে অনড় পাথুরে মূর্তির মতো বসে আছে মঙ্গলাবউ। ওর সিঁথি পায়ে-চলা মেটে রাস্তার মতো সফেদ। কিন্তু পরনে জামা কাপড় চড়িয়ে, মঙ্গলা রাস্তার ধারে এসে বসেছে। দুপুর কখন বিকেলের দোরে পা দেবে, সূয্যি হেলে যাবে, তবু মঙ্গলা বসে থাকবে এক ঠাঁই। পাশে একটা শ্যাওড়া ডালের ছড়ি, সেটা সে মাঝেমাঝে ধুলোয় আছড়ায়। আর বলে, —ধিন তা ধিনা পাকা নোনা। কাকের ঘরে কোকিলছানা। বিলম্বিত লয়ে, একঘেয়ে সুরে কথাগুলো আওড়ায়। কখনও বলে, —খা, খা, খেয়ে নে। কখনও বা পাশ দিয়ে যাওয়া কুকুর-বেড়ালের দিকে হাতের ছড়িটা ছুঁড়ে দেয়। নিতান্ত অকারণে। বাচ্ছা মেয়ের মতো কখনও পা নাচায় শুধু-শুধু।

দুপুর ডাকে ঘুমের বিছানায়। নিদালি মন্তর ছড়ায়। সে মন্তর কাউকে কাউকে বশ

করতে পারে না। যেমন কালী ঠাকরুণ। চার কুড়ির ধারে কাছে বয়স। এখনও শক্তসমর্থ। বুড়ি এঁটো বাসন মাজতে নিত্যদিন পুকুরঘাটে আসে। মঙ্গলাবউকে নিঝ্ঝুম বসে থাকতে দেখে কাছে এসে বল,—ও খেপি, আজ যে ডুরে শাড়ি পরে এসেছিস! বিধবা মানুষের এসব যে পরতে নেই রে।

ঠাকরুণের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় মঙ্গলা। তারপর অগোছালো শাড়িটা সলজ্জ নববধূর মতো গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিতে থাকে।

ঠাকরুণ বলে,—মাথাটা একেবারে গেছে। কি ভাল মানুষই ছিল! সোয়ামি যোগেনটাও বড় ভাল ছিল। শয়তানরা শেষ করে দিলে লোকটাকে। ভগবানের বিচার নেই। এখন ওদের মেয়েটি ডাগর-ডোগর হয়েছে। এখন ওর ওপর না নজর পড়ে বদমাসগুলোর! তাহলে রক্ষে করার কেউ নেই। ও বউ, মেয়েটার দিকে নজর রাখিস, দিনকাল ভারি খারাপ।

মঙ্গলাবউ ফিক্‌ফিক্ করে হাসে। যেন ভেতরে ভেতরে ভারি মজা পেয়েছে। তারপর ঘস্‌ঘস্ করে পিঠ চুলকোতে থাকে। ঠাকরুণ রাগ করে বলতে বলতে চলে যায়,—কার সঙ্গে কথা কইব! এ কি আর মনিষ্যি আছে! কপাল, সবই কপাল।

মঙ্গলাবউয়ের কান আছে তবু শোনে না। নাক আছে গন্ধ পায় না। চোখ থেকেও দেখে না। ওর মাথার ওপর আমের শাখায় ঘুঘু ডাকে, চোখের সামনে রোদ নাচে, কানে গল্প কথা শুনিয়ে যায় আদ্যিকালের বাতাস, নাকে গন্ধ ঢেলে দিয়ে যায় জঙ্গলের ঘাস-পাতা-ফুল। মঙ্গলা সকল ইন্দ্রিয়ের দরজা এঁটে দিয়ে বসে থাকে নিশ্চুপ-নিথর।

দেখতে দেখতে রোদ মরে আসে। সেই সময় গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় এক ঝলক চলমান রৌদ্রের মতো কিংবা উজ্জ্বল এক পিত্তল কলসের মতো এক সঞ্চরণশীল কিশোরী মঙ্গলার পাশে এসে থামে। তার অঙ্গে অঙ্গে রূপ ঝলমল করে সোনালি জরির মতো। তার সাজসজ্জা নেই। বোধহয় সাজবার দরকারও নেই। সে না সেজেই সুন্দরী। সুবচনী, মঙ্গলার মেয়ে। বছর পনেরো ষোল হবে। কালী ঠাকরুণের মতো প্রবীণারা এমন মেয়েকে দেখেই বলে থাকে—'সোনার পিতিমে।'

তা সোনার পিতিমের দিকে ফিরেও তাকায় না মঙ্গলা। সুবচনীর মা অন্য কেউ হলে মেয়েকে দেখা মাত্র তার বুকের ভিতরে স্নেহরস গাঢ় হয়ে আসত। চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠত খুশির আবেশে। কিন্তু মঙ্গলার এসব কিছু হয় না। মেয়েকে আদিখ্যেতা দেখাতে তার ভারি বয়েই গেছে।

সুবচনী বলে, ওমা, আর কত বসে থাকবে? বাড়ি চলো। বেলা পড়ে এলো যে!

মঙ্গলা কথা বলে না। বসেও থাকে না। মেয়ের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।

আগে এরকম ছিল না মঙ্গলাবউ। যোগেন কয়ালের বউ হয়ে আসার সময় ও স্বাভাবিক ছিল। পুরোপুরি এক নারী ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত যথানিয়মে ঘরকন্না করেছে, সন্তান বিইয়েছে। পাঁচ সন্তানের মধ্যে দুটি মৃত। বছর সাতেক আগে এক অদ্ভুত অসুখে মঙ্গলা মরো মরো হয়। বেঁচে উঠল, কিন্তু তারপর থেকেই অস্বাভাবিক। এখন কাজ বলতে গুচ্ছের গুচ্ছের খাওয়া, রাস্তার ধারে গাছের তলায় বসে থাকা, নিজের মনে ক্বচিৎ কখনও বকা আর মাটিতে ছড়ি আছড়ানো। এখনও স্বাস্থ্য অটুট। বরাবরকার ভারী গতর একটুও টসকায়নি। হাল্কা-পলকা দু'তিনজন পুরুষ মানুষকে একাই থাবড়ে সিধে করে দিতে পারে। বড় মেয়ে সুবচনী মায়ের একেবারে উল্টো। ছিপছিপে, সিধে, সরু অথচ ভরাট। কোন পাকা কারিগর যেন মনপ্রাণ দিয়ে ছেনি-বাটালির নিপুণ প্রয়োগে ওকে বানিয়েছে। যোগেন কয়াল তার রূপসী মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছিল। সেই ভাবনা নিয়েই লোকটা নেই হয়ে গেল।

যোগেন বিছানায় শুয়ে মরেনি। বয়স হয়েছিল মাত্তর সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। এযুগে একটা মরার বয়স নাকি? তাকে মারা হয়েছিল। মার্ডার। বাড়ির কাছের মাঠে তার উপুড় হয়ে থাকা কাঠ-শক্ত শরীরটাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। চার অপরাধী ধরা পড়েছিল। তাদের শাস্তি হয়নি। আইনের কি সব ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে এসে তারা বুক ফুলিয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় এবং জঘন্য বদমায়েসির মতলব আঁটে।

যোগেনের লাশ দেখতে ভিড় হয়েছিল প্রচুর। দু'চারটে গ্রাম ভেঙে পড়েছিল। সেই ভিড়ে মঙ্গলাবউও ছিল। লাশের সামনে। গর্দানের রক্তাক্ত হাঁ-টাকে একবারটি হাত বুলিয়েও দেখেছিল। কিন্তু কাঁদেনি, বুক চাপড়ায়নি। সেই সফেদ প্রান্তরের মতো ধূ-ধূ চোখের জমি। শক্ত বোজা ঠোঁট। কুকুর ছাগলের বদলে একটা মরা মানুষ পড়ে আছে—এই যা ব্যাপার! অনেকে বলেছিল, —শক্ত জান বটে মেয়েমানুষের!

বাপের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে সুবচনী হাপুশ নয়নে কেঁদেছিল। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়েছিল মাঠের ঢেলা-ভরা জমিতে। লাশ ডিঙিয়ে তার দিকে নজর পড়েছিল অনেকের। ভিড়ের ভেতর কেউ বা ভদ্দরলোক, কেউ জন্তু-জানোয়ার। এক আকাশ আলোর নিচে ঠাকুর ঠাকুর মেয়েটাকে দেখে কারো কারো জিভে লালা নিঃসরণ হলে আশ্চর্যের কি আছে! অনেক মানুষই তো পোশাকে ঢাকা জন্তু। কালী ঠাকরুণ এসে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুবচনীকে। মানুষ কেমন জানোয়ার বুড়ি তার বয়স দিয়ে অনেক জেনেছে শুনেছে।

মঙ্গলাবউ বিধবা হয়েছে বছরখানেক হল। কিন্তু বিধবা হওয়াই বা কি, সধবা থাকাই বা কি! কেউ হয়তো শুধলো,—বউ, তোর মরদটা চলে গেল, মনে পড়ে?

মঙ্গলার না রাম, না গঙ্গা। সব হিসেবের বাইরে থাকা মঙ্গলা তখন হয়তো ছড়া

কাটতে শুরু করে,—ধিন্ তা ধিনা পাকা নোনা। কাকের ঘরে কোকিল ছানা।

যোগেনের এখন মরার কথা ছিল না। হাতুড়ির মতো কঠিন শরীর-স্বাস্থ্য। ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে ওর মাথা উঁচু। অথচ মানুষটা এমনিতে খুব নিরীহ। বাড়ির চারাগাছে মুখ দেওয়া ছাগল ছানাকেও কখনও লাঠিপেটা করেনি কিংবা ঢিল ছুঁড়ে তাড়ায়নি। কিন্তু চরিত্রটা ছিল খাঁটি ইস্পাতে তৈরি। কোনরকম অন্যায় সহ্য করতে পারত না। দুঃখীর পাশে এসে দাঁড়াবেই। কারো ওপর খামোকা কেউ ঝামেলা করছে—যোগেন ফুঁসে উঠবেই। সব সময় যোগেন বজ্জাতদের বিপক্ষে। এমন লোকের শত্রুর অভাব হয় না। যোগেনের অনেক শত্রু ছিল।

আলতাপাটি এমনিতে খুব সুন্দর গ্রাম। কিন্তু কালের হাওয়া ঢুকে সব জায়গাতেই তো বিষ ছড়াচ্ছে। আলতাপাটিই বা বাদ যাবে কেন? এখানকার ঐতিহ্যবাহী সুবাতাস বিষিয়ে দিয়েছিল কিছু নোংরা ছোঁড়া। ছ'মাসের মধ্যে দুটো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। নিমাই কাণ্ডারীর মেয়ে রুপু বাগনানের কলেজে পড়ে-টড়ে বাড়ি ফিরত একলা। সন্ধে পেরিয়ে যেত কোন কোনদিন। শীতকাল তখন, বেশ খানিকটা আগে সন্ধে হয়ে গেছে। বদমাইসরা তক্কে তক্কে ছিল। গ্রামে ঢোকার মুখে পোলতালায় বে-ইজ্জত হল সে।

দ্বিতীয় ঘটনা মাস তিনেক পরেকার। মাঝ রাত্তিরে প্রামাণিক বাড়ির মাঝ বয়সি বিধবাকে ঘরের হুড়কো ভেঙে টেনে নিয়ে গেল পাশের বাগানে। পরের সকালে তার ছিঁড়ে খাওয়া অচেতন শরীরটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। হুঁশ ফিরে পেয়ে সে গলায় দড়ি দেয়। রুপু কিংবা বিধবাটি শয়তানদের চিনতে পেরেছিল। তাদের নাম গোপন থাকে নি।

গ্রামের মানুষ চুপচাপ সব হজম করে গেল। কিন্তু যোগেন কয়াল তা পারল না। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়ে বসল। একাই চার-চারটে ছোকরাকে বেদম পিটিয়ে শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্ল্যাকলিস্টে নাম উঠে গেল যোগেনের। মরে গেল সে।

আজকাল নারীনিগ্রহ, খুন জলভাত ব্যাপার। ভাত খেয়ে হজম হতে যা দেরি, তার মধ্যেই মানুষ সব ভুলে যায়। কানাকানি, ফিসফাস, গুজব-আলোচনা—তারপর ব্যাপারটা বেমালুম চাপা পড়ে যায়। খুনীরা জেলে পর্যন্ত গেল না, হাজত থেকেই ফিরে এল। শুধু কিঞ্চিৎ পুলিশী হামলায় নিরীহ লোক নাজেহাল হল। লাভের মধ্যে দুর্বৃত্তদের বুকের ছাতি আরো খানিকটা বেড়ে গেল। তারপর আলতাপাটির কাজকর্ম চলতে লাগল চিরকালের নিয়মে। কিছু মানুষ জন্মাল, কিছু মরল। নিয়ম ও বে-নিয়মের নানা ঘটনার সুতোয় বোনা হতে লাগল বাংলার এক অজ পাড়াগাঁয়ের দিনগুলি।

মঙ্গলাবউ অতোশতো খবর রাখে না। সোয়ামির রক্তমাখা লাশ দেখে যার চেতনায় সাড়া জাগেনি; ঘাড়ে রামদা-র কোপ, মোটা গর্দান হাঁ-করা ফাটলের মতো দু'ফাঁক— তা দেখেও যার চোখে পলক পড়েনি, তার কিসে কি যায় আসে!

শাশুড়ি চারুবালা সে-কথাই বলে,—অমন সা-জোয়ান মানুষটা দু'হাত দূরে পড়ে। মাগীর চোখ কিনা গ্রীষ্মকালের মাঠের মতন ধূ-ধূ। একবিন্দু চোখে জল নেই। যার শেষ কথা হল, আমার যোগেন গেল। তার মেয়েটাও এবার যাবে। তাকে তোমরা বাঁচাও।

শুনে কেউ হাসে, কেউ অনুকম্পা দেখায়। সাত বাড়ি ঘুরে ঘুরে হা-ক্লান্ত বুড়ি ঘরে ফিরে কপাল চাপড়ে নিজের মনে বলতে থাকে, —কার কাছে না গেনু? ওই বুধো বক্সী, ইস্কুল মাস্টার গো, পায়ে পড়তে শুধু বাকি রেখিছি। পাজিদের নাম করে বললুম,—আমার যে সব্বোনাশ হতে চলল গো মাস্টার। তোমরা না দেখলে কার পাশে গিয়ে দাঁড়াই! তা মাস্টার বললে, —কি করবো পিসি! যাদের নাম করলে ওরা সব নামী-দামী মানুষের ছেলে। থানা-পুলিশ তাদের কথা শোনে। যোগেনদার ব্যাপারে কত চেষ্টাই তো করেছিলুম, কিছুটি হল না। ওই একই সুর গাইলে রামা মাখাল, সন্তোষ হাজরা, নতীশ খামরুই। সব্বাই। তা হ্যাঁ লা মঙ্গলাবউ, তুই কি শুধু গুচ্ছের খেতেই আছিস! তোর গায়ে তো অনেক খ্যামতা। একবার তো এক ধান চোরকে চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে মুখে রক্ত তুলে দিয়েছিলি। তোর সেই জোর গেল কোথায়? মেয়েকে আগলা তুই। বলতে বলতে বুড়ি চুপ মেরে যায়। বোধহয় খেয়াল হয় মানুষকে নয়, নিতান্ত গাছ-পাথরের কাছে বকে মরছে।

কয়ালদের এই একটেরে বাড়িটা সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও দুশো হাত দূরে। যোগেন কয়ালের বাপ জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলায় হেরে, ভিটে থেকে উৎখাত হয়ে, দূরে গিয়ে বাড়ি করছিল। এ বাড়ি তেমন গোছানো নয়। এক সময় পাঁচিল ছিল চারপাশে। সেটা ধুলিসাৎ হয়ে যাবার পর আর পাঁচিল ওঠেনি। এখন বাড়ির কেমন ন্যাড়াবোঁচা দশা; তিনখানা মেটে ঘর। কোন্ মান্ধাতার আমলের কাঁঠাল কাঠের দরজা এখন ঝরঝরে। সপাটে দুটো লাথি কষালে কাঠের তক্তা আলগা হয়ে ছিটকে যাবে। এমন বাড়িতে দোরের বাইরে যেতে ভয় করে। উঠোন তো নয়, ফাঁকা মাঠ। সেখানে রাতবিরেতে সত্যিকার শেয়াল-কটাসেরাও নির্ভয়ে এসে হাজির হয়। আর মানুষ-শেয়ালদের অগম্য স্থান তো কোথাও নেই। এই ছিরিছাঁদহীন বাড়িতে সুবচনী হেন রূপের ডালির ভরসা কোথায়?

ভরসা নেই। সুবচনী বড় ভয়ে আছে। রাবণ সদৃশ বাপটার কথা মনে পড়ে।

দরাজ স্বাস্থ্য ছিল, আর তেমনি রাশভারী। কথা যেন বাঘের হুঙ্কার। তা সে লোকটাকে তো শেষ করে দিলে। ঠাকুমা বুড়ি মানুষ, তার কি-ই বা করার আছে! ভরসা বলতে মা। কিন্তু মা তো থেকেও নেই। মাকে জড়িয়ে ধরে অন্ধ আবেগে সে বলতে গিয়েছিল, —মা, আমার বড্ড ভয় করছে। মা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, —ছুঁস না ছুঁস না আমাকে। দূর হয়ে যা।

তবু দিন কেটে যায় দিনের মনে। চাঁদ-সূর্য কাজ করে যায় চিরকালের নিয়মে। সূর্য অভয় দিয়ে যায়, চাঁদ ভয়ের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। মানুষের আদিম অভ্যাসকে উস্‌কে দেয় নক্ষত্রেরা। কয়ালবাড়ি ছাড়া আলতাপাটির আর সব বাড়িতে রাত মানে তাসপাশা, গপ্পোগাছা, রেডিও। শুধু কয়ালবাড়ি মানে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী। সুবচনীকে পাঁজর-ওঠা বুকের নিচে পাখি-মায়ের পক্ষপুটের শাবকের মতো জড়িয়ে ধরে যোগেন কয়ালের জরতী জননী তিমিরবিনাশী সূর্যোদয়ের প্রার্থনা করে। সুবচনীর ভাইয়েবা পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমোয়। সবশেষের ঘরে এক বোধ-চেতনাহীন অথচ সচল রক্তের প্রাণী কি যে করে শুধু সে-ই জানে। এমনিভাবে রাত কাটে। সকাল হয়। আবার রাত নামে।

সেই রাতটাও এল। খুব খারাপ রাত।

খারাপ রাত মানে আঁধারের রাত নয়। এমনিতে বেশ পরিষ্কার রাত, জ্যোৎস্না ছিল। আলোয় ধুয়ে যাচ্ছিল চারদিক। বন-মাঠ থেকে ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক বয়ে আনছিল বাতাস। কিন্তু জ্যোৎস্না শুধু আকাশ কিংবা পৃথিবীর সৌন্দর্য বাড়ায় না, মানুষকে নানা সুলুক-সন্ধানে সাহায্য করে। পাপীদের মনে কুমন্তর ঢালে। আবার এমন মিঠে রাতে মানুষের নিদ্রা গাঢ় হয়।

তাই সেই হাওয়া, জ্যোৎস্না ও সুগন্ধের রাতে কখন যে আলতাপাটির তিন মস্তান কয়াল-বাড়িতে ঢুকল, যোগেন কয়ালের বুড়ি মায়ের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল এবং ঘরের সেরা সম্পদটিকে লুঠ করে বাইরে নিয়ে এল তা কেউ খেয়াল করেনি। বুড়ির খেয়াল হল কোল শূন্য হবার পর। কিন্তু খেয়াল হলেও পাঁচাঙুরে বুড়ি কি-ই বা করতে পারে! তাকে চুপ করিয়ে রাখার পক্ষে একটা 'চু-উ-উ-প' শব্দের ছোবলই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু এই শব্দের ছোবলে কাৎ হবার নয় এমন প্রাণীও কয়াল বাড়িতে ছিল। যে জান্তব অভ্যাসের সঙ্গে নিদ্রা নামক বস্তুটি জড়িত সেই নিদ্রার মায়াতেই আচ্ছন্ন ছিল সে। তথাপি ক্রম-পরম্পরা কিছু শব্দ ও অস্ফুট মানবকণ্ঠের চিৎকারে তার ঘুমের ভিৎ টলে গেল। আর একপ্রকার নিদ্রাচ্ছন্নতার ঘোরও কেটে গেল তার। একদা সে আলোর জগতের অধিবাসিনী ছিল। চোখের সামনে শাবককে টেনে নিয়ে গেলে

অজা-জননীর আর্তনাদ তার অজানা নয়। সে আর্তনাদ তার কানে গেল সহসা। আলোর বৃত্তে মুহূর্তেকের জন্যে ফিরে এল মঙ্গলা। তার গলা ফাটিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানি, ভাষাহীন অবরুদ্ধ আক্ষেপ।

ঘরের হুড়কো সে দেয়নি, বহুদিন দেয় না। দরজা খুলে বাইরে এল নক্ষত্র খসে পড়ার গতিতে। হাতে একটা ভোঁতা কাটারি। চাঁদের আলোয় বাড়ির উঠোন ধব্‌ধব্ করছে। তিনজনে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার জঠরে লালিত শাবককে। উঠোনের ওপারেই, একটু দূরে, শুরু হয়েছে কালকাসুন্দের জঙ্গল। সেখানে পৌঁছাতে পারলে চমৎকার জমে উঠবে মাংসাশীদের ভোজসভা।

কিন্তু জমে উঠার সুযোগ হল না। হিমবাহ্ এখন আর জমাট বেঁধে নেই। গলে গিয়েছে তুষারপুঞ্জ।

আলতাপাটি গ্রাম এক ভয়ঙ্কর সকালের মুখ দেখল। গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে কয়ালবাড়িতে। রক্তাক্ত উঠোনে পড়ে আছে একটা লাশ। তার গর্দান আধা আধি ফাঁক। ভোঁতা কাটারির কোপে গোটাটা কাটেনি। মাথাও প্রায় চৌচির। সবারই চেনা লাশ। গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপুত্তুর। বছর খানেকের ভেতর আলতাপাটিতে যেসব খারাপ ব্যাপার ঘটেছিল তার প্রত্যেকটার সঙ্গে জড়িত ছিল। দুষ্টচক্রের মাথা ছিল সে। এখন এক আকাশ আলোর নিচে পড়ে আছে উপুড় হয়ে।

ইতিমধ্যে সদলে এসে গিয়েছিলেন দারোগামশাই। অবাক চোখে লাশটাকে দেখছিলেন। যোগেন কয়ালের খুনের তদন্তে ক'মাস আগে এসেছিলেন। যোগেনের দশাসই শরীরটা মাঠের মধ্যে পড়েছিল উপুড় হয়ে। ঘাড় প্রায় দু'ফাঁক। সেই একই ছবি—শুধু স্থান ও ব্যক্তি ভিন্ন।

মঙ্গলাবউ নিথর বসেছিল লাশের পাশটিতে। শান্ত, অভিব্যক্তিহীন। রক্তমাখা কাটারিটা পড়ে আছে কাছেই। দারোগা বললেন,—তুই-ই তাহলে খুন করেছিস?

মঙ্গলাবউ হাতদুটো দারোগার দিকে বাড়িয়ে দিল। বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'মেয়ের ধর্ম্ম নষ্ট করতে এসেছিল।' এই বলে আবার সে ডুবে গেল এক আঁধার জগতে। গলিত তুষার জমাট বেঁধে গেল আবার।

**নবনক্ষত্র**

# মানস সরোবর

'জানোয়ার কোথাকার।'

কথাগুলো সুলতার ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে এল। চাপা তিক্ততায় গলার ভেতরটা জ্বালা করছে। চড়া সুরে সরগম সাধলে তার গলাটা মাঝেমাঝে একরকম জ্বালা করে ওঠে। তার ইচ্ছে করল শব্দদুটো সে মুদারা কিংবা তারায় তুলে নিয়ে প্রতিটি ইঁটকে শিউরে দেয়। কিন্তু কোন ভদ্রমেয়ের পক্ষে সেটা অসম্ভব। রাগে তার মুখ খানা তেকোণা হয়ে উঠল।

বনমালী নেমে যাচ্ছে সিড়ি দিয়ে। খাড়াই লম্বাটে শরীরটা স্থির রেখার মতো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সুলতা আনিচ্ছাসত্ত্বেও তার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকল। বনমালীর ঘাড়টা ঠিক গোলাল নয়, কঠিন আর চওড়া। কাঁধদুটো কীলকের মতো সামান্য উঁচু হয়ে আছে। চোয়ালের ওপর মাংসের প্রলেপ ঈষৎ অসমান। বনমালীর ঘাড় কাঁধ ও বুকের গঠনে শিল্পকর্মের কিছু অভাব। তবে লম্বা ঘন চুলের বাহারটা দেখতে ভালই। সুলতা নাক কোঁচকাল। তার মন ভাল থাকলে বনমালীর দোষগুলোকেই শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত না। ইচ্ছে থাকলে অ্যাপোলোর চেহারাতেও গাদা গাদা খুঁৎ বের করা যায়।

'বাবু চললেন রাজ্য জয় করতে।' অবজ্ঞাভরা চোখে বনমালীর সঞ্চরণশীল মূর্তিটার দিকে চেয়ে অস্ফুট উচ্চারণ করল সুলতা। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বনমালীকে কোথাও যেতে দেখলেই এই কথাগুলো বলে থাকে সে। কাঁধে ওই শান্তিনিকেতনী ব্যাগখানা ঝোলালেই বনমালীর চেহারাখানা কেমন বদলে যায়। ওর মুখে তখন একটা আত্মতৃপ্তি আর গর্বের জলুস ফুটে ওঠে যে দেখে মনে হয় সত্যিই তার ব্যাগের মধ্যে যেন একটা গুপ্ত কোষাগারের দুর্লভ দলিল বা ওই রকম কিছু আছে। অথচ সুলতা ঠিকই জানে ব্যাগটার ভেতরে গোটাকতক বাজারচলতি ম্যাগাজিন, একখানা নোটবুক আর গুটি তিনচার গল্পের স্ক্রিপ্ট ছাড়া কিছু নেই। বনমালী সম্ভবত মনে করে তার পাজামা-

পরা চেহারায় কাঁধে একখানা ব্যাগ চাপালেই তাকে একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবানের মতো দেখায়। হয়তো নিতান্তই এটা সুলতার ধারণা, কিন্তু এটা মনে হলেই অসম্ভব রাগ চড়ে যায় তার।

সুলতা ইচ্ছে করে বনমালীর সামনা সামনি পড়তে চায় নি। এই না চাওয়ার পেছনে তার সুস্পষ্ট বিরাগ আছে। বিরাগের পিছনে সঠিক কারণটা কি সুলতারও দুর্বোধ্য, কিন্তু সেটা আছে। আর কারণটা যতখানি আবছা, বিদ্বেষটা ততখানি প্রবল। অবশ্য এই মুহূর্তে তার রাগের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। একেবারে উড়িষ্যার মন্ডনশিল্পের নমুনাটি হয়ে বন্ধু অজিতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তৈরী হয়ে সবে সে সিঁড়ির মুখে এসেছে, অমনিই কি বনমালীর বাইরে যাবার দরকার পড়ল! কোন কোন লোকের মুখ দেখলে নাকি যাত্রা নাস্তি। বনমালীর মুখের মূল্য নির্ণয়ে সুলতা এই প্রবাদটাকে অবিশ্বাস করে না। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কিছু জরুরী কথা নিয়েই চিন্তা করছিল। এমন সময় পেছনে বনমালীর স্পর্ধিত পায়ের শব্দ বেজে উঠল। সুলতার মুখ ফিরিয়ে তাকানোর মধ্যে কি প্রত্যাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল নিজের অজান্তে? তার চোখে নিপুণ কাজলরেখা, মুখে হাল্কা প্রসাধন, দেহে মেয়েদের এক জনপ্রিয় শাড়ি। রাস্তায় নামলে হাজারটা চোখের চাউনি তার পুজো করবে, অথচ বনমালী একটা জীবন্ত ভাস্কর্যের জন্যে একপলক তাকানোকে দৃষ্টির বাজে খরচ বলে মনে করল! যে পুরুষ কোন রূপসী মেয়ের জন্য কাতরতা দেখায় না তাকে ব্রুট ছাড়া কি বলা চলে? লোকটা একটা ব্রুটই বটে। অথচ বাবু নাকি সাহিত্য করেন! ছো!

সেই যেদিন হাওড়া স্টেশনে শুভদৃষ্টি, অনিচ্ছে থাকলেও বাবার সঙ্গে যেতে হয়েছিল স্টেশনে, সেই দিন থেকেই, বলা চলে সেই মুহূর্ত থেকেই, তার মনটা লোকটার ওপর বিরূপ। বোধহয় অদেখা আগন্তুক সম্পর্কে তার প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবের মিল হল না বলেই এই মানসিক প্রতিক্রিয়া। বাংলাদেশের এত অজস্র রূপবান তরুণদের একজন হতে কি আপত্তি ছিল লোকটার! সেদিন বনমালীর আগাগোড়া চেহারাটা ছিল ছন্নছাড়া ভবঘুরের। সজ্জিত যৌবনের ওপর সে কি ভীষণ অবঁজ্ঞা ওর সারা অস্তিত্বে! আচ্ছা, পাজামা আর সস্তা হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী পরে কেউ পিতৃবন্ধুর বাড়ি আসে! খুঁজলে হয়তো ওগুলোর ভেতর ফুটোফাটাও মিলতে পারত। স্বাস্থ্যের ঔদ্ধত্যে ওর চেহারাটা অবশ্য পুরুষালিই, কিন্তু তার ওপর নরম লাবণ্যের ছাপ বড়ো অল্প। সেদিন ওর মুখখানা ছিল আত্মমগ্ন, চোখ দুটো নিস্পৃহ। ওর চোখমুখের ভঙ্গী যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে ও এমন একটা জগতের লোক যেখানে সামাজিক জীবনের নিয়মকানুনগুলো একেবারে অচল। বাবাকে প্রণাম করেছিল বটে, তার ভেতর দায়সারা ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্ট। অথচ তার মতো একটা মেয়ের বাবার পায়ে প্রণাম

করতে পেলে হাজার হাজার যুবকের বর্তে যাওয়ার কথা। সুলতার মনে হচ্ছিল এখানে আসার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তার একবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে নেওয়া উচিত।

এরকম একটা উটকো ঝঞ্ঝাট বাড়িতে জোটাবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না তার। বাইরের একটা লোক মানেই হাজারো ঝামেলা। একটা লোকের ধড়ে অন্য লোকের মুণ্ডু খাপ খায় কি? সাধ্য মতো বাধা দিয়েছিল সে, বাবা কানেই তুললেন না। কে এক পরেশবাবুর উদার দাক্ষিণ্যের রীতিমতো এক মহাভারত শুনিয়ে দিয়ে বললেন, 'পরেশের ছেলে আমার সাহায্য চাইছে আর আমি তাকে ফেলে দেব! জানিস, পরেশের ঋণ অপরিশোধ্য! ছেলেটা যদি তার বাপের সিকিগুণও পায় তাহলে সে একটা ছেলের মতো ছেলে, বুঝলি? আর সে তো পেইং গেস্ট হয়ে আসতে চাইছে, আমাদের বোঝা হয়ে নয়—তাহলে আর আপত্তি কিসের?'

কৌতূহল চাপতে না পেরে সুলতা শুধিয়েছিল, 'ভাল চাকরি পেয়ে আসছে বুঝি?'

'না, না, চাকরির খোঁজেই আসছে।'

'তাহলে পেইং গেস্ট মানে—'

'ডিগ্রীটা ভাল আছে। টিউশানি-টানি করবে যদ্দিন চাকরি না পায়। কি সব লিখেটিখেও নাকি কিছু পায়।'

'অ।' সুলতার কৌতূহল ততক্ষণে নিভে এসেছে।

তারপর বনমালীর আসার পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেল। দোতলার সর্বদক্ষিণের ঘরটাই ছেড়ে দেওয়া হল। ওটা এ-বাড়ির সবচেয়ে লোভনীয় ঘর। জানলা খুলে দিলেই পার্কের গাছপালা ও অনেকখানি আকাশ চোখে পড়ে। ভাল আলো-বাতাস আসে। ওটাই ছিল সুলতার গান সাধার ঘর। বন্ধুবান্ধব এলে গল্পগুজবের আসরও বসত ওখানে। এই কলকাতা শহরে একখানা নিরিবিলি আলোহাওয়া-লাগা ঘর একান্ত নিজের করে পাওয়া বড়ো অল্প কথা নয়। ওই উটকো আপদটার জন্যে সে-সুখও হারাতে হল। ঘরের শোকে তার সঙ্গীত চর্চায় ভাটা পড়েছে।

কিছুদিন পরে নলিনাক্ষবাবু মেয়েকে শুধিয়েছিলেন, 'কিরে, ছেলেটাকে কি রকম মনে হচ্ছে?'

'ছাই। সহবৎ জানে না। কৈলাসের মৌনীসাধু হওয়া উচিত ছিল।'

'কম কথা বলে বুঝি? প্রথম প্রথম হবে ওরকম, পরে ঠিক হয়ে যাবে। এতদিন মফস্বলে কাটিয়েছে তো, কলকাতায় ছিল একসময়, তাও হস্টেলে। ফ্যামিলিম্যানদের বোধহয় ভয় পায়।'

'কেন, ফ্যামিলিম্যানরা কি বাঘসিংগি?'

'তুই ক্ষেপে আছিস দেখছি।'

ক্ষেপে যাবার সংগত কারণ অবশ্য আছে, বাবাকে সে কথা বলেনি সুলতা। একরকম লঘু আগ্রহ নিয়ে সুলতা ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে গিয়েছিল—তার বদলে যা মিলল তার বিশুদ্ধ বাংলা নাম অবজ্ঞা। এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা, এইরকম ভদ্রতাসম্মত প্রশ্নচ্ছলে কর্তব্য করতে যাওয়া আর কি! কিন্তু লোকটা কি আগে স্যাকরার কাজ করত! নচেৎ উত্তরগুলো অমন সূক্ষ্ম আর নিক্তিমাপা হয় কি করে? আর সামান্য কিছু আগ্রহ খরচ করলে কি ক্ষতি হত ওর? সে যেন ওর কাছে একটা পোকায় কাটা মলাট ছেঁড়া বই। মেঘের আকাশের প্রতিচ্ছবি হয়ে সুলতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

এটুকুই সব নয়, আরো আছে।

বনমালী আসার পর দোতলার শেষকোণার ঘরটাতেই সে গানবাজনা করত। সেদিন বেশ বাতাস ছিল, গোল চাঁদটা হাসছে আকাশে, বারান্দার টবে ফুল ফুটেছে, —মানে, বেশ মন-কেমন-করা সন্ধ্যা। কেমন একটা আবেশভরা মন নিয়েই গীতবিতান খুলে বসেছে সুলতা, এমন সময় টুটুল ঘরে এল। তার মুখখানা শুকনো, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। 'দিদি' বলেই সে ডুকরে উঠল।

ভাইয়ের কান্নাভরা মুখ দেখে সে গান থামাল।

'কিরে, কি হয়েছে?'

'বনমালী দা—'

'কি?'

'বনমালীদার ঘরে গেছলুম। লিখছিল। তোমার গান ওঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল। বললুম, জানেন, দিদি চমৎকার গান গায়।' বনমালীদা কি বললে জানো? বললে— তোমার দিদিকে চেঁচাতে বারণ করে দাও। আমার লেখার অসুবিধে হচ্ছে।'

টারবাইন মেশিনের কানফাটা শব্দের মতো কথাগুলো কানে ঢুকল সুলতার। বুকের ভেতর প্রলয়ের আগুন দাউদাউ করে উঠল বুঝিবা। তারপর কখন যে সে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার সৌজন্যের সমস্ত কানুনগুলোকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বনমালীর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে, খেয়ালই হয়নি। তার ধৈর্যে এতবড় ধ্বস আর কখনও নামেনি।

'টুটুলকে কি বলেছেন আপনি?' ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ে সুলতা।

তার ঝড়ের মতো ঢুকে পড়া এবং প্রশ্নের বিস্ফোরণ—সবটাই এমন অসংবৃতভাবে আক্রোশপূর্ণ যে যে-কারোরই চমকে ওঠার কথা। কিন্তু বনমালীর মনের ছাঁচটাই বুঝি আলাদারকম। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য তার মুখে, আস্তে আস্তে কলমটি টেবিলে রেখে

সহজগলায় বলল, 'কি বলেছি বলুন তো! দারুণ আপসেট মনে হচ্ছে আপনাকে!'

'টুটুল কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে গিয়েছে জানেন?'

'ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। সত্যিসত্যিই আমার লেখার অসুবিধে হচ্ছিল। লেখার জন্যে নির্জনতা দরকার।'

'আপনার লেখার সুবিধে অসুবিধে নিয়ে আমরা চিন্তায় মরে যাচ্ছি, ভাবেন নাকি? আমি নাকি গান গাই না, খালি চেঁচাই—বলেছেন আপনি?'

'দেখুন, কথাটা খুব মিষ্টি করে বললেও গলাটা আপনার পাল্টাত না, পাল্টাত কি?'

'ভারি আপনি গানের সমঝদার, না?'

'সে দাবী আমার নেই, তবে আমাদের বাড়িতে গানের চর্চা ছিল।'

'চুলোয় যাক। কিন্তু আমাদের বাড়িতে বসে আমাকেই অপমান করবেন, এ কিন্তু চলবে না।'

'মানে আপনাদের বাড়িতে থাকব অথচ আপনারই গানের সমালোচনা করব, এ দুটো একসঙ্গে চলবে না, কেমন?

বনমালী হাসে, 'চলে যাবার সময়ও আমার ধরণা বদলে যাবার কারণ নেই কিন্তু।'

'আপনি একটা অসভ্য, আনসোশ্যাল, হার্টলেশ। আপনি—'

তীব্র অপমানের ব্যথায় আর কথা সরেনি সুলতার মুখে। তারপর একছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। অমন মধুর সন্ধ্যার ওইরকম বেদনাদায়ক স্মৃতি আর দ্বিতীয় নেই তার জীবনে। অতঃপর বনমালী রয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু দোতলার দুটো ঘর হয়ে রইল যেন উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ।

........হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চটকা ভাঙল সুলতার। ইস, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ভাবছে সে! তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

সুলতা আস্তে আস্তে টের পেল একটা অপচ্ছায়া তার জীবনকে ঘিরে ধরছে। কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পেত তার মুখে ইদানীং একটা আবছা গাম্ভীর্যের পর্দা পড়েছে। মনটাও তার সবসময় মেঘলা হয়ে থাকে। আর্শিতে মুখ দেখলে নিজেই চমকে চমকে ওঠে। কেমন মমির মুখ বলে মনে হয় নিজের মুখটাকে। সুলতা অবশ্য কোনদিনই খুব লঘু মেয়েদের দলে পড়ে না, কিন্তু হাসি-উচ্ছ্বাসে তার ঘাটতি ছিল না কোথাও। এখনও অবশ্য সে সবই করে —গল্পগাছা, বইপড়া, গান গাওয়া, ছবি দেখতে যাওয়া— কিন্তু সবকিছুই নিছক যান্ত্রিক। এগুলো থেকে কিছুটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেও বলা চলে। ঘরের কোণটিই এখন তার প্রিয় সঙ্গী। চেহারাটাও

অবশ্যই কিছু বদলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চাপা অসুখে ভুগছে সে। একেই কি মরবিড হয়ে যাওয়া বলে? এর জবাব তার নিজেরই অজানা।

বনমালীর ওপর তার আচরণটাও রূঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। বনমালী মাঝে মাঝে রাত করে বাড়ি ফেরে। একদিন একটু বেশি দেরী করে ফেলেছিল। বাড়িতে একটা চাকর, সে ঘুমিয়েছে। সুলতা একতলায় রাস্তার ধারের ঘরটাতেই শোয় বলে দরজা খুলে দেবার দায়িত্ব তারই। এমন কিছু বেশি রাত নয়—সাড়ে এগারো, সুলতাও কিন্তু ঘুমে বিভোর হয়ে যায়নি; দরজা সে খুলে দিল ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি কি মনে করেন আপনি যা-খুশি তাই করতে পারেন? এত বাতে বাড়ি ফেরে শুধু মাতাল আর জুয়াড়ীরা। আমাদের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে চিন্তা না হয় নাই করলেন, কিছুটা ভদ্রতা আশা করাও কি অন্যায়?'

বনমালীর নিরুত্তর মুখে একটা গভীর বিস্ময় থমথম করতে দেখেছিল সুলতা। কাউকে এরকম রূঢ় আঘাত দেওয়া তার চিন্তার বাইরে। কিন্তু ভদ্র মানুষ রূঢ় হলে রূঢ়তা তার সীমা হারায়। নাহলে সে বলে, 'দেখছেন কি, এখন দয়া করে যান। আমার ঘুমোবার দরকার আছে।'

'আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, না?' বনমালী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে কথাগুলো।

'কেন, পুজো করার কথা ছিল নাকি?'

বনমালী আর দাঁড়ায়নি। সুলতাও তারপর নিজের ঘরে এসে দরজা দিয়েছিল। বহুক্ষণ ঘুম নামেনি চোখে। সারা দেহ যেন জ্বরের জ্বালায় জ্বলছিল। আর ভাবলেও গা রী-রী করে ওঠে, রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল—একটা পুরুষের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে সে শুয়ে আছে। তীব্র আশ্লেষে তার রমণীদেহ যখন আতুর তখনও সে দেখল পুরুষটা বনমালী। স্বপ্নের অন্তর্নিহিত কারণটা চিন্তা করতে গিয়ে নিজের ওপর সে ক্ষমাহীন হয়ে উঠল। সকালে ঘুম ভাঙতে আর্শিতে নিজের মুখ দেখে মনে হল সারারাত সে একটা ডাস্টবিনে শুয়ে কাটিয়েছে।

স্নান সেরে সরাসরি সে বাবাকে গিয়ে বলল, 'ওই উটকো ঝঞ্ঝাটটাকে তাড়াও বাবা।'

'কার কথা বলছিস?' নলিনাক্ষবাবু বিস্মিত।

'কে আবার, তোমার ওই বন্ধুপুত্র।'

'সে কি করল আবার?'

'বাড়িতে বাইরের লোক জোটালে বাড়ির শান্তি নষ্ট হয় জান?'

'কিন্তু চাকরি-বাকরি না জোটালে—'

'সে চেষ্টা আছে ভেবেছ? একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত তো জুটতে দেখিনি কোনদিন।

কি সব ছাইভস্ম লেখে, তাই নিয়েই আছে।'

'অবুঝ হোসনা সুলতা, আরো কিছুদিন যাক।'

বাবার ওপর খানিকটা উষ্মা নিয়েই চলে এসেছিল সুলতা। কিন্তু অনেক ভেবেও স্থির করতে পারেনি বনমালীর আসল দোষটা কি। যাই হোক, মনের অস্থিরতায় তার শরীর খারাপ করছিল। এম, এ পরীক্ষার জন্যে কিছুটা বাড়তি ধকল গেছে। তাই নলিনাক্ষবাবু যখন কিছুদিনের জন্যে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বললেন সে বেঁচে গেল। গিরিডিতে পিসিমারা থাকেন। সুলতা একদিন গিরিডি চলে গেল।

ভেবেছিল ঘরের কোণ থেকে মুক্তি পেয়ে ভালই লাগবে। কিন্তু আশ্চর্য, এই বন-পাহাড়-নদী ঘেরা স্বপ্নময় দেশেও ভাল লাগছে না তার। অথচ সুলতা জঙ্গল-পাহাড়-নদী বরাবরই ভালবাসে। এবার তার উল্টো মর্জি দেখে পিসিমা খুবই অবাক। সুলতা না গেল পাহাড়ে চড়তে, নদীর ধারে শালের ছায়ায় পিকনিক করতে, না গেল পিসতুতো দাদার সঙ্গে অভ্রখনি দেখতে —কেবল ঘরের কোণে বসে ভাবল আর ভাবল। আর এইখানেই তার মনের চারপাশ থেকে কুয়াশার ঘন পর্দাটা উঠে গিয়ে অন্তরের প্রকৃত চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ তার বাড়ির জন্যে বড়ো বেশি মন কেমন করতে লাগল, আর এক মাসের বদলে এক সপ্তা গিরিডিতে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এল।

নলিনাক্ষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'হঠাৎ চলে এলি যে বড়ো?'

'ভাল লাগল না বাবা।'

'তোর শরীরটাও দেখছি সারেনি। বড়ো ভাবনায় ফেললি তো! এই সময়টায় তোর শরীরটা খুব ভাল থাকা দরকার ছিল।'

'কেন বাবা?'

'তোর একটা সম্বন্ধ এসেছে। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, চেহারা ভাল, বাড়ি আছে শহরে। খুবই সুপাত্র।'

সুলতার মুখে হাসি ফুটল না। তার নিঃশ্বাস যেন রোধ হয়ে এল। কোনরকমে বলল, 'আমি এখন বিয়ে করব না বাবা।'

মেয়েকে কেমন লাগল নলিনাক্ষবাবুর। সুলতা তো কখনও তাঁর ইচ্ছে অমান্য করে না।

'সে কি রে, এমন ভাল ছেলে—'

'এত তাড়াতাড়ি কিসের বাবা? একটা চাকরির চেষ্টা চলছে, পেয়েও যাব। দিনকতক তো একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াই। তারপর ভাবা যাবে।'

নলিনাক্ষবাবু হতাশভাবে ঘাড় নাড়লেন।

একটু ইতস্ততঃ করে সুলতা শুধোলো, 'সে কি চলে গেছে বাবা?'

'বনমালীর কথা বলছিস? ও গেলে সত্যিই তুই খুশি হোস?'

সুলতা যথাসম্ভব গলায় নিস্পৃতা বজায় রাখবার চেষ্টা করল, 'যায়নি যখন থেকে যাকগে। বাড়ি থেকে কাউকে চলে যেতে বলা সত্যি সত্যি ভাল দেখায় না।'

নলিনাক্ষবাবু খাবি খেলেন যেন। মেয়েটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে।

কিন্তু বনমালীকে যেতে বলতে হল না, একদিন নিজে থেকেই সে চলে গেল। এত নিঃশব্দে চলে গেল যে যাওয়ার আগে টেরটি পর্যন্ত পেল না। জানল সে নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেক দেরীতে। তিনি বললেন, 'ও চলে গেল রে।'

সুলতা বাস্তবিকই প্রথমে বুঝতে পারেনি, তাই শুধায়, 'কার কথা বলছ বাবা?'

'বনমালী।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ। অনেক অনুরোধ করেছিলাম, শুনল না। আমাদের ওপর অভিমান করেই ও চলে গেল সুলতা।'

অতি কষ্টে আত্মদমন করে সুলতা বলল, 'ও কি চাকরি পেয়ে চলে গেল বাবা?'

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নলিনাক্ষবাবু বললেন, 'সে তো তুই-ই ভাল জানিস।'

সুলতা তাড়াতাড়ি নলিনাক্ষবাবুর কাছ থেকে সরে এল। বাবার শেষ কথাটা তার কানে খুব বেজেছে। পায়ে পায়ে দোতলার সেই ঘরটিতে এল যেটা সেই উটকো ঝঞ্ঝাটটা এত দিন জুড়ে বসেছিল। অগোছালো লোকটার কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও এখানে ছড়িয়ে আছে। মেঝেয় কোথাও সামান্য কালি ছেটানো—পেন ঝাড়ার দাগ, দেওয়ালে পেনসিলে লেখা দু-এক ছত্র ইংরেজী বা বাংলা কবিতা কিংবা খুশখেয়ালের রেখাঙ্কন। সেইগুলো দেখতে দেখতে সুলতা একটা অদ্ভুতরকম আবেগ অনুভব করল।

ঘরের জানলাগুলো হাট করে খুলে দিতে এক ঝলক বাতাস ছুটে এল। চোখের সামনে অনেকখানি অনাবৃত আকাশের দৃশ্য। পার্কের সেই গুল্মোর গাছটায় হলুদ ফুলের থোকা ধরেছে। এই দৃশ্যটা সুলতার বড়ো প্রিয়। অনেককাল পরে ঘরখানি আবার নিজের করে পেল সে। এখানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করলে কিংবা গান সাধলে আর বাধা দেবার কেউ নেই। বহুকাল পরে হারানো মাণিক ফিরে পেলে যেরকম খুশি হবার কথা সুলতার কিন্তু সেরকম কিছুই হয় না। বুকটা শুধু তার খালি খালি লাগতে লাগল।

ঘরটাতে বসে প্রায় সারাদিন একটা স্বপ্নের ভেতর ডুবে রইল সে। তার মানস সরোবরে একটা হাঁসই সাঁতার দিয়ে বেড়াল। একটি নামই জপ করল সে সারাদিন।

মাঝে মাঝে অবশ্য ভাবান্তর ঘটল। জীবন তো কবিতা নয়। তাই কোথাকার এক অর্থবান এবং প্রিয়দর্শন চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এসে তার ভাবনার ছেদ ঘটাতে লাগল, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যে।

সন্ধে হতেই দোতলা ছেড়ে নেমে এল সে। নলিনাক্ষবাবু তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'একি চেহারা হয়েছে তোর? অসুখ করল নাকি?'

বাবার ব্যস্ততার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সুলতা শুধোল, 'বনমালীবাবুর ঠিকানাটা জান বাবা?'

সুলতা কোনদিনই বনমালীকে বোঝাতে 'ওই লোকটা' 'আপদটা' কিংবা 'উটকো ঝঞ্ঝাটটা' ছাড়া এমন ভদ্র সম্বোধন করেনি। নলিনাক্ষবাবু তাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তার ঠিকানার কি দরকার?'

'বলোই না।'

'জামতাড়া, বিহার।'

পরের দিন হাওড়া স্টেশনে সুলতাকে দেখা গেল। হাতে তার একটা চামড়ার সুটকেশ। কাঁধে ব্যাগ। বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরী হওয়ার মতো দেখাচ্ছে তাকে। এনকোয়ারিতে গিয়ে, আশ্চর্য, সে জামতাড়ার ট্রেনের সময় জানতে চাইল। ভারতবর্ষের এত জায়গা থাকতে জামতাড়াই সে কেন যাচ্ছে এর উত্তরটা তার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু আপাতত সে জামতাড়াই যাচ্ছে।

চিত্রপ্রভা

# সিদ্ধেশ্বরের উপাখ্যান

সিধু চোর তার পেশার হাতেখড়ি ঘটিয়েছিল শ্যালিকার রুপোর হাঁসুলি সরিয়ে। হাঁসুলিটা যে নিজেরই গিন্নির সহোদরার এটা অবিশ্যি তার জানা ছিল না। জানলে বউনির কাজটা অন্তত লোকটাকে কষ্ট দিয়ে করত না। ব্যাপারটা ঘটেছিল তার শ্বশুর বাড়িতে। শ্যালকের বাড়িতে বড় জামাই হিসেবে সিদ্ধার্থ হাজির। শ্বশুরবাড়িতে অনেকগুলো ঘর। তারই একটিতে নির্জন বিছানায় রুপোর হাঁসুলিটাকে সে অত্যন্ত উস্কানিমূলক ভঙ্গিতে পড়ে থাকতে দেখে। ডাগর মেয়ের ছলাকলায় জেগে ওঠা পুরুষের মতো রক্তে একটা প্রবল ঝাঁকুনি লাগে সিধুর। প্রথম পাপের ছোবল অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তার ভেতরটা বিষিয়ে দেয়। এবং হাঁসুলিটা মুহূর্তের মধ্যে বিছানা ছেড়ে তার ধুতির ট্যাঁকে আশ্রয় পায়। পরে, যথানিয়মেই বাড়িতে হইচই পড়ে যায়। ফিসফিস গুজগাজ আলোচনার মধ্যে অনেক নামই উচ্চারিত হয়, কিন্তু আসল চোরের নাম রয়ে যায় অনুচ্চারিত। হাজার হোক সিধু হল বাড়ির জামাই এবং তার চেহারাটার মধ্যে চোর-চোর গন্ধ নেই। বেশ ভব্যিযুক্ত চেহারা তার।

পরে নিজের কৃতকর্ম নিয়ে অনেক তোলা পাড়া মনে মনে করেছে সিধু। কিন্তু কেন সে এরকম একটা কাজ করতে গেল তার কোন সদুত্তর পায়নি। ব্যাপারটা আশ্চর্যের বৈকি। তার বাপঠাকুরদা ছিল বিশুদ্ধ ভালমানুষ। খাঁটি গব্যঘৃত। ভেজাল ছিল না একেবারে। তা বাদে সে নিজেও কারও কিছু সরায়নি আগে। গয়নাগাটি তো দূরের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা আচমকা ঘটার পর থেকে কি যে হল, চুরি তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। রাত হলেই সে যেন নিশির ডাকে ঘর ছাড়ে, ঘরে থাকলেই মন খুসখুস, মেজাজ খারাপ, শয্যাকন্টকী, শরীর ব্যথা, অম্বল। আর বেরোতে পারলেই শরীর ঝরঝরে, মন ফুরফুরে। এই নতুন কাজে সে এতদূর পাকা হয়ে উঠলো যে নিখিল বঙ্গ চৌর্যশিল্পী সম্মেলন ঘটলে তার ভাগ্যে একটা অভিনন্দনপত্র জুটত কিংবা সভাপতির পদ।

নিজের নেশা বা পেশার কথা বাইরের লোকের কাছে হয়তো গোপন রাখা যায়, কিন্তু ঘরের লোকের কাছে নয়। বউয়ের কাছে নিজেকে লুকোতে পারল না সিধু। সারাদিন দিব্যি গেরস্থ। জমিজমা, চাষবাস, তাসখেলা, ছিপ ফেলা নিয়ে থাকে। কিন্তু আঁধার নামলেই তার চাবুক খাওয়ার ছটফটানি। বউএর কাছে সে হাজারো সাফাই গায়, বৃথা যায় সে সব। বউ মাত্রই দার্শনিকের মতো সত্যদ্রষ্টা। ফলে সিধু ধরা পড়ে যায়। সিধুর বউ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার স্টাইলে 'আ-ছিঃ-ছিঃ' করে উঠেছিল কিনা কে জানে, তবে এটা ঠিক যে বউ বলে উঠেছিল, 'তাহলে ঝুমনোর হাঁসুলিটা তুমিই সরিয়েছিলে!'

সিধুর তখন বাংলাভাষা বিস্মরণ হয়েছিল।

নিজের পেশায় তুখোড় হয়ে ওঠার পর সিধু জেনে গেছে যে জগতের প্রায় সব লোকই কমবেশি অসৎ। ওই সূয্যি ভট্‌চাজের কথাই ধরা যাক না। বামুন পণ্ডিত। যজন-যাজন পুজো আচ্ছা নিয়ে থাকেন। দিব্যি ভাল মানুষ। সবাই ভক্তিছেদ্দা করে। একদিন পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন, সিধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ভট্‌চাজ হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন,—অমন হন্‌হন্ করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে সিধু? একটা কথা ছিল বাপ।

—আজ্ঞে, আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গেই।

—বলুন।

সিধু কাছে আসতে বাতাসেরও না কানে যায় এমনি চুপিচুপি, সূর্য্যি ভট্‌চাজ বললেন,—সামনের অঘ্রাণে মেয়েটার বিয়ে, গরীব মানুষ, দিচ্ছি কোনক্রমে। যোগাড়-যন্তর কিছু হয়েছে। পেতলের ঘড়াটা বাকি। দাম বললে সাত-আটশ টাকা। তা অত পাব কোথায়? তুমি বাপু জোগাড় করে দাও একটা। অমনি অমনি না, কিছু টাকা আমি দেব।

সিধু অবাক। কোনক্রমে বলল,—পিতলের ঘড়া আমি কোথায় পাব? আমার তো বাসন-কোসনের দোকান নেই।

ভট্‌চাজমশাই চটে কাঁই হয়ে বললেন,—মস্করা হচ্ছে? তুই কি করিস জানি না বুঝি? আমি কাকচরিত্র জানি, নখদর্পণ জানি, আয়নাভরণ জানি। আমার সঙ্গে চালাকি?

সিধুর এবার ভারী রাগ হয়ে গেল। বলল,—চালাকি আপনার সঙ্গে কখন করলুম? আর করবই বা কোন্ দুঃখে? আপনি মান্যিগন্যি লোক, আপনার সঙ্গে চালাকি সাজে? তা আপনি যখন অতশত জানেন তখন নিজেই যোগাড় করে নিন না।

এবার সূর্য্যি ভটচাজের স্বর তারা থেকে উদারায় নেমে আসে। খানিকটা খোসামোদের

ভঙ্গিতে বললেন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কেন ছলনা করছিস বাপ? একই গাঁয়ের লোক. কি করছিস না করছিস কানাঘুষোয় শুনতে পাই বই বৈকি। গরীবের মানটা রাখ বাবা, ঈশ্বর ভাল করবেন তোর।

শুনে একেবারে হাঁ হয়ে যায় সিধু। চুরি করলে ঈশ্বর তুষ্ট হন এরকম কথা সে শোনেনি কখনও। যাই হোক, মনে মনে সে ঠিক করে নেয় সূর্যি ভট্চাজকে নিরাশ করবে না। তবে লোকটাকে একটু বাজিয়ে নেবার ইচ্ছে তার হয়েছিল বৈকি। কাকচরিত্র নখদর্পণ—এসব ভণ্ডামি সে বিশ্বাস করেনি। সে যে রাতকুটুম, এটা যে কোন ভাবেই হোক জেনেছে লোকটা। সেটা না জানাতক তার সোয়াস্তি নেই।

—একটা কথা মন খোলসা করে বলুন তো ভট্চাজমশাই। না হলে আপনার ব্যাপারে আমি নেই।

—কি কথা বাপ?

—আমি কি করি না করি জানলেন কি করে?

—সে যে অতি গুহ্য কথা।

—বলবেন না? তা হলে—

গমনোদ্যত সিধুকে রুখতে ভট্চাজমশাই বলেন,—বলছি বাপ বলছি। কলসীটা আমার এক পুলিশ যজমানকে চেয়েছিলুম। তা সে বললে কি জানিস? বললে,—গুরুদেব আপনি সিধু ওস্তাদকে ধরুন। এ দিগরের গেরস্ত বাড়ির বাসন-কোসনের খোঁজ ওর মতো কেউ জানে না। কলসীর বরাত ওকেই বরং দিন। পেয়ে যাবেন। তা এই হচ্ছে ব্যাপার। তোর খবর আমি ওই পুলিশের কাছেই পেলুম। তারপর বুঝতে আর কি বাকি থাকে বল? গরীব বামুনের ঝামেলাটা মিটিয়ে দে সিধু, তাহলে তোর ব্যবসায় বাড়বাড়ন্ত হবে।

ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত হোক না হোক, বামুনের ঝামেলাটা মিটিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধেশ্বর; এক সপ্তাহের মধ্যে এক বড়সড় একটা পিতলের কলসী পেয়ে গিয়েছিলেন সূর্যি ভট্চাজ। পেয়ে বলেছিলেন, দিব্যি জিনিস। দোকান থেকে একটু মাজিয়ে নিয়ে এলেই একেবারে আনকোরা নতুন। এখন তো পয়সার টানাটানি সিধু, কদিন পরে আসিস।

সিধু অবিশ্যি যায় নি। গেলেও পেত না। তাহলেই দেখ অমন যে শাস্তর-জানা মানীগুণী লোক, তারও চরিত্রের কোন বালাই নেই। সিধু যদি চোর হয় তো সূর্যি ভট্চাজ দস্যি। সমাজে পরিচয় সাধু বলে অথচ আসলে অসাধু, এমন কত মানুষই যে দেখেছে সিধু তার ইয়ত্তা নেই। তাহলে চোর হয়ে তার মতো মুখ্যসুখ্যু লোক কি অপরাধ করল?

একবার অবিশ্যি সে চুরি নয়, জেনেশুনে ডাকাতি করতে গিয়েছিল এবং লজ্জার

একশেষ হতে হয়েছিল তাকে। ঝুমনো তার একমাত্র শ্যালিকা। এবং বিধবা। নিতান্ত অকালে তার কপালে পুড়েছে। বিয়ের পর দু'বছরও পোরেনি সিঁথির সিঁদুর মুছে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিল। বয়স বড় জোর তখন তেইশ চব্বিশ। এ বয়সে, এই ভরা যৌবনে, যোগিনী সাজার কথা তার মনে আসেনি, যোগিনী সেজে সে থাকতও না। বরং সাজগোজের দিকে বেশ ঝোঁকই ছিল তার। ঠাট্টামস্করাতে আসর জমাতেও তার জুড়ি ছিল না। হঠাৎ দেখলে মনে হত কুমারী মেয়ে। তার ঠোঁটে-চাউনিতে চিক্কুর খেলত। নদীর ধারের বেলেমাটি-পারা তার গায়ের রঙ্, নদীর জোয়ারের মতো তার চলাফেরা, বাতাস-বহা তড়াগের মতো ছলোচ্ছল তার কথা বলা। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে গতরের ঢল দেখে পুরুষের বুকে বাদ্যি বেজে ওঠে। খুশিতে হাসিতে কথাবার্তায় অষ্টপ্রহর যেন খোলায় ভাজা মুড়ির মতো ফুটছে। মা হলে হয়তো বদলে যেত মেয়ে। কিন্তু ঝুমনো তার স্বল্পস্থায়ী সিঁথি রাঙানোর জীবনে কোন সন্তান-উপহার পায়নি। এজন্যে তার যে কোন দুঃখবোধ আছে তাও তাকে দেখে মনে হয় না। তার মকর-গঙ্গাজলেরা কেউ কেউ আফ্‌শোষ করে বলত, —তোর সোয়ামি মিন্‌সেটা চলে গেল। তা গেলি গেলি, যাবার আগে বউয়ের কোলটা ভরে দিয়ে গেলি না কেন? খালি রেখে গেলি—এ তোর কেমনধারা আক্কেল? ঝুমনো তাকে শুধু মারতে বাকি রাখত। এইসব থেকেই সিধুর কেমন মনে হয়েছিল ঝুমনো খুব হাল্কা মেয়ে যাকে ইচ্ছে করলেই ঘন কবে কাছে পাওয়া যায়। আর সেখানেই সে একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছিল।

এক সন্ধেয় পুকুরে গা-ধোওয়া সেরে বাঁশবনের নির্জন রাস্তা দিয়ে ফিরছিল ঝুমনো। সিধু নিতান্ত অকারণেই, উদ্দেশ্যহীনভাবে, বেড়াতে ওদিকবাগে গিয়ে পড়েছিল। ঝুমনো পড়বি তো পড় তারই সামনে। রঙীন ভিজে গামছা তার গোলগাল অথচ আঁটোসাঁটো শরীরে সেঁটে গিয়ে বয়সকালের রেখাগুলোকে ভারি অর্থময় করে তুলেছে। কোমরে কলসী থাকায় দেহলতার মধ্যদেশে একটা বঙ্কিম বিভঙ্গ। বাঁশপাতা-চোঁয়ানো ছিলে-কাটা রোদ ওর মুখে-বুকে দপদপিয়ে উঠছে একবার, পর মুহূর্তেই গাছগাছালির নিবিড় বুনোটের তলায় ছায়া-সঞ্চারিণী। নেশা না করা সত্ত্বেও সিধুর চোখে কেমন নেশার ঘোর লেগে গেল। তার মনে হল স্বয়ং ব্রজনারী শ্রীরাধিকা যেন কালিন্দীতে গা-ধোওয়া সেরে ইতিউতি চাইতে চাইতে তার পরাণ বঁধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সিধুর কেমন বিভ্রম হয়ে গেল। সে আর শ্রীকৃষ্ণ কেমন একাকার হয়ে গেল। সামনে এসে সে খপ্ করে চেপে ধরল ঝুমনোর ডান হাতটা।

ঝুমনো কিন্তু নাগিনীর মতো ফোঁস করে উঠল না, কিংবা ঝট্ করে হাত সরিয়ে নিল না অথবা সিধুর গালে সপাটে একটা চড় কষিয়ে দিল না বা সোহাগে ঢলেও

পড়ল না। কেবল ভারি অবাক হয়ে চেয়ে রইল সিধুর দিকে। আস্তে আস্তে বলল, —জামাইদা, তুমিও! ছিঃ। .....চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল তার, —নিজের দুঃখ নিয়ে আছি। চাদ্দিকে শুধু শেয়াল-কুকুর-শকুন। তার ওপর তুমি নজর দিতে এলে! দিদি জানতে পারলে গলায় দড়ি দেবে। ভারি ভাল মেয়ে দিদি।

বহুকাল সেই ভারী গলায় নরম করে বলা 'ছিঃ, ছিঃ' ভুলতে পারেনি সিধু।

বরাবর সিদ্ধেশ্বর দেখে আসছে তার কপালটা খুব খারাপ। তার চেহারা দেখে কত যোগিনীর মন টলে যায় অথচ ঝুমকো তাকে পাত্তাই দিল না। লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক ছিল, গরীবদুঃখী বাপ তাকে পড়াতেই পারল না। প্রাইমারি ইস্কুলে বছর তিন গিয়ে সব চুকেবুকে গেছে। তার বিয়ের আগেই চার দিনের জ্বরে বাপটা চলে গেল। মা-বুড়ির শেষ দিকটায় কেমন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজে জ্বলে আর বউ-ছেলেকে জ্বালিয়ে এই বছর দুই হল বুড়ি মরেছে। এরপর কারো মনে সুখ থাকে? সিধু একমাত্র সুখ পায় যখন সে নিশি-পর্যটনে বেরোয় আর তার মহাবিদ্যাকে কাজে প্রয়োগ করে। রাত্রির সাম্রাজ্যে সে মুকুটহীন সম্রাট।

তার বউ-ভাগ্য অবশ্য নিতান্ত খারাপ নয়। কাজেকর্মে মন আছে, ছেনালিপনা জিনিসটা আদৌ জানে না, তার যত্ন-আত্তিও করে। দোষ তার ওই একটাই—তার সুপথে ফিরে আসার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করা। আর যাই হোক, বউয়ের কাছে আত্মগোপন করা স্বামীর পক্ষে তো সম্ভব নয়। বউ জানে সিধু চোর। তাতেই যত বিপত্তি। কান্নাকাটি, উপবাস, মুখভার, আরো কত কি!

তা এসব এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। ম্যাজিস্টরের বউরাও এমন করে থাকে। বউকে একরকম খ্যামাঘেন্নাই করে দিয়েছিল সিধু। সেই বউটা বলা নেই, কওয়া নেই দুম্‌ করে হঠাৎ একদিন মরে গেল। দুপুর বেলা পুকুরঘাট থেকে চান করে ফিরে, 'আমার বুকটা কেমন করছে গো' বলে, নেতিয়ে পড়ল মাটির মেঝেয়। তারপর ডাক্তার ডাকতে ডাকতে সব শেষ। গরীবঘরের মানুষেরা এমনি করে বিনা নোটিশে, পট করে মরে যায় সেটা হক কথা। তবে, সিদ্ধেশ্বরের ধারণা অনুসারে, সে নিতান্ত গরীব না। ব্যবসাপত্তর তখন তার ভাল করেই চলছে, গোলায় ধান আছে, হেঁসেলে ভাত-ব্যঞ্জনের অভাব নেই, বউয়ের নেমন্তন্নবাড়ি যাবার কাপড়ের অভাব নেই, ইচ্ছে করলে সোনার গয়না পর্যন্ত গড়াতে পারে, মেটে বাড়ি যে ইঁটের বাড়িতে চেহারা বদলায়নি সেটা নেহাৎ সিধুর গাফিলতির জন্যেই,—এমন সময় পাঁচ বছরের একটা মেয়ে রেখে বউটা বেমক্কা স্বগ্‌গে চলে গেল এতেই সিধু বেজায় অসন্তুষ্ট। এই কি মরার সময় বউয়ের! আর বিধাতা পুরুষেরই বা কি আক্কেল! বেশ একটা ধাক্কা লাগল সিধুর মনে। বউকে শ্মশানে রেখে এসে মনটা ভারি উদাস হয়ে গেল তার।

এই তো জীবন—মানুষ এই আছে এই নেই। তবে এত 'আমার', 'আমার' কি জন্যে। কার জন্যে আহা-উহু, রোজগারপাতি, খাটাখাটনি? সংসার যেন হাঁ করে গিলতে এল সিধুকে। যার সাত কূলে কেউ নেই বলতে গেলে তার কি জন্যে সংসারের মায়ায় জড়িয়ে থাকা? সিধু ঠিক করল সে বিবাগী-বৈরাগী হয়ে যাবে। নদের নিমাইয়ের মতো গৃহত্যাগ করবে কিংবা গৌতম বুদ্ধের মতো সংসার ছেড়ে যাবে। গাঁয়ের যাত্রা-থিয়েটার থেকে এসব বৃত্তান্ত তার ভালরকমই জানা। কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়েটা যে গলার কাঁটা! তাকে তো গাঙের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। তার একটা গতি করে যেতে হবে তো; হঠাৎ কেন যেন ঝুমনোর কথা মনে পড়ে গেল তার। ওর কোল খালি, মনেও দয়ামায়া আছে, দিদিকে ভালবাসতও খুব, —ওর কোলে মেয়েটা ভালরকম সেঁটে যাবে।

এইসব ভেবে, শ্রাদ্ধশান্তি, মিটে যাবার ক'দিন পরে, সিধু টাকাকড়ি সোনা-রুপো যা কিছু ছিল সঙ্গে নিয়ে, একদিন শ্বশুরবাড়িতে হাজির হল।

ঝুমনোকে বলল, —তোমার দিদি তো চলে গেল। এই গুঁড়োটাকে রেখে গেছে। কোথায় একে রেখে যাই, কে-ই বা মানুষ করবে? সব দিক ভেবে এখানেই নিয়ে এলুম। বোনঝিটাকে দেখো।

ঝুমনো বলল, —দেখব।

পাঁচ বছরের রোগা-প্যাংলা বোনঝিকে সে অপার মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরল।

সিধু সঙ্গের পুঁটলিটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, —এটা রাখো। কাজে লাগাবে।

—কি আছে ওতে?

—সামান্য টাকাকড়ি।

ঝুমনো হাত বাড়াল না। বলল, —থাক্, চাই না। এক ভাই ছাড়া আমারও তো আর কেউ নেই। বাপ যা রেখে গেছে তাতে আমাদের তিন জনের বেশ চলে যাবে।

সিধু বলল, —এবার তাহলে চললুম।

—যাবে কোথায়?

—দুনিয়াটা মস্তো। যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই যাব। তবে বাড়ি আর ফিরছি না।

ঝুমনো ছলছলে চোখে বলল, —মেয়ের জন্যে মন কেমন করলে ফিরে এসো জামাইদা।

—বেঁচে থাকি তো আসব। উদাস গলায় বলল সিধু।

কেমন তার আশা হয়েছিল ঝুমনো বলবে, —এই মেয়ে ছাড়া তোমার আর তো কেউ নেই। কোথায় আর যাবে? গাঁয়ে না ভাল লাগে এখানেই থেকে যাও। বিদেশ

বিভুঁইয়ে কোথায় ঘুরে মরবে? সাধু সন্ন্যিসিই বা হতে যাবে কোন্ দুঃখে? তুমি থাকলে ভাতে আমাদের টান পড়বে না।

কিন্তু ঝুমনো বলল না কিছুই। তার কুলুপ-আঁটা মুখের দিকে চেয়ে বুকটা কেমন দমে গেল সিধুর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল সে। এমন বুকভরা ব্যথা নিয়ে কি নদের নিমাই ঘর ছেড়েছিল? সিধু এর উত্তর জানে না। নিমাই সন্ন্যাসীর পালায় এসব তো দেখায়নি।

একটি জেলা শহরের জেলখানা থেকে এক শীতের বিকেলে বেরিয়ে এল সিদ্ধেশ্বর। কেউ তাকে নিতে আসেনি, নিতে আসার কথাও নয়। এই সমগ্র বিশ্বে একা মানুষটি কারাগারের সুউচ্চ প্রাচীরের বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুবৎ। চিত্রার্পিতবৎ। পাঁচ বছর আগে যখন সে ঘর ছেড়েছিল সেদিনের মতোই পথ চলে গেছে পৃথিবীর দিকে দিকে; কিন্তু কোন দিকে যাবার টানই সে অনুভব করছিল না। এই বিশাল দুনিয়াতে তার চেনা একটি কেন্দ্রভূমি আছে। সেই কেন্দ্রীয় টান, সেই আশ্চর্য মাধ্যাকর্ষণ, এক অদৃশ্য রজ্জুসূত্রে তাকে আকর্ষণ করছিল। মনটা হতে চাইছিল কেন্দ্রাভিগ।

দীর্ঘ এক বৎসরের সশ্রম কারাবাস তার দেহে-মনে অনেকটা পরিবর্তন এনেছে; এই কারাজীবন তার শরীর ও মনের বৃক্ষ থেকে বহু অপ্রয়োজনীয় শাখা ও পল্লবকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, ছেঁটে দিয়েছে। এখন সে আমূল না হলেও, বহুলাংশে নতুন মানুষ। এখন তার সেই গোলগাল সুখী-সুখী চেহারা নেই, মেদঝরা শক্ত দেহকাণ্ড, ঋজু ইস্পাত ভাব। মাথায় বাবরি নেই, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখ দুটি ধীর-স্থির-শান্ত। সেখানে যেন প্রজ্ঞাবান মানুষের নির্লিপ্তি। গভীর পর্যবেক্ষণ থেকে তার চাহনিতে একটা ধূসর বিষাদও হয়তো আবিষ্কার করা যায়।

ধর্মাধিকরণের সর্বজ্ঞ বিচারকগণ এই পৃথিবীতে যাদের বিনা দোষে দণ্ডিত করেছেন সিদ্ধেশ্বর তাদেরই একজন। সম্পূর্ণ নির্দোষ হলেও এক প্রভাবশালী মোহান্তের চক্রান্তে তার সাজা হয়ে যায়। সেখানে অর্থের যেমন ছড়াছড়ি, লোকজনের তেমনি আনাগোনা। দেশীয় লোকদের আনাগোনা তো আছেই, এমনকি বিদেশীদের পর্যন্ত আসা-যাওয়া। কয়েকজন বিদেশিনী পর্যন্ত আশ্রমে এসে আছে। তারা শ্বেতাঙ্গিনী। মোহান্ত বাবাজীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিছক আধ্যাত্মিক নয়, শারীরিক। বাইরে ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম কীর্তন এবং মৃদঙ্গের বোল, শ্রীখোল ও করতালের সঙ্গে নাচের তাণ্ডব, ভিতরে আদিম রিপুর পরিচর্যা। এই বেয়াড়াপনা অসহ্য ঠেকেছিল সিদ্ধেশ্বরের। এতদিন তার ধারণা ছিল নারীশরীর কিছু সহজলভ্য বস্তু নয়। এই বোষ্টমের আখড়া তার সে ধারণায় বেশ জোরাল ঘা দিয়েছিল। সে দেখেছিল চাইতে জানলে এবং না জানলেও এখানে স্ত্রীদেহ

পাওয়া যায়, অন্তত দুর্লভ নয়। আখড়ার মোহান্ত এমন কিছু নারী—মনোলোভা পুরুষ ছিল না, অথচ তার পরিচর্যাকারিণীর অভাব হয়নি। অথচ এদের কেউ কেউ এমন যে তাদের দেখলেই পুরুষের রক্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা কোথা থেকে এল বা কিভাবে যোগাড় হল ভেবে পাওয়া যায় না। বিধি-বহির্ভূত প্রেমলীলার এমন মুক্তাঞ্চল যে পৃথিবীতে আছে সে ধারণাই ছিল না সিদ্ধেশ্বরের। নিতান্ত গতানুগতিক মানসিকতার মানুষ হয়ে এসব সে সোজা চোখে নিতে পারেনি। ক্যাথারিন নামের এক শ্বেত-চর্মের যুবতী, সে বেশ সুদর্শনাও, সিদ্ধেশ্বরের আগে থেকেই আখড়ায় এসে ছিল, মোহান্ত-সংস্পর্শে যার কোলে একটি বাচ্চাও এসেছিল এবং যে সিধুর দিকে চেয়ে চেয়ে অনর্গল প্রশ্রয় মাখানো হাসি হাসত, তাকে সিধু একদিন তার নিজস্ব বাগধারায় জিগ্যেস করেছিল বিদেশ থেকে এদেশে এসে এই আখড়ায় ঢুকে এভাবে জীবন কাটাচ্ছে কেন। আর মোহান্তর মতো একজন বোকা-বোকা মানুষের মধ্যে কি-ই বা খুঁজে পেয়েছে যে মোহান্তর পায়ে তার সব দিয়ে বসে আছে। আখড়ায় থেকে ক্যাথারিন ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতে শিখেছিল। সেই বিচিত্র মধুর বাংলায় সে বলেছিল, ইংলিশ খানা আমি অনেক খেয়েছি, এখন বাংলা খানা খেয়ে দেখছি। নট ব্যাড। এই ব্ল্যাকিরাও বেশ টেস্টি। মোহান্ত গুড বাট ইউ আর বেটার, আই থিংক। আমি তোমাকে কৃপা করতে পারি।

বিদেশিনীর কৃপা সিদ্ধেশ্বর নেয়নি। কিন্তু সে যে সিদ্ধেশ্বরের ওপর কৃপা বর্ষণ করতে চায় এটাই যেন কেমন করে জেনে গিয়েছিল মোহান্ত। হয়তো ক্যাথারিনই জানিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন থেকেই সিধুর ওপর মোহান্তর বাঁকা চোখ। তার নামে ক্যাথারিনের শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ এল। ক্যাথারিন স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়ে এল আদালতে। মহামান্য আদালত পাপীর যোগ্য শাস্তি দিতে ভুলল না। শহরের জেলখানা পুরো এক বছরের জন্যে গিলে নিল সিদ্ধেশ্বরকে।

এখন সে, শীতের পড়ন্ত নরম বিকেলে, দাঁড়িয়ে আছে জেলখানার গেটের সামনে, কিছুটা বিহ্বল ভঙ্গিতে। এখন তাকে দেখাচ্ছে একটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর মতো যে আশপাশে কোন খেলুড়িকে দেখতে পাচ্ছে না এবং তার হাতে করবার মতো কাজ নেই। সিদ্ধেশ্বর আসলে বুঝতে পারছে না যে চার বছর ধরে বোহেমিয়ান জীবন যাপনের পর লম্বা একটা বছর কারাগারের চার দেওয়ালের বদ্ধতা তাকে মানসিকভাবে শিকড়গ্রথিত করে দিয়েছে।

কিন্তু এভাবে, এই লোহার ফটকের সামনে, দাঁড়িয়ে থাকা অস্বস্তিকর এবং সন্দেহ-উদ্রেককর। এ যেন নরকের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা। অতএব সিদ্ধেশ্বর সচল হল। সে রবি ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন নয়। উপেনের মতো সে দু'বিঘের

পরিবর্তে বিশ্ব-নিখিলকে পেতে চাইল না। বরং নিখিল বিশ্বের বদলে দু'বিঘে জমিকেই ফিরে পেতে চাইল। একসময় দেখা গেল সে হাঁটতে হাঁটতে রেল ইস্টিশানে এসে হাজির হয়েছে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালে গাড়ি আসার ইঙ্গিত। এক বছরের খাঁটি ও নিশ্ছিদ্র শ্রমে অর্জিত টাকায় তার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্রমণে কোন বাধা নেই। কিন্তু তার টিকিট বলছে অতদূর তার গন্তব্য নয়।

সত্যিই তাই। কেননা পরের সকালেই দেখা গেল তার সুপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। আবাল্য চেনা রাস্তা যার ধুলো তার পায়ে লেগেছে অযুতবার। এমন উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ হিম-প্রভাতও সে এখানেই দেখেছে বছরের পর বছর। আর এই যে শীত-বিধুর রুক্ষ মাঠ ডাইনে বাঁয়ে—তার প্রতিটি ইঞ্চি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে তার কিশোর বেলার পদযুগল। মাত্র পাঁচ বছর এদের কাছছাড়া সে। পাঁচ বছরের অদর্শন চেনা মাঠ, পথ আর গাছগাছালিগুলোকে আরো তাব ঘনিষ্ঠ করে তুলল।

বাড়ি ফিরে আসছে সিদ্ধেশ্বর।

বাড়ি যথাস্থানেই আছে, কিন্তু বাড়ির চেহারাপত্তর বদলে গেছে অনেকখানি। সিদ্ধেশ্বর শখ করে খোড়ো চাল পাল্টে দিয়েছিল টালি বসিয়ে। বেশির ভাগই আস্ত নেই। কিছু ভেঙেছে ঝড়ঝঞ্ঝায়, কিছু ভেঙেছে দুষ্টু ছেলের দুষ্টুমিতে। উঠোনটা হয়ে উঠেছে সুন্দরবন। মাঠে মাঠে শীতের রিক্ততা, কিন্তু সিধুর বাড়ির চৌহদ্দিতে বর্ষা-ওথলানো সবুজ। বাড়ির প্রাঙ্গণে ও পরিমণ্ডলে এত সবুজ যে কোন গেরস্থর অপছন্দ। জেলখানার কিছু সঞ্চয়ও সিধুর কাছে ছিল, জনা দুই মজুর লাগালে চারদিক সাফসুতরো হয়ে যেত, কিন্তু একটা পয়সাও অপব্যয় করতে তার মন চাইল না। তার এখনও গতর আছে এবং গতরের দৌলতেই সে দু'তিন দিনের মধ্যে বাড়িটাকে কাজ-চলা গোছের পরিচ্ছন্ন করে তুলল।

হারানো ঘর ফিরে পেয়ে সিদ্ধেশ্বরের মন ভাল হয়ে যাবার কথা। কিন্তু হল বিপরীত। ভারি মনমরা হয়ে গেল সে। এই মন জিনিসটাকে বোঝা ভার। এর গতি যে কখন কোন্‌দিকে তার হিসেব পাওয়া কঠিন। তুমি যত বড় জ্ঞাণী-গুণী পণ্ডিতই হও না কেন আঁতের কথা জানার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি, শ্রী সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল, হঠাৎ একদিন চোর হয়ে গিয়েছিলে, তারপর একদিন চুরি ছেড়ে দিলে এবং দীর্ঘ পাঁচটি বছর পথে পড়ে থাকা টাকাপয়সা পর্যন্ত কুড়িয়ে নাওনি, যে হাত আবার চুরি করবে, সেটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পর্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলে,—কেন এই পরিবর্তন তা কি তুমি জানো? জানো না। বউকে হারিয়ে কি যে তোমার দুঃখু হল বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে। কর্কশ কষ্টকর বাইরে কাটাবার দিনগুলো নিতান্ত নীরসও তোমার লাগেনি। তখন তুমি কুলি-কাপাটির কাজ পর্যন্ত করেছ। গালমন্দ খেয়েছ, অত্যাচার সয়েছ।

কেন? কেন এত দুঃখ মেহনত? তোমার কি ভাত আর মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাব ছিল? না, এর জবাব নেই। ক্যাথারিন বলে সেই মিষ্টি চেহারার অন্যদেশী মেয়েটা কোর্টের একরাশ লোকের মাঝখানে নির্জলা মিথ্যে বলে গেল—তুমি নাকি তার ইজ্জত নিতে চেয়েছিলে। অথচ তার ওপর তোমার একটুও রাগ হয়নি। কেন? আর যেদিকে দু'চোখ যায় বলে ঝুমনোর কাছে ডাঁট দেখিয়ে চলেই যখন গেলে তখন ফিরে আসবারই বা কি দরকার হল? ফিরেই যখন এলে তখন থিতু হয়ে বসবে তো? তা না, কেবলই তোমার মন উড়ুউড়ু, পালাই পালাই ভাব।

বস্তুত সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ঘরে থাকার মৌতাত কেটে গেল তার। এক অনির্দেশ্য বেদনা মুহ্যমান করে রাখল তাকে। শূন্যতাবোধের এক বিশাল হাঁ-এর মধ্যে সে যেন ক্রমশঃ সেঁধিয়ে যেতে লাগল।

তাকে 'দাদা' বা 'কাকা' বলে এমন সম্পর্কের কেউ কেউ এসে শুধলো, —এবার থেকে তাহলে বাড়িতে থাকাই ঠিক করলে তো?

সিধু সন্ধ্যাবেলায় 'হাঁ' বলল, সকালে ঠিক করল—আর এখানে নয়। আবার সে পালাবে। কোথায় পালাবে তার অবিশ্যি স্থিরতা নেই, কিন্তু পালাবে।

যাবার আগে অবশ্য মেয়েকে একবারটি চোখের দেখা দেখে যাওয়া তার কর্তব্য। ঝুমনো কেমন আছে সেটাও জানা দরকার। তারই মেয়েকে সে মানুষ করছে, সুতরাং তার একটু তত্ত্ব-তালাশ নেওয়া তার উচিত বৈকি। হ্যাঁ, এসব নিতান্তই উচিত-অনুচিতেরই ব্যাপার। নচেৎ মন-গাঙের তলা পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেও সে তো শ্বশুরবাড়ি যাবার অন্য কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না।

সকালে বেরনো হল না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সকাল গড়িয়ে গেল। পড়ন্ত দুপুরে বেরিয়ে, চার কিলোমিটার রাস্তায় নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তার কাটাকুটি খেলতে খেলতে, সে যখন শ্বশুরালয়ে পৌঁছল তখন সাঁঝের আবছায়া নেমে এসেছে পল্লী-জনপদের আনাচে-কানাচে।

ঝুমনো তখন সবে ঘাটলা থেকে ফিরে এসে উঠোনের তারে ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। পিছন থেকে তাকে দেখেই সিদ্ধেশ্বর বুঝতে পারল গত পাঁচ বছরে তার বয়স বাড়লেও ঝুমনোর বয়স একটুও বাড়েনি। ঝুমনো মুখ ফেরাতে দেখল সেখানে সময়ের কোন দংশনচিহ্ন নেই।

সিদ্ধেশ্বরকে দেখে ঝুমনো কিন্তু একটুও অবাক হল না। যেন সে আসবেই এটা ঝুমনো জানত। স্থির চোখে সামান্যক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, মেয়েকে মনে পড়ল মোড়ল মশাই?

সম্বোধনের নতুনত্বটা কান এড়াল না সিধুর। ইচ্ছে করল বলে,—তোমার কথাও

মনে পড়েছে।

বলা হল না। কেবল বলল,—মেয়ে কোথায়?

—খেলতে গেছে আশেপাশে। আসবে এখুনি। বসবে এসো। তোমার চেহারাটা বদলে গেছে অনেকখানি।

—তুমি কিন্তু একই রকম আছ।

—আছি বুঝি?

—হ্যাঁ।

এক সন্ধে, বড় জোর একদিন কাটাবার কড়ারে, এখানে এসেছিল সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু কেটে গেল পাঁচ-ছয় দিন। এর মধ্যে মেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে বাপের। চেহারায় বাপের আদল পেয়েছে মেয়ে। কথাবার্তাও মিষ্টি। মাথায় বেশ বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলে যাচ্ছে সে। মাসি তাকে মুখ্যু করে রাখতে চায় না।

পাঁচ বছর কোথায় কিভাবে সিদ্ধেশ্বরের কাটাল তা নিয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি ঝুমনো। সিধু উপযাচক হয়েই সব বলেছে। বাদ দেয়নি কিছু। আখড়ায় থাকার কথা, ক্যাথারিন প্রসঙ্গ, এক বছরের কারাবাস—খুলে বলেছে সব। ঝুমনো গপ্পো শোনার মতো করে সমস্ত শুনেছে, কিন্তু তার মুখে অতিরিক্ত কৌতূহলের চিহ্ন ছিল না। ঢেউহীন কুঞ্চনহীন মুখ। সেই মুখ দেখে বুকের ভেতরটা খালি-খালি ঠেকেছে সিদ্ধেশ্বরের। না, এ নারীকে ঠিক চেনা গেল না; আগেও না, পরেও না।

এই পৃথিবীতে সত্যিই সে নিঃসঙ্গ। মনে হল সিধুর। এবার তো তাহলে নোঙর তুলতেই হয়।

সকালে মুশাফির—ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে সিদ্ধেশ্বর বলল, —তাহলে যাই?

ঝুমনো বলল, —যাই বলতে নেই, আসি বলতে হয়।

—আসি তাহলে?

—যাবে কোথায়?

সিদ্ধেশ্বর সেই পাঁচ বছর আগেকার ভঙ্গিতে বলল,—যেদিকে দু'চোখ যায়।

—তাই বুঝি? বাড়ি ফিরবে না?

—না।

—মেয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে না? সে তো এখন ইস্কুলে।

—সেই জন্যেই তো পালাতে চাইছি।

—একটু দাঁড়াও তো। আসছি।

ত্বরিত পায়ে সরে এল ঝুমনো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন সে ফিরে এল তখন সে যেন অন্য নারী। তার পরনে নতুন শাড়ি। মাসি-বোনঝির জন্যে জামাকাপড়

এনেছিল সিদ্ধেশ্বর, এটা সেই কাপড়। অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব মুখখানাকে মেজে নিয়েছে ঝুমনো। কবরীবদ্ধ চুলে চিরুনির স্পর্শ লেগেছে। প্রভাতের অরুণিমায় মুখখানি ভারি মায়াময়।

মৃদু গুঞ্জনের মতো স্বরে ঝুমনো বলে, —কই, পালাও তো দেখি।

সংলাপ নয়, সে যেন বশীকরণের মন্ত্র।

সিদ্ধেশ্বরের মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অসৎ পথে যাবে না কোনদিন—এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে সে এক কান্ড করে বসল। অর্থাৎ আবার ভুল। তার আত্মবিস্মৃত হাত সবলে টেনে নিল ঝুমনোকে, বুকের মধ্যে। কিন্তু ভুল বোধহয় নয়। তার কঠিন রুক্ষ বুকে ঝুমনো এমনভাবে সমর্পিতা যেন এর চেয়ে নিশ্চিত ঠাঁই তার জানা নেই।

—ছাড়ো, মেয়ে এসে পড়বে। এবার বলো কোথায় তুমি যাবে।

—বাড়ি।

—আমাকে কবে নিয়ে যাবে?

—তোমাকে?

—তোমার বাড়িই তো আমার বাড়ি গো। নিয়ে যাবে না?

এ-কথার ইঙ্গিত না বোঝার মতো নির্বোধ সিদ্ধেশ্বর নয়, কোন পুরুষই নয়। উত্তর দিতে তার একটু সময় লাগল। বলল, —একজন চোরের ওপর তোমার বিশ্বাস হয়?

—চোরের ওপর হয় না, সাধুর ওপর হয়।

—কি করে জানলে আমি সাধু?

—সেরকমই আমার মন জানে। মন অন্তর্যামী। চোরকে তো ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, সাধুকে ফেরাই কি করে?

চোর নয়, সাধু সিদ্ধেশ্বর ফিরে যাচ্ছিল গ্রামে। এখন হাতে তার অনেক কাজ। একটা নতুন জীবন এই মধ্যবয়সে শুরু করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। সব পাখি ঘরে ফেরে। সিধুও ফিরছে। বৃহৎ বিশ্বের জন্যে তার আর কোন মাথাব্যথা নেই।

তবু, যেতে যেতে সে আবছা স্বরে, কিছুটা অসন্তোষের ছোঁয়া তার গলায়, বলল,—এই মনটাকে নিয়ে পারা গেল না। এ যে শালার কি জিনিস!

কেন সে বলল কে জানে! কেউ কি জানে?

আশাবরী

# শস্যবতী

একটা নয়, বেশ কয়েকটা কোকিল ডাকছিল বট-পাকুড়ের জঙ্গলে। বহু কোকিলের কোরাস মানে বসন্তকাল। সবিতা শীতকালেও কোকিলের ডাক শুনেছে। তবে এত কোকিলের ডাক নয়, একসঙ্গেও নয়। ডাকের মধ্যে এমন চাপান-উতোরের খেলাও শীতে থাকে না। এমন মন-কেমন-করা ভাবই কি থাকে? এটা আসে চৈত্র-ফাগুনের কোকিলের ডাকে। আশপাশের গাছেপালায় সির্‌সির্, সর্‌সর্। যেন হুতোশ ফেলছে প্রকৃতি। তার সঙ্গে একটা হারিয়ে-যাওয়ার কান্না মিশিয়ে দেয় পিককুল। সব মিলিয়ে বুকের ভেতর কেমন যেন একটা আথালি-পাথালি ভাব হয়। সবিতার মনটা হু-হু করে উঠল।

দুপুর পেরিয়ে গিয়েছে। ছায়াহীন উঠোনে কড়া রোদ্দুর। সবিতার জীবনটাও যেন ওই রোদপোড়া উঠোনটার মতো খাঁ-খাঁ। ছায়া নেই কোথাও, কেবল দহন। গরম কালের এরকম দুপুরে সবিতার কিরকম ভয় করে। ভারি একা লাগে। অথচ সে ইচ্ছে করলেই পাশের মায়া কাকিমার বাড়িতে যেতে পারে। খুব আমুদে মানুষ। পাঁচ বাড়ির বৌ-ঝিরা সেখানে মনের ভার হাল্কা করতে যায়। সবিতার সে-উৎসাহ নেই। সে একটু গম্ভীর আর চুপচাপ ধরনের মানুষ। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে মাথা ভারি হয়ে ওঠে। মানুষ কি করে যে এত হাসিখুশি থাকে ভেবে পায় না।

অন্যেরা কিন্তু জানে সে কেন এত চুপচাপ আর গম্ভীর। আসলে মানুষটা বড় দুঃখী। সহজে হাসি-আনন্দ আসে না দুঃখী মানুষের। যার নিজের ছেলেপুলে নেই, স্বামী থেকেও নেই, অন্যের সংসারে যার দিন কাটে, তাকে দুঃখী ছাড়া আর কি বলা যায় বলো? আর কি জ্বালা, দুঃখু যেন বেড়ে যায় চৈৎ-ফাগুনের দুপুরে। মন আনচান, বুক আইটাই। সকাল থেকে বেশ কাটে কাজেকর্মে। খাওয়া দাওয়ার পাট চোকার পর সময় যেন সাহারা। অনেকের দুপুর ঘুমের দুপুর। সবিতার দুপুর ঘুম এড়ানোর। এব বিশাল-বিস্তীর্ণ রোদ-ফুটন্ত দুপুর জাগরণ কি দুঃসহ! তখন মানুষ আর কি করতে পারে

গালে হাত দিয়ে বসে ভাবা ছাড়া? সবিতা সেটাই করে। ভাবে আর ভাবে।

পাঁচ-পাঁচটা বোন তারা। সুবর্ণর মা উষাবতী দ্বিতীয়া, সে চতুর্থী। উষাদির সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ অল্প না। অন্তত দশ-এগারো বছর। মেজদির পঞ্চাশ পুরতে দু'এক বছর বাকি। সেও চল্লিশে পা দিতে চলল। সব মেয়েকে সংসারী করেই তার বাপ-মা বিদায় নিয়েছে। বাপের অবস্থা যেমন ছিল জামাইদের অবস্থাও সেই রকমই। কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা। তফাৎ যে নেই তা নয়, তা উনিশ-বিশ। সবচেয়ে ভাল বিয়ে হয়েছিল সবিতারই। স্বামীর চেহারাছাঁদ মন্দ ছিল না। লেখাপড়াও জানত। একটা পাশ। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। জমিজিরেত পুকুর বাগানবেড় সবই ছিল। সবিতাও নেহাৎ মুখ্যুসুখ্যু নয়। বাংলা বই ভালই পড়তে পারে। তার চেহারা আগে এমন রুখুশুখো ছিল না। বেলেমাটির মতো গায়ের রঙ্ আর ঢলঢলে মুখ ছিল। শ্বশুরমশাই তাকে নিজে পছন্দ করে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সবিতা তখন পঞ্চদশী। শ্বশুরবাড়ি নিতান্ত কাছে ছিল না। মাঠমাঠালি, গ্রাম-গ্রামান্তর ছাড়িয়ে পাল্কি চলেছে তো চলেইছে। ছয় বেহারা কেবলই কাঁধ পাল্টায়, গাছের ছায়ায় বসে, জিরোয়, আবার চলে। পাল্কির জানলার ফাঁকে অচেনা গ্রামদেশ। সবিতার বুক দুরু-দুরু, তারই মধ্যে খুশির বাদ্যি। এক চিলতে একটা নদী না খালও পেরোতে হয়েছিল। পেরোবার সময় নামতে হয়েছিল পাল্কি থেকে। তটভূমির কাদা ভাঙতে গিয়ে বর-বধূর কি দুর্দশা! বরের ধুতিতে লাগল কাদা, কনের সিঁথিমৌর খসে পড়ল। একজন তৎপর বরযাত্রী সেটা না তুললে হেনস্থার একশেষ হতে হত। গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছল দুপুরের বিদায়-বাঁশি বেজে গেছে। বধূবরণ করার সময় শাশুড়ির মুখে গোধুলির মায়াবী আলো। কনে দেখে তিনি বেজায় খুশি। পাড়াপড়শিরাও জোয়ারের নদী।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছিল সাত-আটটা বছর। স্বামী মাইল চোদ্দ দূরের এক স্কুলে মাস্টারি করত। থাকত সেখানেই, সপ্তাহান্তিক ঘরে ফেরা। সোমবারের সকালেই কর্মস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া। সবিতার খুব একটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগত না। চাষীবাড়ির বউ, কাজের অভাব কি? গোরু-ছাগল-হাঁস পালার রেওয়াজ ছিল বাড়িতে। মানুষ না হয়েও তারা গৃহ পরিজন। বছরভর ভোরে ওঠা আর গাঢ় রাতে ঘুমোতে যাওয়া। বাড়ির সবাই বলত — গৃহলক্ষ্মী।

সবিতার মনে আছে তাদের বাড়ির লাগোয়া বাগানে অনেকগুলো আমগাছ ছিল। ফাগুন-চৈত্রের দুপুরগুলো আলস্যমন্থর হয়ে উঠত আমের বোলের গন্ধে এবং কোকিলের কুহু ডাকে। তখন সে ডাকের অন্য অর্থ ছিল জীবনে। এখনও আশপাশে আমের বনে মঞ্জরী আসে, কোকিলও ডাকে। কিন্তু তার জন্যে নয়।

এভাবেই যাচ্ছিল দিন। কিন্তু পনেরো থেকে বাইশ-তেইশ এই সাত-আট বছরেও সবিতা যখন শস্যবতী হল না, তখন বাড়ির মানুষেরা তাকে গৃহলক্ষ্মী থেকে অলক্ষ্মীর পর্যায়ে নামিয়ে আনল। ইতিমধ্যে গণৎকার এসে ওর হাত দেখে গেছে, ওকে সুফলা করার জন্যে সাহায্য নেওয়া হয়েছে হেতুড়ে ডাক্তারের, ওঝার, জড়িবুটির। কেবল সেই রূপকথার সন্ন্যাসীর খোঁজ পাওয়া যায়নি, যে একটা ফল দিয়ে গেলে ওর কোল আলো করে শিশু আসত। ফলত সব চেষ্টা বৃথা গেল। ইতিমধ্যে শ্বশুরমশাই স্বর্গত হয়েছেন। সংসার চলছে রাণীতন্ত্রের অধীনে। রাণীমার মুখ ভার। তাঁর চোখের চাউনি ক্রমশঃ মেঘলা হয়ে আসছে। স্বামীর মনও সবসময় বোঝা যায় না। এভাবে কেটে গেল আরো দুটো-তিনটে বছর। তারপর মায়ে-ছেলের কি যে কথা হল, ছেলে একদিন বলল, —অনেকদিন তো বাপের বাড়ি যাওনি, সেখানে কিছুদিন থেকে আসবে চলো।

কথাটা সত্যি। অনেকদিন যাওয়া হয়নি বাপের বাড়ি। বিয়ের বছর দুইয়ের মধ্যে বাপ চলে গেছে, সংসারে মা একা, কেই বা তার খবর নেবে? আর বাপের বাড়ির নামে কোন নারীর মন না আন্‌চান্‌ করে ওঠে? সবিতা এক কথায় রাজি। সে কি আর জানত একটা সর্বনাশা চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছে তাকে ঘিরে?

বাপের বাড়িতে রেখে আসার সময় মানুষটা বলেছিল, —মাস দুই থাকো। তারপর এসে নিয়ে যাবো।

—এতদিন কেন?

—বহুদিন পরে তো এলে। যাবার তাড়া কিসের? সময়মতো এসে নিয়ে যাব।

লোকটি আর আসেনি। নিয়ে যাবার জন্যে অন্য কাউকেও পাঠায়নি। তার বদলে এসেছিল একটি চিঠি। আজো সেই চিঠির প্রতিটি শব্দ গেঁথে আছে সবিতার মনে। শলাকাবিদ্ধ হবার যন্ত্রণা কি ভোলা যায়?

বৌমা,

এই পত্র পড়িতে তোমার কষ্ট হইবে তাহা জানি। তথাপি লিখিতে হইতেছে। অনেক সাধ করিয়া তোমাকে ঘরে আনিয়াছিলেন তোমার শ্বশুর মহাশয়। নাতিপুতি দেখিয়া যাইবেন, এই ছিল তাঁহার সাধ। সে সাধ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। শিশুর হাসিকান্নায় ঘর ভরিয়া উঠিবে, এ বাসনা আমারও। সে আশাও মিটিল না। এদিকে বয়স হইতেছে। ঈশ্বর আমাকে কতদিন বাঁচাইয়া রাখিবেন জানি না। কিন্তু আর অপেক্ষা করিবার ধৈর্য আমার নাই। আমার পুত্রও অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। একটি সুলক্ষণা পাত্রী আমি নিজে পছন্দ করিয়াছি। আগামী ১০ই বৈশাখ শুভকর্ম সম্পন্ন

হইবে। জ্যেষ্ঠা বধূ হিসাবে তোমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এ সংবাদে আঘাত পাইবে বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহার অন্যথা করিবারও উপায় নাই। তোমার প্রতি আমার স্নেহাভাব নাই, কিন্তু কি করিব? সকলই দুরদৃষ্ট। ইতি—

আশীর্বাদিকা

শাশুড়িমাতা

২৫শে চৈত্র, ১৩৫৪

বয়ান শাশুড়ির হলেও চিঠিটি সবিতার স্বামীরই লেখা। হস্তাক্ষর চেনে বৈকি সে। চিঠি পড়তে পড়তে এবং পড়ার পর বহুদিন সে ডুবেছিল কান্নায় দরিয়ায়। অথৈ অকূল দরিয়া। সময়ের হস্তাবলেপে তার কান্না ক্রমে ক্রমে থিতিয়ে এল, কিন্তু তার বুড়ি-মার কান্না অঝোরে ঝরতে লাগল। কেঁদে কেঁদে চোখ পচে গলে বৃদ্ধার। তারপর মরণ এসে তার হাড় জুড়িয়ে দিল। সবিতা তখন সাতাশ। নিঃসন্তান, নিঃসঙ্গ স্বামী-পরিত্যক্তা এক যুবতী।

সমাজের চোখে জেদী মানুষের অপরাধের শেষ নেই এবং সবিতাও জেদী। স্ত্রীলোকের বেশি জেদ ভাল নয়, এই অনুশাসন বৈবস্বত মনুর আমল থেকেই বোধ করি চলে আসছে। এর অনুগামীদের কাছে সবিতার শ্রেষ্ঠ অপরাধ সে স্বামীর কাছে একগালে চড় খাওয়ার পর অন্য গাল বাড়িয়ে দেয়নি। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা মানুষটা তার কাছে আর ফিরে আসেনি, তার কাছে যাবার প্রয়োজনও সে বোধ করেনি। তাকে হিতোপদেশ দেবার লোকের অভাব অবিশ্যি ছিল না, কিন্তু সে নিজের জিদই আঁকড়ে ছিল দাঁতে দাঁতে চেপে।

যেহেতু শরীরে তখন যুবতীরক্ত সবিতা ভুল পথে যতে পারত। পোড়ো জমির অধিকার নেবার লোক চিরকালই চারদিকে থিকথিক করে। সবিতা তখন পতিত জমি। অনেকেই তার দখল চেয়েছিল। ইস্পাতের কাঠিন্যে তাদের সামাল দিয়েছিল সবিতা। এমন ভাবে মাংসভুক লোভী শকুনদের ঠোক্কর থেকে কতদিন সে নিজেকে বাঁচাতে পারত বলা মুশকিল, এমন সময় মেজদি উষাবতী তাকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠাল। এলে বলল, 'এখানে তুই থেকে যা সুবো। বাপের বাড়িতে কে আছে, কে তোকে দেখবে? আমি রুগি মানুষ, সংসার দেখার লোক নেই। তোর আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই।' না, আর ফেরা হয়নি সবিতার। দিদির সংসারেই আছে সেই থেকে। তা দেখতে দেখতে কেটে গেল বৈকি দশ-এগারো বছর। সুবর্ণ তখন বছর দেড়-দুই এর শিশু। সে এখন তেরোয় পা দিয়েছে। বালকও বলা যায়, সদ্য কিশোরও

বলা চলে। ছিপছিপে হাল্কা পলক' একটা ছেলে, শ্যামবর্ণ মুখে বালকত্বের মায়া। মেজদির আর কোনও ছেলেপুলে হয়নি। ছেলের দেখভাল আগাগোড়া সবিতার ওপর। সুবর্ণ মিশে আছে তার আত্মার সবটুকু জুড়ে। মেজদিরও সাধারণ চাষীবাসী সংসার। নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। কেবল সুবর্ণই তার কাছে এক সবুজ ভূখন্ড।

কিন্তু এই চৈত্র-ফাগুনের কোকিলডাকা দুপুর—অসহ্য, অসহ্য।

সুবর্ণ আজ একটু দেরি করেই স্কুল থেকে ফিরল। বেলা পাঁচটা। রোদের তাতে ঝলসানো মুখ।

—এত দেরি যে! শুধোল সবিতা।

—পাখি মারতে বেরিয়েছিলুম।

সুবর্ণের ভারি পাখি শিকারের নেশা। ব্যাগের ভেতর গুলতি আর মাটির গুলি নিয়ে স্কুলে যায়। ফেরার পথে বনজঙ্গলে ঢুকে পাখির পিছু ধাওয়া করে।

—কি পাখি মারলি? ঘুঘু?

—ঘুঘু ভারি চালাক। মারা যায় না। আমি একটা বোকা পাখি মেরেছি।

—কি পাখি রে?

—এই দেখ।

প্যান্টের পকেট থেকে সুবর্ণ তার শিকার বের করে আনে। নরম নিভাঁজ কালো একটা পাখি। দেখে সবিতা চমকে উঠে,—এ যে কোকিল রে! পুরুষ কোকিল। এদের মারতে আছে নাকি! কেমন গান গায়!

—গান গেয়ে নিজেদের চিনিয়ে দেয়। পুরুষরা বোকা হয়। ওদের মরাই ভাল, বুঝলে মাসি! সবিতা বেশ অবাক হয়। হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। কি রকম যেন অন্য সুরে কথা বলছে ছেলেটা।

হঠাৎ সুবর্ণ বলে,—আচ্ছা মাসি, তুমিই তো আমাকে বড় করে তুললে। তোমাকে এবার থেকে মা বলে ডাকব, ছোট মা। কেমন?

সবিতার কানে অঝোরঝরণ বৃষ্টির শব্দ বাজে। তার মনে খরারুক্ষ জমি যেন ভিজে যায় প্রবল বরিষণে। সুবর্ণর মাথাটাকে বেষ্টন করে তার দুই বাহুর পাক দিয়ে ধরে সে।

ফাল্গুন-চৈৎ পেরিয়ে বৈশাখ আসে। কোকিল ডেকেই যায় বট-পাকুড়ের বনে। সবিতার মন অর হু হু করে না। সে বুঁদ হয়ে থাকে অন্য এক সঙ্গীতে।

বিচার

# মফস্বল সংবাদ

কুশডাঙার মোড়ে দেবদারুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে শোভন পাঁচ-ছজন সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে গল্পোগাছা করছিল। বন্ধুগুলো আশপাশের গ্রামের। ফি শুক্কুর বার আসে। ওদের জমায়েতের জায়গা এটাই। শোভন একটা ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন চালায়। তাই ওর কাছে চারদিকের পাঁচ-সাতটা গ্রামের ছেলেদের আনাগোনা। খেলাধূলা, সিনেমা রাজনীতি—সাতসতের নানা বিষয় নিয়ে আড্ডা-আলোচনা চলছিল। সাইকেলের হ্যান্ডেলের ওপর হাত রেখে শোভন বন্ধু কাম লেখকগোষ্ঠীর নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল হাসিমুখে। সম্পাদকের ঈষৎ একটু গাম্ভীর্য না থাকলে সবাই পেয়ে বসে।

তাই অনেক চেষ্টায় গাম্ভীর্যটুকু রপ্ত করেছে সে। নচেৎ শোভন খুব খোলামেলা প্রকৃতির ছেলে, আঁতেলপনাও নেই তিল মাত্র। চিন্তা-ভাবনায় খুবই আধুনিক, প্রোগ্রেসিভ বলা চলে। কিন্তু মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ও কোন আপসরফা করে চলে না। এই ব্যাপারটায় ও কিছুটা সাবেকী ধরণের বলা চলে। এতক্ষণ বেশ সহজ ভঙ্গিতেই কথাবার্তা বলছিল শোভন। হঠাৎ ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। সাইকেলের হ্যান্ডেলের মুঠোয় চাপ শক্ত হয়ে বসল।

পৌলোমী বেরিয়ে আসছে সেলুন থেকে। ওর পরনে সালোয়ার-কামিজ। চুলের বিন্যাস থেকে বোঝা যায় ও চুল ছাঁটতে এসেছিল। কুশডাঙা এখন প্রায় আধা-মফস্বল শহর। এখানে মেয়েদের মধ্যেও হাল ফ্যাশনের ঢেউ লেগেছে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা লেগেছে লাগোয়া গ্রামগুলোতে। তাই প্রায় চার কিলোমিটার উজিয়ে তিলকাঠি থেকে উড়ে এসেছে পৌলোমী। শোভন শুনেছিল ওদের পাড়া থেকে মেয়েরা চুল ছাঁটাতে আসে কুশডাঙায়। তাদের মধ্যে যে পৌলোমীও আছে এটা শোভনের জানা ছিল না। এখন তো সে নিজের চোখেই দেখল। আসলে সংসারের খবর বিশেষ সে রাখে না। তার কাজের ক্যারেক্টারটাই অন্য রকম, তাই সংসারমনস্ক থাকা যায় না।

কুশডাঙায় এই চুলছাঁটাই দোকানটির নাম 'সুকেশ সেলুন'। খুব নাম ডাক সেলুনটার,

হাওড়া শহর থেকে দুই জন এক্সপার্ট আসে—মহিলা। আসে বুধ আর শুক্রবার। তাই দুদিন কুশডাঙা এবং গা-ঘেঁষা গ্রামগুলোর খেঁদিপেঁচিরাও উর্বশী হবার সব কাজ ফেলে, এমন কি টিভির সিনেমা প্রোগ্রাম ফেলেও, সুকেশ সেলুনে এসে ধর্ণা দেয়। অবশ্য বৃহস্পতিবার এবং ওই দুদিন ছাড়া বাকি দিনগুলো সেলুনটা পুরুষদের জন্যেও খোলা। আগে সবদিনই পুরুষরা ঢুকতে পারত। কিন্তু বুধ শুক্রবারে এমন ইয়াং ছেলেদের ঢল নামতো যে পুরুষদের চুল ছাঁটার দিন নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। আরো একটা ব্যাপার—পুরুষদের জন্যে মেল কার্টার থাকলেও অনেকেই ফিমেল এক্সপার্টদের কাছে চুল ছাঁটাবার বায়না ধরত। এ থেকেও অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

সুকেশ সেলুনে পৌলোমীকে দেখবে আশা করেনি শোভন। পৌলোমী ওর বোন। একমাত্র বোন। বয়স বাইশ-তেইশের মতো। বিরামপুর কলেজে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে। চেহেরা মন্দ নয়। সুন্দরী বলা চলে না, তবে শরীরে একটা নজরকাড়া ব্যাপার আছে। চাপা ফরসা ধাঁচের মত রঙ, নাকমুখ চোখা। চালচলনে রীতিমতো মড। অথচ তিন বছর আগে মেয়েটা অন্যরকম ছিল। লাজুক, মিষ্টি, চাপা। হঠাৎ কি রকম বদলে গেছে। লেখাপড়ায় যারা ভাল হয় না, সাজগোজের দিকে তাদের নজর বোধ হয় একটু বেশি। পৌলোমী মেধাবী মেয়ে নয়। মাধ্যমিক ফাইন্যালে পৌঁছাতে বার তিনেক ফেল করেছে নানা ক্লাশে। তাতেই হায়ার সেকেন্ডারিতে যেতে বাইশ-তেইশ হয়ে গেল। সহপাঠিনীদের অনেকের চেয়েই তিন-চার বছর এগিয়ে। অবশ্য তাজা চেহারার জন্যে আসল বয়েসের চেয়ে পৌলোমীকে কম দেখায়। এখানকার পৌলোমী উদ্ধত, অহঙ্কারী, আড্ডাবাজ।

শোভন চায়নি সময়ের গড্ডলিকা স্রোতে যারা গা ভাসিয়ে দেয়, তার বোন তাদের একজন হোক। কিন্তু বোন সেটাই হয়েছে। দুঃখজনক ব্যাপার।

পৌলোমী কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? দুপুর দুটোর পর ওকে বাড়িতে দেখেনি শোভন। অন্তত তিন চার ঘন্টা বাইরে আছে পৌলোমী। এতক্ষণ কোথায় কাটাল? সেলুনেই বা ঢুকল কখন? শোভন এখানে মিনিট পাঁচিশেক দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় তার আগে ঢুকেছে। পৌলোমী বেরিয়ে এসেও শোভনকে দেখতে পায়নি নিশ্চয়ই। তাহলে অমন ডাঁটের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারত না। চেনা লোকদের সমানে মেয়েদের হাঁটাচলাার ধরন বদলে যায়। কিছু দূর হেঁটে গিয়ে রিকশা নিল পৌলোমী। রিকশাটা এগিয়ে চলল।

'কি হল শোভন দা?' একজন শুধলো। শোভনের ভাবান্তর ওদের চোখে পড়েছে।

'না, কিছু না। আচ্ছা, আজকের মতো তোমরা এসো। আমরা একটু তাড়া অছে।' শোভন বলল।

আড্ডা ভেঙে দিয়ে সাইকেলটাকে টানতে টানতে এগোলে সে। শীতের শেষ বেলায় আঁধারের আভাস। কুশডাঙার মোড় ফেলে সামান্য এগোবার পর একটা মেঠো সড়ক চলে গেছে তিলকাঠির দিকে। এই রাস্তা ধরে যেতে যেতে বহুদূর - ছড়ানো মাঠের মধ্যে নির্জনতা ও নীরবতাঘন সহসা হয়ে এল। সন্ধ্যাও নেমে এল ঝপ করে। পৃথিবীর শরীর কে যেন কালো ওড়নায় ঢেকে দিল। শোভন দেখল রিকশাটা প্রায় দু'ফালং দূরে এগিয়ে গিয়েছে। এবার সে সাইকেলে উঠল। ভাবতে লাগল—পৌলোমীর সাহসটা খুব বেড়েছে। নাকি এরই নাম বোকামি? অপরিণামদর্শিতা? এই চার কিলোমিটার রাস্তায় একা একটি যুবতী মেয়ের ভয়ঙ্করতম বিপদ ঘটে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। গ্রামাঞ্চলেও রোমিওদের উৎপাত বেড়েছে। তারা চড়াও হতে পারে। টিজিং নয়, তারা এগোতে পারে আরো অনেক দূর। মানুষ তখন জন্তুর অধম। এসব খবর তো আকছার বেরোচ্ছে কাগজে। এরকমই একটা ব্যাপার কিছুদিন আগে ঘটেছে তালঘেরি গ্রামে। নিগৃহীতা মেয়েটি বেসরকারী হেপাজতে। পশুগুলো শারীরিক নিগ্রহের পর খুনও করে ফেলেছে। কোথায় নেমেছে মানুষ। পৌলোমী যে এসব খবর জানে না তা নয়। তবু কিরকম যেন ডোন্ট-কেয়ার ভাব। বোকা আর কাকে বলে!

কদিন আগে ওর পড়ার টেবিলে একটা হাতে লেখা চিরকুট পেয়েছিল শোভন। বয়ানটা এই রকম ছিল—লোমা, সুজাতা ছবিঘরের কাছে বৃহস্পতিবার দুটোর সময় তোমাকে আশা করছি। দুটো টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে। হ্যাঁ দুটো টিকিট—তার বেশি নয়।—সুজু।

সুজু নামের আড়ালে ছেলে না মেয়ে কে থাকতে পারে? শোভন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তারপর তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল সুজু কোন ছেলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু তার আসল নাম কি? সঞ্জয়, সুজয়, সুজিত? নাকি সঞ্জীব, সঞ্জিৎ অথবা সুজন? ছোটভাই তুহিনের অনেক বন্ধু আসে তাদের বাড়িতে। তাদের কেউ হওয়াই সম্ভব।

তুহিনকে সে জিগ্যেস করেছিল, 'তোর বন্ধুদের মধ্যে 'সু' দিয়ে বা 'স' দিয়ে কারো নাম আছে?'

'আছে। সুবীর তার নাম। কেন কি হয়েছে?'

'বোনটা যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে?'

তুহিন তার স্বাস্থ্যবান শরীরটাকে ঋজুভাবে মেলে ধরে হো হো করে হেসে উঠেছিল, 'তুই ভারি ব্যাক্‌ডেটেড। রোমা সুবীরের সঙ্গে সিনেমায় যায় জানি না বুঝি? ও তো বরেন, সন্তোষ প্রবীরের সঙ্গেও যায়। কি হয়েছে তাতে? ওরা বন্ধু।'

'কিছু হয়নি, কিন্তু হতে পারে।' কি হতে পারে সেটা দাদা হয়ে বলতে পারেনি শোভন। শীতের সন্ধ্যা বলে কুয়াশা জমেছে প্রান্তরে। তাতে দু'ফার্লং দেখাচ্ছিল দু'কিলোমিটারের মতো। তবে আকাশে চাঁদ থাকায় পৌলোমীর অবয়ব এত দূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। শোভন সাইকেলের গতি তুরন্ত না করে মৃদু রাখায় রিকশার সঙ্গে ব্যবধান একই রকম থেকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখলো উল্টো দিক থেকে একটা সাইকেল আসছে। সেটা রিকশার সামনে এসে থামল। শোভন দেখলো পৌলমী রিকশাটা দাঁড় করিয়ে নেমে পড়েছে। ভাড়া মিটিয়ে পৌলোমী সাইকেলের পেছনের সিটে বসল। ওর একটা হাত আরোহীর পিঠের ওপর। ওদের টুকরো হাসির শব্দ চমকে দিল শীতসন্ধ্যার মেঠো নির্জনতা। গরম পোশাকের নিচে শোভনের শরীরটা কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল। হঠাৎ খুব শীত করতে লাগল তার। হৃৎপিন্ডে একটা অব্যক্ত বেদনা। মনে হতে লাগল তার আত্মায় একটা ময়লা দাগ লেগেছে। সাইকেলের গতি স্লো করে দিল সে। পৌলোমীর ছেড়ে দেওয়া রিকশাটা একটা ঝোড়ো আওয়াজ তুলে কুশডাঙায় দিকে চলে গেল।

একটু দেরি করে বাড়ি ফিরে শোভন দেখল নিজস্ব ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পৌলোমী একটা বাজার-চলতি হিন্দি ফিল্মী গান গুনগুন করে গাইতে গাইতে চুল ঠিক করছে। গম্ভীর গলায় শোভন বলল, 'ছেলেটা কে রে পৌলোমী?'

'কার কথা বলছ?' ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে ঘাড় ঘোরাল পৌলোমী।

'কার সঙ্গে সাইকেলে এলি?'

'ওমা, ও তো ছোড়দার বন্ধু রিন্টু। তুমি দেখলে কি করে?'

'রিন্টু তো মেয়েলি নাম।'

'ছেলেদেরও হয়। আটকাচ্ছে কে? ওর চেহারাটা কিন্তু বেশ পুরুষালি। কিন্তু তুমি আমাদের দেখলে কোথায়?'

'তুই তো কুশডাঙায় গিয়েছিলি, না? আমি পেছনে পেছনে আসছিলাম। তুই একটু বেশী স্বাধীনতা নিচ্ছিস না কি!'

পৌলোমী ঝরঝর করে হেসে ফেলল, 'তোমার কোনো নাটকের সংলাপ বলছ নাকি দাদা? এটা তো নারী-স্বাধীনতারই যুগ। ফেমিনিজম না কি যেন বলে! তোমার বড্ডো গার্জেনি করা স্বভাব। খুব সেকেলে লোক। রিন্টু, সুবীর, অলক—ওরা সবাই খুব ভাল ছেলে। ওরা ছোড়দার বন্ধু, সেই সুবাদে আমারও বন্ধু হয়ে গেছে। ছোড়দা কিন্তু খুব লিবারেল। তোমার মনটা মান্ধাতার আমলেই রয়ে গেছে।'

তুহিন তো এরকম কথা প্রায়ই বলে। একদিন তুহিনের মুখে এ-ধরনের কথা শুনতে শুনতে শোভনের মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল

ভাইয়ের গালে। তার ফর্সা নিটোল মুখটায় যেন চেপে বসে গিয়েছিল শোভনের হাতের তালু। তুহিন রাগারাগি করেনি। গালে লাল হওয়া ছাড়া আর কিস্যু হয়নি। তোর কলমের জোর আছে, হাতের নেই। তোর মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোর সব ধারণা ঠিক নয়। তুই সিগারেট প্রায় খাস না, আমি যথেষ্ট খাই। তুই সিনেমায় যাস না বললেই চলে, আমি প্রায়ই যাই। তুই মেয়েদের এড়িয়ে চলিস, আমি ওদের সঙ্গে খুব মিশি। তার মানে আমি খারাপ? আসলে কি জানিস, একটা টাইম ফ্যাক্টর কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেটা মেনে নিতে হয় খানিকটা। নাহলে বাঁচা যায় না।'

উত্তরে বলার অনেক কিছু ছিল শোভনের। বলেনি। তর্কের দিকে যাবার ইচ্ছে হয়নি তার।

তুহিন তার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও ঠাট্টা করে। বলে, 'তোর ওই হাওয়ায়-ওড়া লতানে শরীর দিয়ে কি হবে? বাঙালী অনেক বুদ্ধিচর্চা করেছে, এবার তার স্বাস্থ্যচর্চা করা দরকার। বুঝলি?'

তুহিনের কথাগুলোই এমন কাটা-কাটা। তাতে মধু কোথাও নেই, শুধুই হুল। কিন্তু শোভনের ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়ে ওর কটাক্ষের মধ্যে একটা মমতার ব্যাপারও আছে। শোভনের স্বাস্থ্য সুঠাম তো নয়ই, আটপৌরে গোছের ভালও বলা চলে না। পড়ুয়া ছাত্রের মতো তার চোখেমুখে ক্লান্তি, দেহে হাড়ের খাঁজগুলো উগ্র। কিন্তু এসব পুষিয়ে গেছে তার গুণে। খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে। ওর কণ্ঠে জীবনানন্দ শুনলে ভোলা যায় না। আর কলমের ধার তো আছেই। ইচ্ছে করলেই একটা ভদ্রগোছের চাকরি জোটাতে পারত। স্কুলমাস্টারি তো বটেই। চাকরির বয়স এখনও যায়নি। কিন্তু ওসব দিকে ওর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। ওর জ্ঞান বলো ধ্যান বলো—নাটক আর পত্রিকা। গ্রামাঞ্চলের সীমিত সুযোগের মধ্যেও ও এসব নিয়েই আছে। রাজনীতি করে না, তবে সমাজ নিয়ে ভাবে। মূল্যবোধের অবক্ষয় আর বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে দুর্নীতির সংক্রমণ নিয়ে খান দুই নাটকও লিখেছে। সেগুলো দু'চার জায়গায় মঞ্চস্থ হয়ে সাড়াও ফেলেছে।

আজকাল পাড়াগাঁকেও কাটাতে শুরু করেছে শহুরে হাওয়ার ঘুণপোকা। উগ্র, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে আবহাওয়া। ভিডিও শো হচ্ছে যখন তখন, যত্রতত্র। গোপনে গোপনে নীল ছবির ব্যবসাও চলে। ইভটিজিং থেকে চরম নারীনিগ্রহ—কিছুতেই পিছিয়ে নেই গ্রামের ছেলেরা। তিলকাঠির পাশের দুটো গ্রাম নয়াগড় আর চাকুন্দাতে মেয়েদের ওপর শারীরিক অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। এ-ব্যাপারে থানাপুলিশ, রাজনৈতিক দল—সবাই বোবা। পলিটিক্যাল পার্টি চুপচাপ থেকেছে পাছে ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে। দেশের বিবেক মরে গেছে, 'প্রতিরোধ' শব্দটাকে কুলোর বাতাস দিয়ে

তাড়িয়ে দেশছাড়া করেছে। শোভন চুপচাপ থাকতে পারেনি। তার কাগজে 'মফস্বল সংবাদ' বলে একটা বিভাগ আছে। এটা তার নিজস্ব কলাম। বিভাগটাতে গ্রামবাংলার এই অবক্ষয়ের দিকটা নিয়ে সে ফলাও করে লিখেছিল। নিগ্রহকারীদের নাম-ধাম পর্যন্ত সে গোপন করেনি। এসব ভালগার অ্যাক্টিভিটি চলতে দেওয়া যায় না কিছুতেই। অনেকদূর পর্যন্ত সে লড়াই চালাতে প্রস্তুত। কিন্তু অপরাধীরা জোর পেয়ে যাচ্ছে সামাজিক নীরবতায়। ভয়ে সবাই বরফ হয়ে আছে। এদিকে তাকে নিয়ে ঘোঁট পাকানো চলছে ভিতরে ভিতরে। ক্রিমিন্যালরা যে কোনো সময়ে তার ওপর অ্যাকশান চালাতে পারে। বন্ধুমহল শোভনের জন্যে চিন্তিত। মা-বাবা তো বটেই।

মা তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করা তোর স্বভাব।'

শোভন বলেছে, 'ঘা-টা আগে থেকেই আছে, আমি তাতে খোঁচা মেরেছি মাত্র। তুমি শুধু খোঁচানোটাই দেখলে।'

'সবই বুঝি রে। কিন্তু আমার যে বড়ো ভয় করে শোভন। কোনদিন না বিপদে পড়ে যাস। আগেকার গ্রাম কি আছে? কিরকম যেন বদলে গেছে দিনকাল। কে বন্ধু আর কে শত্রু বোঝা ভার।'

শোভন আর কিছু বলেনি। মায়ের ভাবনা মিথ্যে নয়। কিন্তু যার যা কাজ সেটা তো তাকে করতেই হবে।

কুশডাঙার কলেজে ক্লাশ সেরে পৌলোমী নয়াগড়ে প্রোফেসরের বাড়ি যায় পড়তে। সপ্তায় দু'দিন। ফিরতে সাতটা-সাড়ে সাতটা হয়ে যায়। প্রথম প্রথম একলাই ফিরত। কিন্তু নয়াগড়ে নারীঘটিত ঝামেলাটা ঘটে যাবার পর থেকে শোভন ওকে আনতে যায়। কলেজের কিছু ছেলে যাদের মধ্যে তুহীনের কিছু বন্ধুও আছে—তারাও ওই প্রোফেসরের কাছে পড়তে যায়। তারা অবশ্য বি-কমের ছাত্র। তারা কখনও কখনও পৌলোমীর সঙ্গে ফেরে। কিন্তু সবসময় হয়ে ওঠে না। মেয়েদের পর ছেলেদের পড়ার টাইম। তাতে দেরি হয়ে যায়। তাই শোভনই ওকে আনতে যায়। কখনও বা তুহিনও। তবে সেটা খুব কম। আসলে তুহিনের ধারণা এখনকার মেয়েরা ননীর পুতুল নয়। তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। অন্তত থাকা উচিত। শোভন আর কি বলবে? একদিক থেকে তার ভাইটি যে তার চেয়েও স্বপ্নবিলাসী এ তার চেয়ে বেশি কে জানে?

এক শুক্রবার সকালে শোভন বোনকে বলল, 'আজ তো তোর নয়াগড়ে যাবার ডেট, তাই না?'

'তো কি হয়েছে?' পৌলোমী সপ্রশ্ন চোখে দাদার দিকে তাকাল।

শোভন ভিতরের একটা উদ্বেগের সঙ্গে লড়াই করতে করতে খানিকটা অসংলগ্ন ভঙ্গিতে বলল, 'প্রোফেসরের বাড়ি ক'দিন না গেলেই নয়? কিংবা যদি অন্য কাউকে ঠিক করে দিই?'

'ইনি তো খুব ভালই পড়ান। অন্য কারোর কি দরকার? যাওয়া বন্ধ করবই বা কি করে? সামনেই তো অ্যানুয়াল পরীক্ষা। খারাপ করলে টুয়েলভ ক্লাশে তুলবে না। তুমি কি বলতে চাইছ বল তো?'

এবার খোলাখুলি ভাষাতেই বলল শোভন, 'আমার ওপর নয়াগড়ের কিছু পাজি ছেলে খুব ক্ষেপে আছে। তারা ঝামেলা বাধাতে পারে। তাছাড়া রাস্তাটাও তেমন ভাল নয়। অনেকটা ফাঁকা জায়গার ভেতর দিয়ে আসতে হবে। তাই বলছিলাম—'

'ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না। বাজে ভেবে ভেবে তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। প্রোফেসরের বাড়ি যেমন যাই আজো যাব। তুমি সন্ধে নাগাত আনতে যেও আমাকে।' এই বলে ব্যাপারটা ওখানেই থামিয়ে দিল পৌলোমী।

সুতরাং নয়াগড়ে যেতেই হলো শোভনকে। পড়ার চাপ ছিল। অধ্যাপক যখন ছাড়লেন তখন রাত আটটা ছুঁই-ছুঁই। বাইরে বেরিয়ে শোভন দেখল আকাশের চেহারা ঘোরালো। নৈঋত কোণে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। থমকে যাওয়া বাতাসে, গুমোট ও নিথর গাছপালায় বৃষ্টির আয়োজন। যে কোনো মুহূর্তে প্রকৃতি দামালপনা শুরু করে দিতে পারে।

শোভনের উদ্বেগ বাড়ল। গোঁয়ার্তুমি করে মেয়েটা বেশ মুশকিলেই ফেলল তাকে।

আপ্রাণ চেষ্টা করেও সওয়ারি নিয়ে জোরে সাইকেল চালাতে পারছিল না। এ তো আর মসৃণ পরিচ্ছন্ন রাস্তা নয়। এবড়ো-খেবড়ো মেটে রাস্তা। আবছা অন্ধকারে চোখের ঠাহরে চালাতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছপালার নিচে আঁধারের ঘন জটলা। চাঁদ থেকে থেকে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাতলা মেঘের চাদরে। সে-সময় তীক্ষ্ণ নজরই ভরসা।

শোভন কিছুটা বিরক্ত গলায় বলল, 'সাইকেল চড়াটা তুই শিখে নিতে পারতিস পৌলোমী। আজকালকার বেশির ভাগ মেয়েই এটা জানে। আর এটা দরকারিও। তুই কিরকম মড কি জানি! ভেতরে-ভেতরে তুই ঠাকুরমা-দিদিমা। পড়াশুনোতেও পিছিয়ে। তোর বয়সে অনেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করে ফেলে। এটাই আসল প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেডনেস। শুধু সেলুনে চুল ছেঁটে কেউ মডার্ন হয় না।'

পৌলোমী উত্তর দিল না। তার ভয় করছিল। একটা গুহানিহিত আদিম ভয় ঘুরপাক খাচ্ছিল তার বুকের ভিতরে। রাস্তাটাকে বড় বেশি নির্জন মনে হচ্ছে।

এই নির্জনতাটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। গ্রামাঞ্চল এরকমই। যেখানে সাড়া আছে তো আছে, নেই তো নেই। সেই বৃত্তটুকুর বাইরে গেলেই পৃথিবী যেন মৃত।

আদিম, প্রাগৈতিহাসিক।

বোনকে চুপচাপ দেখে শোভন বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। চেনা রাস্তা। শিমুলতলার বাঁওড়টা পেরিয়ে জমিদারী সড়কটা ধরতে পারলে পৌঁছেই তো গেলাম। এখান থেকে মিনিট দশ-বারো বড় জোর।'

কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল। বাঘ-ভালুক, সাপ বা চোর-ডাকাতই তো শুধু ভয়ের ব্যাপার নয়। দুনিয়ায় অনেকরকম ভয়ের ব্যাপার আছে। মেয়েদের পক্ষে বিশেষ করে। নয়াগড়ের মূল রাস্তাটা যেখানে একটা মরা নদীর সোঁতার ধারে অন্য এক গ্রামের রাস্তাকে ছুঁয়েছে, সেখানে মোড়ের মাথায় একটা বটগাছ। নয়াগড় আর পাশের গ্রামের শেষবিন্দুতে অবস্থিত জায়গাটি থেকে লোকবসতি দুদিকেই অনেকখানি দূরে। জায়গাটার কাছাকাছি আসতেই শোভনের কানে এসে ধাক্কা মারল কথাগুলো, 'হিসেবটা ঠিকই মিলে গেছে। মক্কেলরা আসছে শেষ পর্যন্ত।'

'মেয়েটা ওর সিস্টারই তো রে?' একজন শুধোলো।

'বাঃ, একসঙ্গেই পাওয়া গেল। ব্যাটা কতবড় কাগজ করনেওয়ালা তা সমঝে দিচ্ছি এখুনি।' অন্য একজন উত্তর করল।

অন্য একজন ধমকের সুরে বলে উঠল, 'তুই শালা বড্ড বাজে বকিস। নে, অপারেশন শুরু কর।'

সব কথাই কানে গিয়েছিল পৌলোমীর। সে চাপা আর্ত গলায় বলে উঠল, 'দাদা, সামলে। ওদের মতলব ভাল নয়।' কিন্তু শোভন কিছু ভেবে ওঠার আগেই কার এক লাথিতে সাইকেলটা টলে গেল, হেলে পড়ল একপাশে। পৌলোমীর হাতে পড়ল হ্যাঁচকা টান। শোভন বাধা দিতে গিয়ে সপাটে একটা থাপ্পড় খেল। 'চুপ করে থাক শালা। চেঁচাল জান খতম করে দোব।' হিসহিসে গলায় বলে উঠল কেউ। কিন্তু শোভন চুপ করে থাকতে পারল না। শ্ব-দন্ত মেলে একটা ভয়ঙ্কর নেকড়ে কিংবা সিংহ গ্রাস করতে এলে সে যেভাবে আর্তনাদ করে উঠত, তার চেয়েও তীব্রতায়, এক গভীর প্রকৃতিগত প্রেরণায়, সে যেন ব্রহ্মাণ্ড শিউরে-দেওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও। মেরে ফেললে।' অমোঘ, অনিবার্য তিনটি শব্দ। হিরোসিমা-কাঁপানো পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ শব্দ আর স্বভাবত ক্ষীণকণ্ঠ শোভনের আর্তনাদ এক বিন্দুতে মিলে গেল। চেতনা হারাবার আগে সে এটুকু কেবল অনুভব করতে পারল যে তার আবেদনবার্তা অনেক দূর পৌঁছে গেছে।

কুশডাঙার হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে শুয়েছিল তিনজন। সুবীর, রিন্টু আর প্রতাপ। মাথায়, হাতে, পায়ে ব্যান্ডেজ জড়ানো।

শোভন ওদের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে। তাকে বিমর্ষ এবং অসুস্থ দেখাচ্ছে। তার কপালের একদিকে স্টিকিং প্লাস্টার। বিকেল প্রায় পাঁচটা। ভিজিটিং আওয়ার্সে সুবীরদের সে দেখতে এসেছে।

ক্লিষ্ট হেসে শোভন বলল, 'হাসপাতালের বেডে আমারই শুয়ে থাকার কথা ছিল। আমার ভাগ্যলিপি তোমারই বদলে দিলে। কার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কে করে!' একটু থেমে বলল, 'তোমরা সময়মতো এসে না পড়লে কি হতো কে জানে!'

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তুহিন। সে বলল, 'জানাজানির কি আছে! তুই নির্ঘাৎ মরতিস। বোনটাও মরত। তবে অন্যভাবে।'

শোভন নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। তুহিন বলে চলল, 'একেই বলে যোগাযোগ। কোয়েনসিডেন্স। সুবীররাও তো নয়াগড়ে প্রোফেসরের বাড়ি পড়তে গিয়েছিল। মাথা ধরেছে বলে ভদ্রলোক ওদের ব্যাচটাকে পড়াননি। তোদের পবে পরেই ওরা বেরিয়ে আসে। তোর চিৎকার ওদের কানে যায়। ছুটে আসে ওরা। তারপর জান কবুল করে মাস্তানগুলোর সঙ্গে লড়ে যায়। রিন্টুর চোটটা সবচেয়ে সাংঘাতিক। চেঁচামেচিতে গ্রামের লোক না এসে পড়লে ঝামেলা আরো গড়াতে পারত। নয়াগড়ের লোকেরাই তো ওদের নিয়ে যায় বাড়ি। তুই সারাদিন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলি বলে সব কথা বলা হয়নি তোকে। এখন সবটা জানলি।'

শায়িত তিন মূর্তি ব্যান্ডেজের ঘেরাটোপের আড়াল থেকে শোভনের দিকেই তাকিয়েছিল। ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন একটা আবেগে বুক ভরে উঠল শোভনের। সে বলতে গেল, 'তোমারা আমাদের জন্য যা করেছ'—কিন্তু শেষ হলো না তার কথা। তার আগেই সুবীর হাত তুলে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'পৌলোমী আমাদের বন্ধু, শোভনদা। দিদিও বলতে পারো।'

ওর কথা বলছে, পৌলোমী ঢুকল। শোভন আর তুহিন আগে-পরে সাইকেলে এসেছে। পৌলোমী এসেছে রিক্‌শায়। তাই আসতে ওর একটু দেরি হয়েছে। ধীরে ধীরে ও বেডগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। কারো মাথার চুলে হাত বোলাল, কারো মুখে বা হাতে স্নিগ্ধ করস্পর্শ বুলিয়ে দিল। ওর চোখ ভেজা-ভেজা। ধরা গলায় বলল, 'তোদের বন্ধুর জন্যে অনেক কষ্ট সইতে হলো। রিন্টু, তুই তো আমাকে দিদি বলিস। দিদির মান বাঁচাতে তোর তো প্রাণ যেতে বসেছিল।'

রিন্টু অস্পষ্ট গলায় বলল, 'বন্ধুর জন্যে অনেক কিছু করা যায়। দিদির জন্যে তো যায়ই।'

পৌলোমী হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'তোরা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।

তারপর একদিন তোদের রেঁধে খাওয়াব। আমার রান্নার হাত নেহাৎ খারাপ নয়। তারপর সবাই মিলে সিনেমা দেখব। সব খরচা কিন্তু আমার।'

প্রতাপ বলল, 'সিনেমা দেখাবি, পয়সা কোথায় পাবি? তুই তো আর চাকরি করিস না।'

'আমি একটা টিউশানি করি। সেটার খবর শোভনদাও জানে না। আমার হাতে বেশ কিছু পয়সা জমেছে। তাতে খাওয়া-সিনেমা চলে যাবে। কিন্তু আমি কি স্বার্থপর রে, তোরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিস, আর আমি দিব্যি হাসিমুখে আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছি।'

রিন্টু বলল, 'আমাদের কিন্তু তাতেই ভাল লাগছে। তুই এসে আহা-উহু করলে বাজে লাগত। আর যাই হোক, তোর সঙ্গে আমাদের সিমপ্যাথি দেখানোর সম্পর্ক নয়।'

শোভন দেখল ব্যান্ডেজের তলায় প্রায়-অদৃশ্য মুখগুলোয় একটা সুখ ও তৃপ্তির হাসি তিরতির করে কাঁপছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল নারী-পুরুষের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তার সম্পূর্ণ অচেনা। অভিভাবকের মন নিয়ে এ জিনিস ঠিক বোঝা যায় না। এর স্বাদ-গন্ধ আলাদা।

'তুহিন, তুই পৌলোমীকে নিয়ে পরে আয়। আমাদের পাড়ার কিছু ছেলেও এসেছে। তারা সঙ্গে থাকবে। আমি এগোচ্ছি।' এই বলে বেরিয়ে গেল শোভন।

তিলকাঠির দিকে যেতে যেতে শোভন ভাবল তার পত্রিকার 'মফস্বল সংবাদ' বিভাগে এতদিন সে শুধু পল্লীবাংলার ফ্যাশন আর অবক্ষয়ের কথাই লিখে এসেছে। এবার মানবতার কথাও লিখবে সে। লিখবে যে যতোই নতুনের ছোঁয়া লাগুক, পল্লীবঙ্গের সরলতা, বিবেক ও হৃদয় এখনও সম্পূর্ণ মারা যায়নি। এখনও এখানে সুবীর-রিন্টু-প্রতাপরা আছে এবং দরকার হলে তারা বন্ধুত্ব, প্রতিবাদ এবং সাহসের নজির তুলে ধরতে পারে। আর এই রচনাই হবে তার বহুকষ্টে চালানো পত্রিকার শারদসংখ্যার শ্রেষ্ঠ রচনা।

নবকল্লোল